শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের

কথা প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড

শিবম্

সত্যম্ সুন্দরম্

শ্রুতি লেখন

শ্রীমতী সরলাবালা মিত্র

বঙ্গানুবাদ

শ্রী শ্রীবাস চন্দ্র দত্ত

প্রকাশক :
প্রেম প্রবাহ প্রকাশন
প্রেম মন্দির আশ্রম
রিষড়া, হুগলী - ৭১২ ২৪৮
দূরভাষ- (০৩৩) ২৬৭২ ২১২১

প্রথম সংস্করণ :
পৌষ শুক্লা চতুর্দ্দশী, ১লা মাঘ ১৪২১

মুদ্রণ :
ক্রিয়েশন (ইন্ডিয়া)
২৬/এ, এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কোন্নগর, হুগলী

© গ্রন্থসত্ত্ব ঃ
প্রেম মন্দির আশ্রম

বিনিময় : ৫০ টাকা

বিষয় বিন্যাস

- প্রথম পর্ব ঃ জ্ঞানী ও অজ্ঞানীকে চেনবার উপায়, ঈশ্বর সর্বদ্রষ্টা তাঁকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ৫
- দ্বিতীয় পর্ব ঃ আমি আমার এই অভিমানই শোক দুঃখের কারণ, ভাগ্য গণনা করা উচিৎ বা অনুচিত, মানুষের কেন শোক করা উচিৎ নয় — গীতা অনুসারে। ২১
- তৃতীয় পর্ব ঃ অধিকারী অনুসারে তিন প্রকার শিষ্য — উত্তম, মধ্যম ও অধম, চিত্তমল শুদ্ধ করার উপায়, জ্ঞানীকে কিভাবে চেনা যায়? ৪০
- চতুর্থ পর্ব ঃ মাতা — মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা আর পুত্র — ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ৬১
- পঞ্চম পর্ব ঃ শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁর নামের মহিমা, অদৃষ্ট ও প্রারব্ধ বড় বা পুরুষকার বড়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলেই পরমাত্মার অনুভূতি হবে। ৬৪
- ষষ্ঠ পর্ব ঃ মনুষ্য জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন, কিভাবে ইন্দ্রিয়-দাসত্ব মোচন হতে পারে, তরণ, তারণ ও তরণ-তারণ গুরু। ৮২
- সপ্তম পর্ব ঃ কাশীতে মৃত্যু হলে মুক্তি হয় - এটা কি অন্ধ বিশ্বাস? পুণ্যের দ্বারা পাপের খন্ডন হয়? দুঃখ পাইয়ে তো সুখ লাগাইয়ে। ১০০
- অষ্টম পর্ব ঃ দুঃখ না হলে ঈশ্বরের স্মরণ হয় না আর বৈরাগ্য আসে না, ঈশ্বরের অস্তিত্ব দুভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। ১১০
- নবম পর্ব ঃ সাধুর সামর্থ পরশমণির থেকেও বেশী, সৎসঙ্গ ও সাধুসঙ্গের প্রভাব। ১২৮
- দশম পর্ব ঃ মানুষের অন্তিমকালে কি করণীয়? মায়া কিভাবে মানুষকে ভুলিয়ে রাখে? ১৪৮

অনুবাদকের নিবেদন

প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হল, শ্রীমতী সরলাবালা মিত্র কর্তৃক হিন্দী ভাষায় অনুলিখিত 'শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজের কথাপ্রসঙ্গ' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই বঙ্গানুবাদ বইটি অধ্যাত্মরসপিপাসু ভক্তজন মানসে বিপুলভাবে সমাদর লাভ করায় উৎসাহিত হয়ে আমি বিগত কয়েক মাস ধরে উক্ত গ্রন্থখানির দ্বিতীয় খণ্ড বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে শুভ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছি। আজ এই পুণ্য দিনে উল্লিখিত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থখানির (২য় খণ্ড) প্রকাশিত হল। গ্রন্থখানির প্রকাশনায় সক্রিয় সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন মদীয় জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মচারী গুরুভ্রাতা রিষড়াস্থিত প্রেম মন্দির আশ্রমের অধ্যক্ষ সর্বজনশ্রদ্ধেয় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। তিনি প্রতিটি পর্বের লেখার খসড়াগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে প্রয়োজনমত ভুল সংশোধন ও সংযোজন এবং ক্ষেত্রবিশেষে সম্পাদনা করে দিয়েছেন, চূড়ান্ত প্রুফ তিনিই দেখে দিয়েছেন। তাঁর সর্বতোভাবে সক্রিয় সহযোগিতা ও প্রেরণা ব্যতীত গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাঁকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই আশ্রমের নিরলস সেবক শ্রী অমলেশ মালিককে যিনি গ্রন্থটির প্রকাশনায় যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। এই গ্রন্থখানি রচনাকালে আমি মদীয় পরম গুরুদেব শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ও গুরুদেব শ্রীশ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের অলক্ষে অপার কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছি। এটাই আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি।

সৎসঙ্গের এই গ্রন্থখানি সকলের কাছে সমাদৃত হলে আমার দীর্ঘদিনের পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

তারিখ ঃ ০৪/০১/২০১৫

শ্রী শ্রীবাসচন্দ্র দত্ত

প্রথম পর্ব

স্থান ঃ তপোবন পাহাড়, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ মাস, সময় ঃ সকাল

পিতৃদেব ৺শরচ্চন্দ্র সিংহ

ও

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[জ্ঞানী আর অজ্ঞানীকে চেনবার উপায় ঃ শুভ কাজ বা সংকল্প শীঘ্র সম্পাদন কর – অশুভ কাজে বা সংকল্পে বিলম্ব কর ঃ নিরন্তর সাধনায় লেগে থাক, তবেই সিদ্ধিলাভ করবে ঃ স্থূল পূজা ও মানস পূজা ঃ ঈশ্বর সর্বদ্রষ্টা, তাঁকে ফাঁকি দেওয়া যায় না ঃ ঈশ্বর সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন, তাঁর অজানা কিছু নেই ঃ মনকে স্থির করবার উপায় ঃ জ্ঞানী আর ভক্তে প্রভেদ কী? যাকে যা দেওয়ার মালিকই (ঈশ্বর) দেন। উপার্জিত অর্থ ব্যয় করবার রীতি ঃ বড় ব্যাঙ্কের পুঁজি বাড়াও]

পিতা ঃ মহারাজ, কে জ্ঞানী আর কে অজ্ঞানী তা কী উপায়ে চিনতে পারবো?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ জ্ঞানী আর অজ্ঞানীকে চেনা খুব মুস্কিল। তবে এ সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি ঃ –

এক রাজার পাখী পোষার খুব সখ ছিল। একদিন রাজা তাঁর গুরুদেবকে বললেন, 'হে গুরুদেব, আমার এত পাখি রয়েছে, কিন্তু রাজহাঁস নেই। কেমন করে রাজহাঁস মিলবে তা আপনি আমাকে বলে দিন।' গুরুদেব বললেন, 'হে রাজা, তুমি এক কাজ করো। তোমার আঙিনায় দু'চার মন ধান ছড়িয়ে দাও। ওই ধান খাওয়ার লোভে অনেক পাখী এসে জুটবে, কোনদিন রাজহাঁসও এসে যেতে পারে।' রাজা সেই ব্যবস্থাই করলেন, প্রতিদিন ধান ছড়াতে লাগলেন, ধান খাওয়ার জন্য অনেক পাখীও আসতে লাগলো। কিন্তু রাজহাঁসের আর দেখা নেই।

কিছুদিন পর রাজবাড়িতে প্রতিদিন এত পাখী আসতে দেখে এক রাজহাঁসের মনে হল – এত পাখী রাজবাড়িতে যাচ্ছে, আমিও একবার সেখানে যাই – কী হচ্ছে একবার দেখে আসি। তাই রাজহাঁসও সেখানে এসে গেল। রাজা রাজহাঁস চিনতেন না। নতুন এক রকমের পাখী এসেছে দেখে রাজা খুব খুশি হলেন। তিনি তখন গুরুদেবের কাছে গিয়ে বললেন, 'গুরুদেব , আজ একটা নতুন রকম পাখী আঙিনায় এসেছে, আমার মনে হচ্ছে এই পাখীই হয়ত রাজহাঁস। মহারাজ, রাজহাঁসকে চিনবার উপায় আমাকে বলে দিন।' গুরুদেব বললেন, 'তুমি একটা পাত্রে দুধ আর জল মিশিয়ে পাখীটার পাশে রেখে দাও। যদি রাজহাঁস হয় তাহলে

সে দুধটুকু শুধু খাবে, জল পাত্রে পড়ে থাকবে।' রাজা তাই করলেন। রাজহাঁস জল বাদ দিয়ে শুধু দুধটুকু খেয়ে নিল। রাজা তখন নিশ্চিত হলেন যে এটাই রাজহাঁস।

এই দৃষ্টান্ত দেখে একদিন রাজার সখ হল, 'আমি জ্ঞানী পুরুষের সেবা করব।' কিন্তু জ্ঞানী পুরুষকে চিনবেন কী করে? গুরুদেব তখন রাজাকে উপদেশ দিলেন, 'তুমি অন্নসত্র খোল, যেমন পাখীদের জন্য ধান ছড়িয়ে দিয়েছিলে। ঠিক তেমনি জ্ঞানী পুরুষ ধরবার জন্য অন্নসত্র খুলে দাও। এতে কী হবে?' পাখীদের মতো বহু লোক এখানে আসবে। সেইসঙ্গে দেখবে রাজহাঁসের মতো একদিন জ্ঞানী পুরুষও এখানে উপস্থিত হবেন।

প্রশ্ন হল – রাজহাঁসের মতো দুধে জলে মিশিয়ে তো জ্ঞানী পুরুষকে চেনা যাবে না। তাহলে উপায়? গুরুদেব তখন বললেন, 'উপায় আছে বইকি। জ্ঞানীর কাছে শাস্ত্র এনে দাও। তিনি নিত্যানিত্য বস্তু বিচার করে দেবেন, বলে দেবেন – এই হল নিত্য, এই হল অনিত্য।' রাজহাঁস যেমন দুধ আর জল আলাদা করে দেয়, জ্ঞানীও তেমনি নিত্য বস্তু আর অনিত্য বস্তু আলাদা করে দেন।' গুরুদেবের নির্দেশে রাজা তখন অতিথি-ফকিরদের জন্য এক সদাব্রত খুলে দিলেন। নানা স্থান থেকে লোকজন সেই সেবাব্রতে আসতে লাগলো, শেষে জ্ঞানীও একদিন এসে দেখা দিলেন। রাজার মনস্কামনা পূর্ণ হল।

দেখো ভাই সিংহী, শুভ কাজ করলে শুভ অর্থাৎ ভালো লোকও পাওয়া যায়। তাই সর্বদা শুভ কাজে মনকে লাগিয়ে রাখতে হয়। সময় চলে যাচ্ছে। যে সময় চলে যায়, তা আর ফিরে আসে না। এ সম্পর্কে একটি দোঁহা প্রচলিত আছে ঃ

'যো কাল করে, সো আজ কর্
আজ করে সো আব্
সময় বিত যাতা হ্যায়
ফির করেগা কব্।'

এর তাৎপর্য হল – যে কাজ কাল করবি ভাবছিস সেটা আজই করে ফেল। আর যেটা আজ করবি বলে ঠিক করেছিস, সেটা এখনই সেরে ফেল্। সময় বয়ে যাচ্ছে, আর কবে কখন করবি? সেজন্য ভালো কাজ ইচ্ছা মাত্রই করবে। তা না হলে মনের ইচ্ছা মনেই রয়ে যাবে। এ সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ একটি গল্প আছে। ভাই, বড়ো মজার সে গল্প –

এক বৃদ্ধের অনেক টাকাকড়ি আছে। তার মনের ইচ্ছা যে এইসব টাকাকড়ি সে

কাউকে দেবে না। এমনকি দান-ধ্যানে ব্যয় করে পুণ্য অর্জন করবে। বৃদ্ধের চার ছেলে। তারাও জানে যে বাবার যা টাকাকড়ি আছে তা তাদের দেবে না। বৃদ্ধ ছেলেদের লুকিয়ে সমস্ত টাকা ঘরের দেওয়ালে গেঁথে রেখে দিল। একদিন একটি সাধু ভিক্ষে করতে বৃদ্ধের বাড়িতে এলেন। সাধু ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। তিনি জানতে পারলেন যে, বৃদ্ধ দান ধ্যান করে তার সমস্ত টাকা খরচ করতে চায় অথচ তার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। সাধু তখন ওই বৃদ্ধকে উপরোক্ত দোঁহাটি শোনালেন ঃ

'যো কাল করে, সো আজ কর ...'

বৃদ্ধ এই দোঁহার মানে বুঝতে পারল না। ঠিক সময় বৃদ্ধের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। ভিতরে জ্ঞান থাকলেও তার কথা বলার শক্তি আর রইল না। এমন সময় ছেলেরা এসে তাঁকে বলল, 'আপনার কী ইচ্ছা আমাদের বলুন, দান ধ্যান করতে চান তাও বলুন। আপনার টাকাকড়ি কোথায় আছে জানতে পারলে আমরা আপনার ইচ্ছেমতো সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেব।' বৃদ্ধ আর কী করে, কথা বন্ধ হয়ে গেছে। তার চোখ দিয়ে কেবল জল পড়তে লাগল। কোন রকমে সে দেওয়ালের যেখানটায় টাকা গাঁথা রয়েছে, সেই জায়গাটা হাতের ইসারায় ছেলেদের দেখিয়ে দিল। ছেলেরা বুঝে নিল যে ওই প্রাচীররেই টাকাকড়ি আছে। কিন্তু বাইরের অনেক লোক তখন ঘরের মধ্যে রয়েছে, তাদের সামনে তারা সে কথা ফাঁস করতে চাইল না। তাই ছেলেরা তাদের বুঝিয়ে বলল, 'বাবা বলছেন, তাঁর যা টাকা ছিল সব বাড়ি তৈরি করতেই খরচ হয়ে গেছে।'

বৃদ্ধের তখনও খেয়াল ছিল। তার মনে হল – ছেলেরা তার ইঙ্গিত বুঝতে পারে নি। তাই সে নিজের কপাল চাপড়াতে লাগল আর কাঁদতে কাঁদতে নানারকম ইঙ্গিত করে বোঝাতে চাইল যে এখনই যেন তার টাকা দিয়ে দান-ধ্যানের ব্যবস্থা করা হয়। ছেলেরা বাবার কথা বুঝতে পারল, কিন্তু জেনেশুনেই তারা বৃদ্ধ বাবাকে বলল, 'বাবা, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আপনি কী চান তা আমরা বুঝতে পেরেছি। আপনি তো চাইছেন ছোট ছেলেকে কিছু বেশি টাকা দিতে আমরা তাই দেব। আপনার ইচ্ছে আমরা অপূর্ণ রাখব না।' তখন বৃদ্ধের আর কিছু করবার রইল না। মনের ইচ্ছে মনে রেখেই তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হল। এজন্যে মনের মধ্যে যখনই শুভ বাসনা জেগে উঠবে তখনই তা সম্পন্ন করতে হবে। মনে যখন অশুভ সংকল্প হবে, তখন সময় পার হয়ে যেতে দেবে অর্থাৎ বিলম্ব করবে। তোমাদের পুরাণে এ সম্পর্কে একটি ইতিবৃত্ত আছে – রামচন্দ্রের মৃত্যুবাণের আঘাত পেয়ে রাবণ যখন

মৃত্যুশয্যায় শায়িত আছেন, তখনো মৃত্যু হয়নি, তখন নীতি শিক্ষালাভের জন্যে রাম লক্ষ্মণকে পাঠালেন রাবণের কাছে। লক্ষ্মণ গিয়ে রাবণের শিয়রের কাছে দাঁড়ালেন। রাবণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি?' লক্ষ্মণ বললেন, 'আমি লক্ষ্মণ। রামচন্দ্র আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন নীতিশিক্ষা লাভের জন্যে।' রাবণ চুপ করে রইলেন, কোন কথা বললেন না। লক্ষ্মণ তখন রামচন্দ্রের কাছে ফিরে এসে সব কথা তাঁকে জানালেন। রাম লক্ষ্মণকে বললেন, 'তুমি আবার যাও, এবার গিয়ে তুমি রাবণের পায়ের কাছে দাঁড়াবে। শিষ্য যে হবে তাকে তো গুরুর পায়ের কাছেই থাকতে হয়।' লক্ষ্মণ তখন রাবণের কাছে গিয়ে তার পায়ের কাছে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'হে রাবণ, আপনি এতকাল রাজত্ব করলেন, সংসার সম্পর্কে আপনি অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন। আমি শিক্ষার্থী হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমাকে কিছু শিক্ষা দিন।' রাবণ বললেন, 'লক্ষ্মণ, যখনই তোমার মনে কোন শুভ সংকল্পের উদয় হবে, তখন যত তাড়াতাড়ি পারবে তা কার্যে পরিণত করবে আর মনে যদি অশুভ সংকল্প জেগে ওঠে, তাহলে যে কোন উপায়ে হোক সময় কাটিয়ে দেবে অর্থাৎ বিলম্ব করবে। এ সম্পর্কে আমিই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আমার মনে দুটো সংকল্প জেগেছিল। প্রথমতঃ আমি ভেবেছিলাম – সমুদ্রের জল লোনা, সেই লোনা জলের সমুদ্রকে যদি ক্ষীর সমুদ্র করে দিই, তাহলে গরীব দুঃখীরা ক্ষীর খেয়ে বেঁচে থাকবে। তারা ভাল কিছু খেতে পায় না, কত কষ্ট তাদের। লবণ সমুদ্র ক্ষীর সমুদ্রে পরিণত হলে সংসারে কেউ আর খাওয়ার কষ্ট পাবে না। সমুদ্র থেকে ক্ষীর তুলে আনবে আর তাই দিয়ে পেট ভরাবে। এই ছিল আমার প্রথম সংকল্প।'

এবার আমার দ্বিতীয় সংকল্পের কথা শোন। একবার আমি যমপুরী দর্শন করতে গিয়েছিলাম। সেখানে পাপী লোকদের যন্ত্রণা দেখে আমার মনে বড় দয়া হল। তখন সংকল্প করলাম, পাপীদের এত দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে হয়, তাদের এ দুর্দশা আমি দূর করব। স্বর্গ পর্যন্ত এমন এক সিঁড়ি তৈরী করে দেব যাতে পাপী পুণ্যবান সকলেই যেন সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা স্বর্গে চলে যেতে পারে। নরক যন্ত্রণা যেন কাউকে আর ভোগ করতে না হয়। দেখো লক্ষ্মণ, এই দুই সংকল্প আমার মনে উদয় হওয়া মাত্রই যদি সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ করে ফেলতাম, তাহলে জগৎ সংসারে আমার কত বড় অক্ষয় কীর্তি থেকে যেত! কিন্তু তখন সেই কাজ আমি করিনি বলে এখন আমার খুব অনুশোচনা হচ্ছে। এবার অশুভ সংকল্পের কথা বলছি। হে লক্ষ্মণ, যখনই আমার মনে হল – সীতাদেবীকে চুরি করে নিয়ে এসে আমার পাটরাণী করি

তখন আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সীতাদেবীকে চুরি করে আনলাম আর তারই পরিণামে আমি সবংশে তোমাদের বাণে নিধন হলাম। এই অশুভ সংকল্প মনে উদয় হওয়া মাত্র যদি কার্যে পরিণত না করতাম, যদি অন্য চিন্তায় বা কাজে সময় কাটিয়ে দিতাম, তাহলে আজ আমার এই দশা হত না। তাই তোমার কাছে এই হল আমার উপদেশ ঃ

'শুভস্য শীঘ্রম্, অশুভস্য কালহরণম্'

হে লক্ষ্মণ, মনে শুভ সংকল্প উদয় হওয়া মাত্র তা কার্যে পরিণত কর, অশুভ সংকল্পের উদয় হলে সময় কাটিয়ে দেবে, তাড়াতাড়ি তা সম্পাদন কোরো না।

'ক্ষণং চিত্তং, ক্ষণং বিত্তম্
ক্ষণং মানবজীবনম্।
যমস্য করুণা নাস্তি, ধর্মস্য ত্বরিতা গতিঃ।'

ক্ষণং চিত্তং – অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে চিত্ত বদল হয়ে যায়, চিত্তবৃত্তি কখনও এক রকম থাকে না। মনের মধ্যে হঠাৎ এক শুভ সংকল্পের উদয় হল – যেমন মনে করলাম আমি দান করে পুণ্য অর্জন করব, পরক্ষণেই মনের গতি বদলে গেল। মনে হল, দানের মাধ্যমে পুণ্য অর্জন করে কী হবে? যেতে দাও ভাই – দান আর করব না। এই জন্যেই যখনই মনে শুভ সংকল্প জেগে উঠবে, তৎক্ষণাৎ তা কার্যে পরিণত করবে। আর যখনই অশুভ সংকল্প মনের মধ্যে হবে, তার জন্যে সময় কাটিয়ে দেবে। চিত্তের স্বভাবই হল – ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাওয়া। অশুভ কাজ ঝট্ করে সম্পাদন করবে না। আজ করব না, কাল করব বলে ফেলে রাখবে। দু একদিন যাবার পর ওই অশুভ সংকল্প মন থেকে আপনা আপনি চলে যাবে। এজন্য 'ক্ষণং চিত্তম্' এই কথা বলা হয়েছে।

'ক্ষণং বিত্তম্' – অর্থাৎ ধন সম্পদের স্থায়িত্বের কোন ঠিক ঠিকানা নেই। আজ তুমি ধনী লোক হয়ে বসে আছ। তুমি মাসে দু'হাজার টাকা রোজগার করছ। কিন্তু পরক্ষণেই কিছু দিনের মধ্যে তুমি একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেলে, একটা কড়িও তোমার রইল না। এই কারণে বলা হয় 'ক্ষণং বিত্তম্'। এরপর 'ক্ষণং মানবজীবনম্'। মানব জীবনেরও কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। এখন তুমি বেঁচে আছ, পরক্ষণেই অতি তুচ্ছ কারণে তুমি মারা গেলে। এজন্যেই বলা হয় – 'ক্ষণং মানবজীবনম্।' এরপর 'যমস্য করুণা নাস্তি' – অর্থাৎ যমরাজের যে কোন করুণা নেই। তিনি যখন মুণ্ডু পাকড়ে ধরবেন, তখন কারোর কথা তিনি শুনবেন না। তাঁকে যদি বলা হয়, 'আমার

মনে এক শুভ কাজ করবার ইচ্ছে হয়েছে ক্ষিতুক্ষণ তুমি অপেক্ষা কর। আমার বৃদ্ধ পিতামাতা বেঁচে রয়েছেন, বরং তাঁদের আগে নিয়ে যাও।' যমরাজকে যাই বল না কেন, তিনি কোন কথা শুনবেন না, তৎক্ষণাৎ তিনি তোমাকে নিয়ে যাবেন। তাঁর কোন করুণা বলে কিছু নেই। তাই বলা হয় – যমস্য করুণা নাস্তি। এরপর 'ধর্মস্য ত্বরিতা গতিঃ'। অর্থাৎ ধর্ম কর্ম করবার জন্য যখন তোমার মনে সংকল্পের উদয় হবে, সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যে পরিণত করবে। তা না হলে তোমার সংকল্প পূরণ হবে না। এজন্যে বলা হয় 'ধর্মস্য ত্বরিতা গতি,' ধর্মের গতি খুব দ্রুত।

পিতা ঃ মহারাজ, আপনি যা যা উপদেশ দিলেন, তা অতি উত্তম। আমি যাতে এই সব উপদেশ যথাযথ পালন করতে পারি এটাই আপনার কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখ ভাই, একদিনেই তুমি সিদ্ধি লাভ করবে, তা তো হবে না। নিয়ত সাধনা করে যাও। একদিন না একদিন সিদ্ধি লাভ করবেই। এ সম্পর্কে একটি দোঁহা আছে ঃ

'দিলসে লাগা রহরে ভাই
তেরা বনৎ বনৎ বন্ যাই'।

অর্থাৎ মনে নিরন্তর তাঁর নাম জপ ও চিন্তা চালিয়ে যাও। একদিন না একদিন ঠিক ফল পাবেই। এ সম্পর্কে তুলসী দাসের একটি সুন্দর দোঁহা আছে।

'তুলসী লাগি রহো ভাই
য্যায়সা বিহানকা গাই,
মুমে তৃণ চানা টুটে
চিৎ রাখে বাছাই।'

এটির তাৎপর্য হল – সদ্য বাচ্ছা প্রসব করেছে এমন গাভী ঘাস খাচ্ছে, চানাও খাচ্ছে, কিন্তু তার মনকে বাচ্ছার প্রতি নিবদ্ধ রাখে। সেই রকম ওই গাভীর মতো তুমি সংসার করো কিন্তু তোমার মনকে ভগবানের দিকে লাগিয়ে রাখো।

পিতা ঃ মহারাজ, শরীরের চেয়ে মন যদি বড় হয়, তাহলে মনে মনে ঈশ্বর আরাধনা করে গেলে ক্ষতি কী?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ সব কাজ মনে মনে করে নেবে – এ তো ফাঁকীর কথা। তুমি মনে মনে আহার করে নিলে, তাহলে তোমার কী পেট ভরবে?

পিতা ঃ না মহারাজ, তাতে তো পেট ভরবে না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এইজন্যে স্থূল কাজ স্থূলভাবেই করতে হয়।

সূক্ষ্ম কাজ সূক্ষ্মভাবেই করতে হবে। তবে হ্যাঁ, মানস পূজাকে শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ পূজা বলা হয়েছে।

এরপর শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ শিবের মানস পূজার স্তোত্র আবৃত্তি করলেন ঃ

রত্নৈঃ কল্পিতমাসনং হিমজলৈঃ স্নানং চ দিব্যাম্বরং
নানারত্নবিভূষিতং মৃগমদামোদাঙ্কিতং চন্দনম্।।
জাতী চম্পক বিল্বপত্ররচিতং পুষ্পঞ্চ ধূপং তথা
দীপং দেব দয়ানিধে পশুপতে হৃদ্‌কল্পিতং গৃহ্যতাম্।।

(অনুবাদ – হে দেব, হে দয়ানিধি, হে পশুপতি আমার হৃদয়ে তোমার জন্য রত্নময় আসন, শীতল স্নানজল, নানারত্নখচিত দিব্যবস্ত্র, মৃগনাভির গন্ধে সুবাসিত চন্দন, জাতী, চম্পক ও বিল্বপত্রে রচিত অঞ্জলি এবং ধূপ ও দীপ কল্পিত হয়েছে, আপনি গ্রহণ করুন।)

দেখো ভাই, মানস পূজায় কত রকম উপচারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। স্থূলভাবে এত সব উপচার ভক্ত পাবে কোথায়? মনের কল্পনায় ভক্ত ভগবানের জন্য স্বর্গের সামগ্রীও এনে দিতে পারে। তবে মানস পূজা করতে গেলে অধিকারী হওয়া দরকার। তা না হলে মানস পূজা ফাঁকির পর্যায়ে চলে যাবে। ঠিক ঠিক অধিকারীর ঠিক ঠিক কাজ হয়ে থাকে। একদিন এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল, 'বাবা, সব কাজ ঈশ্বর যদি আমাকে দিয়ে করিয়ে নেন তাহলে পাপ-পুণ্য আমার হবে কেন?' তখন আমি ওই লোকটিকে একটি গল্প শুনিয়ে দিলাম। গল্পটি এরকম –

এক সাধু খুব পরিশ্রম করে একটি সুন্দর বাগান তৈরি করল, বাগানের মধ্যে নিজের হাতেই একটা কুয়ো খুঁড়ল আর একখানা চালাঘর বানিয়ে সেখানে বাস করতে লাগল। একদিন একটা গরু সাধুর বাগানে ঢুকে হঠাৎ সেই কুয়োর ভিতর পড়ে মরে গেল। এমন সময় গো হত্যার পাপ মানুষের মূর্তি ধরে সাধুর সামনে এসে হাজির হল। সাধু জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি? কী চাও?' সে বলল, 'আমি গোহত্যার পাপ, আমি তোমার শরীর মন আক্রমণ করবো।' সাধু তখন বলল, 'ভাই, তুমি অমন কথা বলছ কেন? আমি তো গো হত্যা করিনি।' পাপ পুরুষ বলল, 'তুমি যদি কুয়ো না খুঁড়তে তাহলে গরুটি মারা পড়ত না। তুমি নিজের হাতে এই কুয়ো খুঁড়েছ, কাজেই গরু হত্যার পাপও তোমাকেই ভোগ করতে হবে। তোমার দেহমনকে জীর্ণ না করে আমি তোমাকে ছাড়ছি না।' সাধু তখন তাকে বলল, 'হাতের

দেবতা হলেন ইন্দ্র। তিনি যদি আমার হাতে শক্তি না দিতেন তাহলে তো আমি কুয়ো খুঁড়তে পারতাম না। তাঁরই শক্তিতে অমি কুয়ো খুঁড়েছি। কাজেই গো হত্যার পাপ আমার নয়, ইন্দ্রের।'

পাপপুরুষ তখন ইন্দ্রের কাছে গিয়ে বলল, 'হে ইন্দ্র, তুমি তো হলে হাতের দেবতা। সাধু আমাকে বলেছে যে, তুমি তাঁর হাতে শক্তি জুগিয়েছ। সেই শক্তিতেই সে কুয়ো খুঁড়েছে। তাই সেই কুয়োয় পড়ে যে গরু মরেছে, সেই গো হত্যার জন্যে সাধু দায়ী নয়, দায়ী তুমি।' দেবরাজ ইন্দ্র দেখলেন, এ তো মুশকিলের কথা। তিনি তখন গোহত্যা পাপকে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে সাধুর বাগানে গিয়ে তার সেই সাধের বাগান লণ্ডভণ্ড করতে শুরু করলেন। সাধু দেখল একজন লোক তার বাগানে ঢুকে যথেচ্ছভাবে ফুল ছিঁড়ছে, গাছের ডালপালা মটমট করে ভেঙে ফেলছে, কুয়োয় থুথু ফেলে জল নষ্ট করছে। এইভাবে সমস্ত বাগানখানা লোকটা একেবারে তছনছ করে দিচ্ছে। সাধু রেগে গিয়ে লোকটাকে বলল, 'কেমন বেয়াদব লোক তুমি, আমার বাগান নষ্ট করছ, আমার কুয়োর জল নষ্ট করে দিচ্ছ, এ কী কাণ্ড তোমার?' ছদ্মবেশী ইন্দ্র তাকে বললেন, 'এ বাগান তোমার হল কী করে?' সাধু বলল, 'আমি নিজের হাতে এ বাগান করেছি, নিজের হাতে এ কুয়ো খুঁড়েছি, এ বাগান আমার নয়তো কার?'

ইন্দ্র গোহত্যা পাপকে ডেকে বললেন, 'নাও ভাই, এবার তুমি সাধুকে চেপে ধরো। ও নিজেই যখন বলছে – আমার বাগান, আমার কুয়ো। সবই যখন সে নিজের হাতে করেছে বলছে, তখন গো হত্যার পাপই বা আমার হতে যাবে কেন? সেটাও তো ওরই হওয়া উচিত।'

দেখো ভাই সিংহী, মন্দ কাজ মানুষের পক্ষে না করাই ভালো। অবশ্য ভালো কাজ করলে, অহংকারে মত্ত হয়ে বলি – 'আমি করেছি', তখন আর ভগবানের কথা মনে আসে না। আর মন্দ কাজের বেলাতে ভগবানের দোহাই পেড়ে বলি 'তিনি করিয়েছেন' এরকম মনোবৃত্তি ভালো নয়। এতো ফাঁকিবাজের কথা। ঈশ্বর হলেন সর্বদ্রষ্টা। তাঁকে ফাঁকি কী করে দেবে। তিনি তো সকলের অন্তর দেখতে পান। মানুষ এমনই বোকা যে ঈশ্বরকে কী করে ফাঁকি দেবে তারও মতলব করে থাকে। দেখো, একজন লোক যদি অপর একজনকে ফাঁকি দিতে চায়, তাও সে চট করে পারবে না। তোমার যখন ফাঁকির মতলব হবে, তখন অপর পক্ষ আগে থেকে সাবধান হতে শুরু করবে। এ ব্যাপারেও উদাহরণ স্বরূপ একটা গল্প আছে :–

এক বুড়ীর একটি মাত্র মেয়ে, সে থাকে শ্বশুরবাড়িতে। বুড়ীর কিছু টাকাকড়ি ছিল। একবার বুড়ীর অসুখ করল, তখন তার মেয়ে এসে তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেল। মেয়ের সেবাযত্নে বুড়ী যখন ভালো হয়ে উঠল তখন সে টাকার পুঁটুলিটা নিয়ে মেয়ের সঙ্গে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল। পথে চলতে চলতে ক্লান্তিতে বুড়ীর মেয়ের পা যেন আর চলে না। তখন তারা পথের ধারে বিশ্রাম করতে লাগল।

এমন সময় এক উটওয়ালা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বুড়ী তাকে ডেকে বলল, 'ভাই তুমি তো গ্রামের দিকেই যাচ্ছ। আমার মেয়ে আর চলতে পারছে না। তুমি কি আমার মেয়েটাকে আর আমার পুঁটুলিটা তোমার উটের উপর তুলে নিয়ে গ্রামে পৌঁছে দিতে পারবে?' উটওয়ালা বলল, 'না অত সময় আমার নেই। আমার তাড়া আছে।' এই বলে উটওয়ালা চলে গেল।

কিছুদূর যাবার পর উটওয়ালার মনে হল, কী বোকামিটাই না আমি করলাম। বুড়ীর মেয়ে আর তার টাকার পুঁটুলিটা উটের উপর তুলে নিয়ে যদি ভেগে পড়তাম তাহলে বুড়ীর সাধ্য ছিল না যে আমাকে ধরে। ফাঁকতালে দুটো জিনিসই আমার মিলে যেত। যাই, দেখি একবার বুড়ীর কাছে গিয়ে।

উটওয়ালা যখন এইসব ভাবছে, ঠিক তখনই বুড়ির মনে চিন্তা হল – আরে কী বেকুবিই না আমি করতে যাচ্ছিলাম। কোথাকার কে উটওয়ালা। জানিনা শুনিনা, লোক ভালো কী মন্দ কিছুই বলা যায় না, এমন লোকের সঙ্গে মেয়েকে একলা ছেড়ে দিচ্ছিলাম। মেয়ে আর টাকার পুঁটুলিটা নিয়ে সে যদি উধাও হতে যেত? ভগবান আমাকে ঘোর বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

এমন সময় উটওলা বুড়ীর কাছে ফিরে এসে বলল, 'ও বুড়ীমা, তোমার মেয়ে আর পুঁটুলিটা উটের উপর চাপিয়ে দাও, আমি গ্রামে পৌঁছে দেব।' বুড়ী বলল, 'তার আর দরকার হবে না। যিনি তোমার মনে কুবুদ্ধি জুগিয়ে দিয়েছেন, তিনিই আমাকে সাবধান হবার কথা বলে দিয়েছেন।'

এই গল্পটির তাৎপর্য হল – অনেক সময় দেখা যায় যে, একজনের মনে কোন চিন্তার উদয় হলে আর একজন তা জানতে পারে। এ যেন বিনা তারের টেলিগ্রাফ। টেলিগ্রাফের সঙ্গে কোন তারের সংযোগ থাকে না। কিন্তু তোমার মনে যে চিন্তার উদয় হল, তা অপর পক্ষের মনে সেই ভাব পৌঁছে যায়। মানুষের মনেই যদি এরকম হয়, তাহলে ঈশ্বরের কাছে সেই ভাব কী করে গোপন রাখবে? তোমার মনোবৃত্তি যেমন হবে, তা সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাবে। ঈশ্বর তো দূরে থাকেন না।

তিনি তো তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে, সকলের মধ্যে অবস্থান করছেন। এইজন্য বলা হয়, 'ঘট্ ঘট্ বিরাজে রাম'। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে রামচন্দ্রজী বিরাজ করছেন। তাঁকে ছাড়া কোন বস্তুই নেই। ঈশ্বর হলেন – 'অণোরণীয়ান্, মহতো মহীয়ান্।' তিনি ক্ষুদ্র থেকেও ক্ষুদ্র, আবার বিরাট থেকেও বিরাট।

দেখো ভাই সিংহী, কোন কোন ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলে – বাবা, আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র, ঈশ্বর তো মহান, তাহলে আমাদের হৃদয়ে কী করে তিনি ধরে যাবেন? আমি তখন তাদের বলি – বাছা, মহান বা স্থূলভাবে না ধরলেও অনুভবে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে ধরে যাবেন।

পিতা ঃ মহারাজ, আমাদের এই বাংলায় এক কবি সুন্দরভাবে এটি ব্যক্ত করেছেন। আমি আপনাকে শোনাচ্ছি –

'বিন্দু আমি, সিন্ধু তুমি অসীম অপার
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে স্থান না হয় তোমার
বিন্দু জলে বিম্বরূপে প্রবেশে ভাস্কর
তেমতি প্রবেশ তুমি আমার ভিতর।'

(তারাকুমার বিদ্যারত্ন)

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ, ভাই এটি বেশ ভাল লিখেছেন। আমি হলাম বিন্দু। ঈশ্বর বিশ্বরূপেই আমার হৃদ্‌কমলে বসে যাবেন। ঈশ্বর হলেন সর্বরূপ বিভু। তিনি কেন বিশ্বরূপ হতে পারবেন না?

তারপর শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন – ভাই সিংহী, তুমি এখানে আছো তো?

পিতা ঃ হ্যাঁ মহারাজ, আমি তো এখানেই আছি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই, তোমার শরীরটা এখানে বসে আছে বটে, কিন্তু তোমার মনিরাম অর্থাৎ মনটা কোথায় চলে গেছে।

পিতা ঃ হ্যাঁ মহারাজ, আমার মন কিছুক্ষণের জন্য কলকাতায় চলে গিয়েছিল। আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে, পুত্রের উপর যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে এসেছি, তা ঠিক ঠিক করতে পারছে কি না আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মহারাজ, আমি তো আপনার উপদেশ শোনবার জন্যেই এখানে বসে আছি, কিন্তু আমার মন এখান থেকে উড়ে চলে গেছে কলকাতায়। মনকে স্থির করবার উপায় কী মহারাজ?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই, মনকে বেশ খানিকটা ছুটিয়ে মারো, ছুটতে ছুটতে

যখন আর পারবে না, তখনই মন স্থির হয়ে যাবে। হঠযোগে মনকে স্থির করবার নানা প্রক্রিয়ার কথা বলা আছে। এই সব ক্রিয়ায় মনকে জোর করে স্থির করা যায়, কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা সহজ নয়। তোমাদের পক্ষে সহজ হল রাজযোগ। রাজযোগে মনের উপর কোন জবরদস্তি করতে হয় না। শুধু তার পিঠে হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে মনকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয়। অর্থাৎ মনকে সদা সর্বদা বিচারে নিযুক্ত করে দিতে হয়। জ্ঞানরূপী গঙ্গা বয়ে চলেছে। দুপাশে রয়েছে বিচাররূপী তট। মনরূপী ঘোড়াকে বেশ কয়েক ঘা চাবুক মেরে বিচাররূপী তটে ছেড়ে দাও। অমনি সে ছুটতে সুরু করবে। কিন্তু কতদূর সে ছুটবে? জ্ঞানগঙ্গার তীর শুধু যে বালিতে ভরা, সেই বিচারের বালি ভেদ করে মনরূপী ঘোড়া বেশি দূর ছুটতে পারবে না। আপনা আপনি থেমে যাবে। আর একবার বসে গেলেই সে স্থির হয়ে যাবে। তাই

'যত্র যত্র মন যাতি
তত্র তত্র সমাধয়।'

অর্থাৎ, মন যেখানে যেখানে যায়, সেখানেই তাকে সমাধিস্থ করে দাও। ভগবান সর্বব্যাপী বিভু। তাঁর চৈতন্য সত্তা ছেড়ে, তাঁর রাজত্ব ছেড়ে মন যাবে কোথায়? তাঁর এলাকা ছেড়ে একেবারে উধাও হয়ে যাবার মতো জায়গা তো নেই। কাজেই যে জিনিস নিয়ে ভাবতে বসবে, সে জিনিসেই যে ভগবানের চৈতন্য সত্তা রয়েছে, তা তাকে বিচারের দ্বারা বুঝিয়ে দাও। তার মধ্যেই ভগবানকে উপলব্ধি করে মনকে সমাধিস্থ করে দাও।

পিতা ঃ মহারাজ, আপনি বললেন, 'যত্র যত্র মন যাতি, তত্র তত্র সমাধয়।' আমাদের বাংলার এক কবি উক্ত ভাবকে গ্রহণ করে কবিতার একটি পংক্তিতে বলে গেছেন –

'স্থাবর জঙ্গম না দেখে
দেখে তারই অঙ্গ
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ সঙ্গ।'

মহারাজ, কবিতার এই ভাষা আর পূর্বোক্ত দোঁহার ভাষার মধ্যে ফারাক কোথায়? ভাষার ফারাক থাকলেও দুটির ভাব কিন্তু একই। কবিতার অর্থ হল – ভক্ত স্থাবর জঙ্গম কিছুই সে দেখছে না। তার দৃষ্টি যেখানেই পড়ছে সেখানেই সে ভগবান কৃষ্ণের মূর্তি দেখছে। ভক্তের মধ্যে ভাবোন্মাদ এসে গেছে। মহারাজ, ভক্তের ভাবোন্মাদ আর জ্ঞানীর সমাধি - এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই, পার্থক্য কিছু নেই। ভক্তের যখন ভাবোন্মাদ হয়, তখন তার বাহ্যিক কোনও জ্ঞান থাকে না। সমাধিতে মগ্ন জ্ঞানীর অবস্থা ঠিক একই রকম। তবে জ্ঞানপথ বেশ কঠিন। ভক্তিপথ সুগম ও সহজ।

পিতা ঃ মহারাজ, এখানে খুব সুন্দর সৎসঙ্গের মধ্যে রয়েছি। এই সৎসঙ্গ আমার খুব মধুর লাগছে। কিন্তু এই সৎসঙ্গ শুনতে শুনতে মাঝে মাঝেই আমার মন অফিসের দিকে চলে যাচ্ছে, মনে মনে ভাবছি আমি এখানে বসে আছি আর আমার পুত্র টাকা রোজগার করতে পারছে না, অনেক টাকা সে লোকসান করে ফেলবে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই সিংহী, কত টাকা তুমি রোজগার কর? তোমার ভাগ্য ভাল যে পরমাত্মা তোমাকে আপনা থেকেই দিচ্ছেন। আমি রোজগার করছি, এই ভাব তুমি ত্যাগ কর। ঈশ্বর আমাকে টাকা কড়ি দিচ্ছেন – এই ভাবে ভাবিত হও। এ সম্পর্কে দৃষ্টান্তমূলক একটা গল্প শোনাচ্ছি।

দুজন ফকির ছিল। তাদের মধ্যে একজনের মুখের বুলি ছিল –

'জিস্‌কো দিয়া মৌলা
উসকো কেয়া দেগা আসফদ্দৌলা?'

এ কথার তাৎপর্য হল, ঈশ্বর যাকে দেন, বাদশা আসফদ্দৌলা তাকে আর কী দেবে?

আর একজন ফকিরের মুখের বুলি ছিল –

'জিস্‌কো দিয়া আসফদ্দৌলা
উসকো কেয়া দেগা মৌলা?'

বাদশা আসফদৌল্লা যাকে দেন ঈশ্বর আর তাকে কী দেবেন? এর অর্থ হল বাদশা আসফদৌল্লার দয়ায় যখন সব কিছু পাওয়া যাচ্ছে, তখন আর ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই।

একদিন দুই ফকির বাদশার দরবারে এসে নিজের নিজের বুলি বাদশাকে শোনাতে লাগল। দ্বিতীয় ফকির বাদশাকে ঈশ্বরের চেয়েও বড়ো বলেছিল, তাই বাদশা তাকে কাছে ডাকলেন। ফকির ভাবল, বাদশা যখন আমার উপর খুশি হয়েছেন, তখন তিনি নিশ্চয় আমাকে অনেক ধনদৌলত দেবেন। বাদশা একটা তরমুজের ভিতর হীরে জহরত ভরে সেই তরমুজটা দ্বিতীয় ফকিরকে দিলেন। ফকির জানত না যে তরমুজের ভিতর মহামূল্য সম্পদ রয়েছে। তাই সে ভাবল বাদশার এত ধনদৌলত থাকতে আমাকে কিনা সামান্য একটা তরমুজ দিলেন। এ তরমুজ আমি খাব না। এই

ভেবে তরমুজটা বিক্রি করবে বলে সে এক ফলওয়ালার কাছে গিয়ে বলল, 'আট আনায় তুমি এই তরমুজটা নেবে?' ফলওয়ালা দেখল যে, তরমুজটা ভালই, এটা সে বারো আনায় বিক্রি করতে পারবে। তাই দরাদরি না করে আট আনায় সে ফকিরের কাছ থেকে তরমুজটা কিনে নিল।

এদিকে প্রথম ফকির বাদশার দরবার থেকে বেরিয়ে ভিক্ষে করতে বের হল। ভিক্ষে করে সে বারো আনা পয়সা পেল। সেই বারো আনা নিয়ে সে বাজারে গেল আটা কিনতে, কিন্তু বাজারে গিয়ে হঠাৎ তার তরমুজ খাওয়ার শখ হল। সে তখন ফলওয়ালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার এ তরমুজের দাম কত?' ফলওয়ালা বলল, 'বারো আনা।' ফকির তখন সেই তরমুজ কিনে নিয়ে এক গাছতলায় গিয়ে বসল। তরমুজ কাটতেই সে দেখল যে তার মধ্যে মণি মুক্তো ঠাসা রয়েছে। ফকির তখন ভগবানের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, 'হে ঈশ্বর, তুমি যাকে দাও, তাকে তুমি এমনিভাবে তরমুজ ভর্ত্তি করে দাও।'

আবার একদিন দুই ফকির এসেছে বাদশার দরবারে। বাদশা যে ফকিরকে তরমুজ দিয়েছিলেন, তাকে তিনি ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে যে তরমুজ দিয়েছিলাম তা দিয়ে তুমি কী করলে?' ফকির বলল, 'আমি ফলওয়ালার কাছে আট আনায় বিক্রি করেছিলাম।' বাদশা তখন ফলওয়ালাকে ডাকলেন। সে বলল 'আমি বারো আনায় এক ফকিরের কাছে তরমুজটি বেচেছিলাম।' এবার প্রথম ফকিরের ডাক পড়ল। সে বলল, 'হুজুর, আমি তো প্রথমে শুনিয়েছিলাম যে, মালিক যাকে দেন, বাদশা আসফদ্দৌলা তাকে আর কী দেবে? তখন আপনি আমার উপর রাগ করে আমাকে কিছু না দিয়েই বিদায় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন দেখুন আমার কথা ঠিক কিনা। আপনি আমাকে কিছুই দেন নি, কিন্তু ভগবানই আমাকে তরমুজ ভর্ত্তি করে হীরে জহরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

বাদশা এবার বুঝতে পারলেন যে, দেবার মালিক তিনি নন, ঈশ্বর যাকে দেন, শুধু তারই কপালে ঐশ্বর্য প্রাপ্তি হয়। এখন তিনজনের বোধ হল 'জিসকো দিয়া মৌলা, উসকো কেয়া দেগা আসফদ্দৌলা?' দেখো ভাই সিংহী, আমরা বলে থাকি, আমি এ কাজটা করেছি। কিন্তু তা নয়। গীতা শাস্ত্রে শ্রীভগবান বলেছেন – 'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্' (গীঃ ১১/৩৩) অর্থাৎ, হে সব্যসাচী, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। সত্যি সত্যিই মানুষ নিমিত্তমাত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভগবানই সব কিছু হয়ে করছেন। আমি অফিস চালাচ্ছি, আমি উপার্জন করছি – এসব কথা মোটেই ঠিক

নয়। ঈশ্বর তোমাকে দিয়ে এসব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন – তুমি উপার্জন করছ না। এখন শঙ্কা হচ্ছে যে, ঈশ্বর একজনকে দিচ্ছেন, আর একজনকে দিচ্ছেন না। এ সম্পর্কে শাস্ত্র বলেছেন, যার যেমন কর্ম, তার তেমন ফল মেলে। বিগত জন্মের পুরুষকার এ জন্মে ফল দিচ্ছে। এজন্য দানের মতো পুণ্য কাজ করাই বিধেয়। তোমার কৃত দান তোমার জন্মান্তরের পুঁজি হয়ে দাঁড়াবে। এক টাকা উপার্জন করলে ওই টাকা খরচ করবার শাস্ত্রীয় বিধি আছে। যেমন আট আনা ব্যয় করতে হবে খাওয়া-দাওয়ার জন্য, চার আনা অসময়ের জন্য রেখে দিতে হবে। আর বাকী চার আনা দান করতে হবে। এই দান তোমার বড় ব্যাঙ্কের পুঁজি হবে, তা জন্মান্তরে পাবে। এ সম্পর্কে একটি ভাল দৃষ্টান্ত আছে, আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, তাহলে তোমার পক্ষে সহজে বোধগম্য হবে।

এক ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ছিল। তারা ছিল বড় গরীব। ভিক্ষে করে তাদের কোন রকমে দিন কাটে। কোনদিন আধপেটার বেশি তাদের খাবার জোটে না। তাই ব্রাহ্মণী একদিন ব্রাহ্মণকে বলল, 'তুমি দূর দূর গ্রামে ভিক্ষে করতে যাও তাহলে অনেক বেশি ভিক্ষে মিলবে। ব্রাহ্মণীর কথা শুনে ব্রাহ্মণ দূর গ্রামে গিয়ে ভিক্ষে করতে গেল, কিন্তু তাদের কপালে আধপেটার বেশি খাবার জুটল না। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একদিন তারা ঠিক করল যে, তারা জলে ডুবে মরবে। এই ভেবে তারা দুজনে একটি সরোবরে গিয়ে নামল। এমন সময় নারদ ঋষি সেখান দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন যে, এক ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সরোবরের জলে ডুবে মরতে চলেছে। তিনি তখন তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা ডুবে মরতে চাও কেন? কী তোমাদের দুঃখ তা আমাকে বলো।' তারা বলল, 'প্রভু, কোনোদিন আমরা পেট ভরে খেতে পাইনে, রোজ আধপেট' খেয়ে থাকতে হয়। খিদের জ্বালা আর সহ্য করতে পারছি না, তাই ঠিক করেছি প্রাণ আর আমরা রাখব না।' তখন নারদ বললেন, 'দেখো ভাই, পালনকর্তা হলেন বিষ্ণু। আমি একবার তার কাছে গিয়ে কথা বলে আসি। আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি ততক্ষণ তোমরা প্রাণ ত্যাগ করবে না।' ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী নারদের কথায় রাজী হল।

কিছুক্ষণ পর নারদ ফিরে এসে বললেন, 'ভাই, পূর্বজন্মে যে তোমরা দান ধ্যান কিছুই করোনি, তাই এ জন্মে তোমাদের খাওয়া জুটছে না। একদিন শুধু এক গরীবকে তোমরা আধপেটা খেতে দিয়েছিলে, তারই পুণ্যফলে ভগবান বিষ্ণুর কাছে তোমাদের আটআনা জমা রয়েছে আর তাইতেই তোমরা রোজ আধপেটা খেতে পাচ্ছ।' এই

কথা শুনে ব্রাহ্মণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে নারদকে বলল, 'প্রভু, এতই যখন করলেন, তখন আমাদের জন্য আর একটু কষ্ট স্বীকার করুন। দয়া করে আর একবার বিষ্ণুর কাছে গিয়ে আমাদের আধুলিটা চেয়ে এনে দিন।' নারদ বললেন, 'আরে মূর্খ, ওই আধুলি জমা আছে বলেই তো তার দৌলতে তোমাদের আধপেটা খাওয়া জুটছে। সেটাও যদি চেয়ে নাও – তাহলে যে না খেতে পেয়ে মরবে। এখন তবু যা হোক আধপেটা খেতে পাচ্ছ, তখন যে কিছুই জুটবে না।' ব্রাহ্মণ তবু নারদকে বলল, 'দোহাই প্রভু, আটআনা পয়সা এনে দিন।' নারদ আর কী করেন? বিষ্ণুলোক থেকে তিনি আধুলি নিয়ে এসে ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ তখন ওই আধুলি দিয়ে চাল, ডাল, তরিতরকারী, আটা, ঘি, তেল, নুন সব কিনে এনে ব্রাহ্মণীকে বলল, 'আজ খুব ভালো করে রান্না কর দেখি।' ব্রাহ্মণীও খুব যত্ন করে মনের মতো রান্না করল। কিন্তু এত যে রান্না হল, ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী তার কিছুই খেল না, দুপুরবেলা এক গরীব ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে তাকে তারা পরম পরিতোষের সঙ্গে আহার করাল। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুর তহবিলে ব্রাহ্মণ দম্পতির নামে এক টাকা জমা পড়ে গেল।

পরের দিন ভিক্ষে করে ব্রাহ্মণ যা পেল তাতে দুজন পেট ভরে খেতে পারে। কিন্তু সেদিনও তারা কিছু খেল না, পরিপাটি রান্না করে দুজন দুঃখীকে ডেকে পেটভরে তাদের খেতে দিল। তৃতীয়দিনে ব্রাহ্মণ অনেক জিনিস নিয়ে ঘরে ফিরল এবং আগের দু দিনের মতো নিজে উপবাসী থেকে রান্না করা সব খাবার গরীব দুঃখীদের ডেকে খাইয়ে দিল। এই ভাবে পাঁচদিন কাটল। তখন গ্রামের মানুষের দৃষ্টি পড়ল তাদের দিকে। এত গরীব, তবু নিজেরা না খেয়ে গরীব দুঃখীদের খেতে দিচ্ছে। তাদের এই দয়া দেখে গ্রামবাসীরা মুগ্ধ হয়ে গেল এবং তারপর থেকে ব্রাহ্মণ দম্পতিকে প্রতিদিন তারা সিধে পাঠাতে লাগল। তখন থেকে ব্রাহ্মণেরও আর ভিক্ষে করার দরকার হল না।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর আর কোন দুঃখ নেই। পরম আনন্দে তাদের দিন কেটে যাচ্ছে। এমন সময় নারদ আবার একদিন তাদের কাছে এলেন। ব্রাহ্মণের ঐশ্বর্য দেখে নারদ তো অবাক। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই, তুমি তো ভিক্ষে করে কোন মতে দিন কাটাতে, এত ঐশ্বর্য তুমি পেলে কোথায়?' ব্রাহ্মণ তখন হাসতে হাসতে বলল, 'প্রভু, সেই যে আধুলি আপনি আমাকে এনে দিয়েছিলেন, সেই পয়সা খাটিয়েই আমি আমার পুঁজি বাড়িয়ে তুলেছি।' এই বলে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা ব্রাহ্মণ

নারদকে শোনাল। নারদ দেখলেন – ব্রাহ্মণ বেশ বুদ্ধিমান, নইলে এমন কৌশল করে বড় ব্যাঙ্কে নিজের পুঁজি কেউ বাড়িয়ে তুলে পারে?

দেখো ভাই, সিংহী, তুমি যে অফিসে এত টাকা রোজগার করছ, তার কারণ আগের জন্মে অনেক পুণ্য করেছিলে, তার ফলে বড় ব্যাঙ্কে তোমার পুঁজি হয়ে রয়েছে, তা না হলে সবাই তো তোমার মতো রোজগার করতে পারত। তাতো হয় না, যার পুঁজি আছে তারই কোনো না কোনো প্রকারে টাকা মিলে যায়। দেখো ভাই, আগের জন্মের পুঁজি থেকে তোমার এত সব কিছু মিলে যাচ্ছে কিন্তু এই জন্মে আবার কিছু পুঁজি বাড়াবার চেষ্টা করো, দান করে পুণ্য অর্জন করো। এভাবে পুঁজি বাড়াও নইলে পরজন্মে তোমাকে কষ্টে পড়তে হবে, না খেয়ে মরতে হবে।

পিতা ঃ মহারাজ, কত সুন্দর সৎসঙ্গের কথা আপনি আমাদের কল্যাণের জন্য শোনাচ্ছেন। আমরা এমনই নরাধম যে আপনার প্রবচন আমরা গ্রহণ করছি না। এ সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই।

শ্রীগুরু ঃ না ভাই, তুমি তো আমার প্রবচন গ্রহণ করছ। তুমি কি সেই আগের সিংহী আছ? তুমি যখন প্রথম আমার কাছে এসেছিলে, তখন তুমি জলের বদলে মদ পান করতে। আমার কাছে আসার পর মদ ছেড়ে দিয়ে এখন তুমি ধর্মসুরা পান করে যাচ্ছ। আমি তো জানি, আগেকার সিংহী মরে গেছে। এখনকার সিংহী নতুন হয়ে গেছে। আমি তো ভাই তোমাকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গণ্য করে থাকি। যখন কোন মাতাল এখানে এসে পড়ে, আমি তাকে বলি – তুমি মদ ছেড়ে দাও, আর মদ খেয়ো না। তখন সেই লোকটি আমাকে বলে – মহারাজ, কোনো লোক যদি একবার মদ খেতে শুরু করে, তাহলে সে আর মদ ছাড়তে পারে না। আমি তখন ত. ক বলি - দেখো, আমার সিংহী এক আদর্শ পুরুষ, যেদিন সে আমার কাছে এল, আমার সঙ্গ করল, তারপর থেকেই সে আর মদ স্পর্শ করেনি।

পিতা ঃ মহারাজ, আমি নরপশু ছিলাম। আপনার কৃপায় পশুজন্ম থেকে আমি উদ্ধার পেয়েছি। মহারাজ, আপনার চরণে আমার বিনীত প্রার্থনা – আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার চরণ-কমল যেন আমার স্মরণে থাকে আর আমার সন্তান-সন্ততিরা যেন আপনার দাসানুদাস হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ আশ্রম ঃ ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, মাঘ মাস ঃ সময় – বিকেল

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র সিংহ

ও

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[অভিমানই শোক দুঃখের কারণ ঃ শ্রীগুরুদেবের উপদেশ শ্রবণকারীদের তিন রকমের স্বভাব ঃ যা হবার তা হবেই, তা রোধ করবার ক্ষমতা কারোর নেই ঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় অনুসারে কয়েকটি শ্লোকে বর্ণিত – মানুষের কেন শোক করা উচিত নয় ঃ ভাগ্য গণনা করা উচিত অথবা অনুচিত, যার যা কাল নির্দিষ্ট তা পূর্ণ হলেই তাকে ইহলোক ছেড়ে চলে যেতে হবে।]

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র সিংহের তৃতীয়া কন্যা উমারাণীর মাত্র তের বছর বয়সে বৈধব্য দশা হওয়াতে তিনি শোক বিমর্ষচিত্তে কন্যাটিকে নিয়ে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে ও তাঁর উপদেশ বাণী শ্রবণে শান্তি লাভ করবার মানসে এসেছিলেন, আমিও সঙ্গে ছিলাম। আমরা শিব মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুদেবের দর্শন পেলাম ও শোকার্ত হৃদয়ে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করলাম।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা পূর্ণ, তুমি শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছ, শোককে তোমায় ত্যাগ করতেই হবে, তা না হলে শোকাগ্নি তোমাকে একেবারে দগ্ধিভূত করে ফেলবে।

পূর্ণ ঃ মহারাজ, আমি শোক সংবরণ করতে পারছি না। আমার এই বালিকা মেয়েকে যখনই দেখছি তখনই আমার হৃদয় জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ তুমি তোমার মেয়েকে সুখী বা দুঃখী করতে সমর্থ হবে? ভাই, তোমার মেয়ের সুখ-দুঃখ তো তোমার হাতে নেই। সে নিজের প্রারব্ধ নিয়ে এসেছে, নিজের প্রারব্ধ নিয়েই তাকে চলে যেতে হবে। তুমি তার বাবা, এই অভিমান যদি ছাড়তে পারো, তবেই তোমার শোক ঘুচবে। দেখো, সংসারে কত মেয়ের এরকম বিপর্যয় ঘটছে, কই তুমি তো তাদের জন্য দুঃখ করো না। তোমার মেয়ের চেয়ে আরও বেশি দুঃখী কত মেয়ে রয়েছে। যখন নিজের দুঃখ হবে তখন নিজের চেয়ে ঢের বেশি দুঃখী যারা, তাদের দিকে চেয়ে দেখো, তাতে দুঃখের কিছুটা লাঘব হবে। কীভাবে? পিতারূপে তুমি বর্তমান রয়েছ, তোমার এই মেয়ে যাতে সুখে থাকে, খাওয়া-পরার যাতে কোনো কষ্ট না হয় সেদিকে তোমার সজাগ দৃষ্টি রয়েছে।

কিন্তু এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের পিতা, পুত্র, স্বামী কেউই নেই, সবাই মরে গেছে, খাওয়া-পরার মতো একটা পয়সাও তাদের হাতে নেই। তাদের দেখলে তোমার মনে হবে, আমার মেয়ের চেয়েও কী ভয়ঙ্কর অবস্থা এদের! তা দেখেও তুমি কিছুটা সান্ত্বনা পাবে। আর যখন তোমার খুব অহঙ্কার হবে এই ভেবে যে আমি কত সুখী, আমার কত ধনসম্পদ আছে, আমার কত নাম-যশ আছে, তখন তুমি কী করবে? তুমি তখন তোমার চেয়ে সুখী, মানী, যশস্বী ব্যক্তির উপর দৃষ্টিপাত করবে। তাহলে দেখবে যে তোমার গর্ব খর্ব হয়ে গেছে। তখন তোমার মনে হবে যে আমি কীসের অহংকার করছি? আমার চেয়ে ধনী মানী যশস্বী ব্যক্তি কত আছে, এই ভাবনা করতে করতে দেখবে তোমার অহংকার চলে গেছে।

দেখো বাছা পূর্ণ, তুমি বলছো যে তোমার জামাই মারা গেছে। এজন্যে তোমার দুঃখ হচ্ছে তা আমি মানছি। এই জামাই কী তোমারই ছিল? সে যদি তোমারই হবে, তাহলে তাকে যেতে দিলে কেন? কেন তাকে আটকে রাখলে না? আমার জিনিস তা আমি ছাড়ব না, তাতো হয় না, ভগবানের জিনিস ভগবানই নিয়েছেন, এর জন্য তুমি দুঃখ কোরো না। 'আমার' এই অভিমান ত্যাগ করো, তাহলে শোক দূর হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে একটি ছোট গল্প তোমাকে বলছি, তা থেকেই আমার কথাটি সহজেই বুঝতে পারবে।

অভিমানই শোক দুঃখের কারণ ঃ

মাড়োয়ার দেশে এক বণিক বাস করত। ঘরে ছিল তার মা আর স্ত্রী। বণিক ভাবল – এখানে পড়ে না থেকে দূরদেশে যাই, সেখানে গিয়ে ব্যবসার উন্নতি হবে, অনেক টাকাও রোজগার করা যাবে। এই ভেবে বণিক তার মা আর স্ত্রীকে বলল ঃ 'আমি ব্যবসা করতে কলকাতায় যাব, সেখানে গেলে অনেক বেশি উপার্জন করতে পারব। তোমরা দু'জনে দেশেই থাকো।' মা আর স্ত্রী বলল, 'তোমার বেশি উপার্জনের দরকার কী? এখানে যা রোজগার করছ, তাই তো যথেষ্ট। তোমাকে আর দূরদেশে যেতে হবে না।' বণিক তাদের অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে কলকাতার দিকে রওনা হল। তখনকার দিনে রেলগাড়ী তো ছিল না। হাঁটাপথ, পথও দুর্গম। তাই বহুদিন লেগে গেল কলকাতায় পৌঁছতে।

বণিক যখন কলকাতায় চলে আসে, তখন তাঁর স্ত্রী ছিল অন্তঃসত্ত্বা। কিছুদিন বাদে বণিকের এক ছেলে হল। যথাসময়ে বণিকের কাছে সেই খবর এসে পৌঁছল, বণিক জানতে পারল তার এক ছেলে হয়েছে। ছেলেটি ক্রমশ বড় হতে লাগল।

বাল্য, কৈশোর অতিক্রম করে যখন সে যৌবনে পা দিল তখনও তার পিতৃদর্শন ঘটেনি। তাই একদিন সে তার মাকে বলল, 'মা, আমি কখনো বাবাকে দেখিনি, তাই একবার কলকাতায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।' মা তাকে নানাভাবে নিরস্ত করতে চাইল, কিন্তু ছেলে কোন কথা শুনল না। সে বাবার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে বণিকও তখন ভাবছে, বহুদিন হয়ে গেল, কলকাতায় এসেছি, ধনসম্পদও প্রচুর জমে গেছে, আর কেন বিদেশে পড়ে থাকি। এবার দেশে ফেরা যাক। এই ভেবে অনেক চাকর-বাকর সঙ্গে নিয়ে ডুলিতে চেপে সে দেশের দিকে রওনা হল। সন্ধ্যেবেলা এক চটিতে পৌঁছে বণিক চটিওয়ালাকে বলল, 'আমার সঙ্গে অনেক লোকজন রয়েছে, আমাকে তিনটে ঘর দিতে হবে।' চটিওয়ালা বলল, 'হুজুর, আমার মোটে তিনখানাই ঘর আছে, তার একটাতে একজন লোক এসে রয়েছে। তার আবার কলেরা হয়েছে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।' বণিক বলল 'তিনখানা ঘর না হলে তো আমার চলবে না। তুমি লোকটাকে বাইরে বের করে দিয়ে ঘরখানা ভালো করে পরিষ্কার করে দাও। আমি তোমাকে অনেক টাকা বক্‌শিশ দেব।' চটিওয়ালা খুব গরীব, বকশিশের লোভে সে কলেরা রুগীকে বাইরে এক গাছের তলায় ফেলে রেখে এল। শীতের রাত। সেখানে পড়ে থেকে ভোরের দিকে লোকটা মারা গেল।

সকালবেলা বণিক দাঁত মাজতে মাজতে চাকরদের জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে, কালকের সেই রুগীটাকে দেখেছিস? বেঁচে আছে না মারা গেছে?' চাকররা বলল, 'কাল সারারাত সে বেঁচে ছিল, আজ ভোরবেলায় মারা গেছে।' বণিকের কৌতুহল হল — একবার দেখে আসি। গাছতলায় তখন মানুষের ভিড় জমেছে। বণিকও সেখানে এসে উপস্থিত হল। ভিড়ের মধ্যে মাড়োয়ার দেশের একটি লোক তখন খুব কাঁদছে আর বলছে, 'আহা রে, অমুক বণিকের ছেলে দেশ থেকে আসছিল বাপকে দেখবে বলে, তার কিনা এই দশা হল। ঘরে তার মা আর বুড়ি ঠাকুমা রয়েছে। বাপের খোঁজে কলকাতায় যাচ্ছিল। তা আর হল না। বেঘোরে মারা গেল গো।' সেই কথা শোনামাত্র বণিক বুঝতে পারল – এ তো আমারই ছেলে। 'আমার ছেলে' এ কথা মনে হতেই শোকে সে অধীর হয়ে পড়ল, তার আর দাঁড়াবার সামর্থ্য রইল না। মাটিতে বসে পড়ে ছেলের মৃতদেহ সে কোলে তুলে নিল আর বুক চাপড়ে চুল ছিঁড়ে ডাক ছেড়ে সে কাঁদতে লাগল।

তা হলে দেখো ভাই পূর্ণ, শোক কোথায় থাকে? রুগীপুত্রকে চটির বাইরে রেখে দিল – বণিকের দুঃখ হল না, ওই পুত্র মারা গেল তখনও সে অন্যান্যদের সাথে

তামাসা দেখতে লাগল। যখন বণিক জানতে পারল যে, মৃত লোকটি তার নিজের পুত্র, তখন তার শোক উথলে পড়ল। আমরা শোকাহত হই তখনই, যখন মৃতের সঙ্গে আমি নিজেকে যুক্ত করি, 'আমার' বলে অভিমান করি। শোকের পারে যেতে হলে তাই 'আমি' 'আমার' এই বোধটি বিসর্জন দিতে হবে।

পূর্ণ ঃ মহারাজ, আপনার ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তস্বরূপ গল্প শুনে অনুভব হচ্ছে যে শোক দুঃখ দেনেওয়ালা বাইরের কেউ নয়। বাহ্য বস্তুর সংযোগে বণিকের পুত্র মারা যাবার দরুণ তার পুত্র শোক হল – এমন নয়। যখন তাঁর ভিতরে অভিমান হল যে মৃতপুত্রটি আমার তখনই বণিকের পুত্রশোক দেখা দিল। মহারাজ, আপনার কাছে এই সরল মধুর উপদেশ শুনে এখন আমার কোন শোক নেই। পরশুদিন যখন আমি আপনার কাছ থেকে চলে যাব, তখন আমার চিত্ত আবার শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো বাছা পূর্ণ, উপদেশ শুধু শুনলেই হবে না, তা শুনে মনন করতে হবে, তবেই ঠিক ধারণা মনে গেঁথে যাবে। যতক্ষণ না ধারণা দৃঢ় হবে ততক্ষণ পর্যন্ত উপদেশ শ্রবণের কোন কাজ হবে না। উপদেশ শ্রবণকারীদের স্বভাব তিন রকমের হয়। যথা ঃ যাঁতির স্বভাব, চালুনির স্বভাব ও কুলোর স্বভাব। যাঁতির স্বভাব কেমন? যা হাতের কাছে পাবে, তাকেই সে কাটবে। যেমন তার্কিক লোকেরা হয়ে থাকে। তার্কিককে তুমি যতই ভাল উপদেশ দাও না কেন সে তর্ক করে উপদেশকেই উড়িয়ে দেবে। চালুনি স্বভাব কেমন? তার স্বভাব হল – ভালো জিনিস সব ফেলে দিয়ে শুধু আবর্জনাগুলিকে নিজের মধ্যে ধরে রাখবে। আর কুলোর স্বভাব কী? যা কিছু আবর্জনা সব সে ফেলে দেয়, আর যেটুকু ভালো তাকেই সে নিজের কাছে রেখে দেয়। এই তিন প্রকারের শ্রোতা আছে।

যে শ্রোতার যাঁতি স্বভাব, সে তো গুরুদেবের উপদেশ শোনামাত্রই তা খণ্ডন করে দেবে। যার চালুনি স্বভাব সেও উপদেশ শুনে সার পদার্থ ফেলে দিয়ে অসার অবান্তর কথাগুলিকে গ্রহণ করবে, আর কুলোর স্বভাব যার সে উপদেশ শুনে তা থেকে সারটুকু সে বেছে নেয়, বাড়তি যে সব বাক্যবিন্যাস, তা ত্যাগ করে। দেখো বাছা পূর্ণ, কুলোর মতো স্বভাব হওয়া চাই, তবেই আমি যে সব উপদেশ দেব, তার মর্ম তোমার হৃদয়াঙ্গম হবে।

পূর্ণ ঃ মহারাজ, আপনি আশীর্বাদ করুন। আপনার আশীর্বাদে আমার কুলোর স্বভাব হবে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো বাছা পূর্ণ, বাচ্ছা বয়স থেকেই তুমি আমার কাছে আসছ।

তোমার উপর আমার খুবই ভালবাসা প্রীতি রয়েছে।

পূর্ণ ঃ আমার মনে একটি প্রশ্ন জেগেছে। এই প্রশ্নের উত্তর আপনি বলে দিন। প্রশ্নটি হল – প্রদীপে তেল আছে, সলতেও আছে। ওই প্রদীপ কী নিভে যেতে পারে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ বাছা, প্রদীপটি নিভে যেতে পারে। প্রদীপে তেল আছে, সলতেও আছে কিন্তু প্রদীপটি যদি নিবাত স্থানে না থাকে, তাহলে ঝড় বাতাসেই প্রদীপটি নিভে যাবে। এ তো আমরা দেখে আসছি।

পূর্ণ ঃ মহারাজ, আমার মনে হয়েছে যে, আমার জামাই-এর মৃত্যু হয়নি। তেল, সলতে – এসব থাকা সত্ত্বেও বাইরের ঝড় বাতাসে তার জীবন প্রদীপ নিভে গেল। তার আয়ু থাকা সত্ত্বেও মৃত্যু হল – এটাই আমার আক্ষেপের কারণ।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না বাছা না, দৃষ্টান্ত আর দৃশ্য পদার্থ এক নয়, কিছুটা সাদৃশ্য থাকে মাত্র। তুমি একথা মনে স্থান দিও না। জামাই-এর মৃত্যুর কথা যত মনে করবে, শোকাগ্নি ততই তোমাকে দগ্ধ করে ফেলবে। প্রদীপের দৃষ্টান্ত তুমি এখানে টেনে এনো না। দেখো বাছা, পুত্র যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন জ্যোতিষী জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করে আগে থেকেই বলে দেয় জাতকের ভবিষ্যতে কী হবে না হবে। যা হবার তা হবেই। তা রোধ করার ক্ষমতা কারোর নেই। আমি তোমাকে আর একটি গল্প শোনাচ্ছি ওই গল্পের মূল ভাবটি তুমি সহজেই বুঝে নিতে পারবে।

এক সাধু ভিক্ষা করতে এক জমিদারের বাড়ি গিয়েছেন। জমিদার পরম সমাদরে তাঁকে নানারকম ভোজ্যদ্রব্য দিলেন, কিন্তু সেগুলি রান্না করবার জন্য কাঠ বা আগুন জ্বালাবার জন্য দেশলাই দিলেন না। সাধু জমিদারকে বললেন, 'আমাকে কিছু কাঠ না দিলে আমি রান্না করব কেমন করে?' সাধুর কথা শুনে জমিদার হাসতে হাসতে বললেন, 'সাধুবাবা, আপনি ঐ গাছতলায় গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমার এই বাড়িতে এখনই আগুন লেগে যাবে, আপনি তখন সেই আগুনেই রান্না সেরে নেবেন।' একথা শুনে সাধুর মনে বড় কৌতুহল হল, এ আবার বলে কী? যা হোক সত্যাসত্য নির্ণয় করে যাওয়াই ভালো, এই ভেবে সাধু জমিদার বাড়ির উল্টোদিকে এক গাছতলায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি দেখতে পেলেন যে, দাউদাউ করে জমিদার বাড়ি জ্বলছে।

ইতিমধ্যে জমিদার সাধুর কাছে এসে বললেন, 'সাধুবাবা, এখন তো আপনি প্রচুর আগুন পেয়েছেন, এই আগুনেই রান্না করে আপনি খেয়ে নিন।' শুনে সাধু বললেন, 'তোমার দেওয়া কোন জিনিসই আর আমি খাব না। তুমি কী রকম নিষ্ঠুর

নির্মম লোক যে নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, গরু ঘোড়া, ধন-দৌলত সব আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, আগে থেকে সব জেনেও তাদের রক্ষা করবার জন্য কোন চেষ্টাই করলে না। এ কী ব্যাপার?' জমিদার হেসে বললেন, 'সাধুজী, আমি একটা চিঠি দিচ্ছি। আপনি আমার এই চিঠিখানা নিয়ে আমার এক সওদাগর বন্ধু আছে, তার কাছে যান। সে আপনার প্রশ্নের উত্তর যথাযথ দেবে।' এই কথায় সাধু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তারপর জমিদারের চিঠি নিয়ে সেই সওদাগর বন্ধুর কাছে হাজির হয়ে নিজের প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করলেন।

সওদাগর তখন জাহাজে মাল বোঝাই করতে ভয়ানক ব্যস্ত। তিনি সাধুকে বললেন, 'সাধুজী, এখন তো আমার কথা বলার সময় নেই, এখুনি মালপত্র নিয়ে এই জাহাজে রওনা হতে হবে। আপনিও যাবেন আমার সঙ্গে। তিন দিনের দিন একটা জায়গায় এসে জাহাজটি ডুবে যাবে, মালপত্র সব নষ্ট হয়ে যাবে, আপনি আর আমি ছাড়া কেউ বাঁচবে না। জাহাজের একখানা কাঠ আঁকড়ে ধরে ভাসতে ভাসতে আমরা দু'জনে একটা দ্বীপে গিয়ে উঠব। সেখানে একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে তখন আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব।' শুনে তো সাধুর কৌতুহল আরও বেড়ে গেল। তিনি সওদাগরের সঙ্গে জাহাজে গিয়ে উঠলেন। দু'দিন বেশ ভালই কাটল, কিন্তু তৃতীয় দিন প্রচণ্ড ঝড় তুফানে জাহাজ ডুবে গেল। একখানা ভাঙা কাঠ আশ্রয় করে সাধু আর সওদাগর কোনক্রমে একটি দ্বীপে গিয়ে উঠলেন।

সেখানে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে সাধু তখন সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই, তুমি তো জানতে যে এই জাহাজ ডুবে যাবে, জেনে শুনেও তবু এতে এত টাকার মাল বোঝাই করালে কেন? তাছাড়া এই রকম জীবন সংকটের মতো বিপদ ঘটবে জেনেও কেন এই জাহাজে উঠলে?' সওদাগর তখন হেসে বলল, 'সাধুজী, আমি না হয় সব জেনে শুনে জাহাজে উঠেছি, কিন্তু আপনি যখন শুনলেন জাহাজ ডুবে যাবে, তখন আপনিই বা কেন জাহাজে উঠলেন?' দেখুন সাধুজী, মানুষের কখন কী হবে, তা আগে থেকেই সব ঠিক করা আছে, তাকে আটকাবার ক্ষমতা কারুর নেই।' শুনে সাধু বললেন, 'সে কী কথা! আটকাবার চেষ্টা করলেই তো আটকানো যায়।' সওদাগর একটু হেসে বলল, 'তবে শুনুন, আজ থেকে ছ'মাস বাদে অমুক তারিখে খোরাসান শহরে সুলতানের বিচারে আপনার ফাঁসি হবে। আপনাকে আমি এ খবর আগেই জানিয়ে দিলাম। এখন আপনি চেষ্টা করে দেখুন তা আটকাতে পারেন কিনা।'

সওদাগরের কথা শুনে সাধুর খুব দুশ্চিন্তা হল। তিনি ভাবলেন, এই সওদাগর ও তার বন্ধু জমিদার যা যা বলেছিল সবই তো দেখছি অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। এখন এ যা বলছে তাও তো ফলে যেতে পারে। এই ভেবে সাধু তখন মরুভূমিতে উপস্থিত হলেন এবং নিজের হাত পা কেটে ফেলে সেখানে পড়ে রইলেন। ভাবলেন, আমার তো হাত পা নেই, আমি আর খোরাসানে গিয়ে পড়ব কেমন করে? এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল। সেই পথ দিয়ে যেসব লোক যায় তারা তাঁর দুরবস্থা দেখে দয়া-পরবশ হয়ে মুখে কিছু খাবার ও জল দিয়ে যায়। কিন্তু মরুভূমিতে তো বেশি লোকজন সব সময় চলাফেরা করে না, তাই সাধুর খাওয়া-দাওয়ার বেশ কষ্ট হতে লাগল। সাধু তখন মনে মনে ভাবলেন, কেউ যদি আমাকে কোনো শহরে নিয়ে যেত, তাহলে বেশ ভালো হত। শহরে বহু লোকের বাস, রাস্তায় লোকজন সর্বদা চলাফেরা করে। তাই কোনোরকমে একবার শহরে যেতে পারলে আমার খাওয়া দাওয়ার কষ্টটা ঘুচবে। সাধু মনে মনে এইসব ভাবেন আর প্রতীক্ষায় দিন গুনতে থাকেন।

ছ'মাস শেষ হতে যখন মাত্র আর একদিন বাকি, স্বয়ং কালপুরুষ এক শকটচালকের বেশে সাধুর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ভাই, মরুভূমিতে আমার দিকভ্রম হয়েছে, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি, তুমি আমাকে দিকনির্ণয় করে দিতে পারবে?' সাধু বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, তা পারব। তুমি আমাকে তোমার গাড়িতে তুলে নাও, কোন্ দিকে যেতে হবে তা আমি তোমাকে বলে দেব। পরে তুমি আমাকে কোনো শহরের ধারে নামিয়ে দিও।' শকটচালক রাজী হয়ে সাধুকে নিজের গাড়িতে তুলে নিল, সাধুও তাকে পথের দিক নির্ণয় করে বলে দিতে লাগলেন। অবশেষে এক শহরের প্রান্তে সাধুকে নামিয়ে দিয়ে শকটচালক চলে গেল। সাধু এক গাছের তলায় পড়ে আছেন এমন সময় এক পথচারী সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সাধু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই, এই শহরের কী নাম?' পথিক বলল, 'খোরাসান'। খোরাসান – এই নাম শুনেই তো সাধু ঘাবড়ে গেলেন, ভাবতে লাগলেন, শেষে কিনা আমি খোরাসানেই এসে পড়লাম! কোথায় আমার জন্মস্থান হল কাশী, সেখান থেকে গিয়েছিলাম কাশ্মীর, সেখানে সেই জমিদারের সঙ্গে দেখা, তারপর সেই সওদাগরের সঙ্গে যোগাযোগের পর জাহাজডুবি শেষে হাত পা কেটে গুজরাটের মরুপ্রান্তরে এতদিন পড়েছিলাম, আর আজ কিনা এসে পৌঁছলাম খোরাসানে। সাধু তো আকুল হয়ে এইসব ভাবছেন। কিন্তু আসল ব্যাপার হল – এ সবই সেই কালচক্রের খেলা।

সেই শকটচালক হল কালপুরুষ। সাধুর কালচক্র পূর্ণ হতে চলেছে, তাই চালকের বেশ ধরে যথাসময়ে সে সাধুকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিয়ে গেল। খোরাসান নাম শুনেই সাধু তো প্রাণভয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন আর প্রহর গুনছেন। সেই দিনটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। সাধুর মনে ভরসা জাগল, তাহলে বোধ হয় আর আমার ফাঁসি হবে না, হাত পা কেটে মরুভূমিতে পড়ে থেকে বৃথায় এত কষ্ট ভোগ করলাম। পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই সাধু দেখেন তার পাশে একটা সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড পড়ে রয়েছে। দেখেই তো সাধুর হৃদকম্প শুরু হল। বেচারার হাত পা নেই যে সেখান থেকে কোথাও পালিয়ে বাঁচবেন। বেলা হতেই অনেক লোক জড় হয়ে গেল। শোনা গেল রাত্রে সুলতানের ছেলে খুন হয়েছে আর খুনী তার মাথা নিয়ে উধাও হয়েছে। আসলে এ-ও সেই কালপুরুষের কাজ। সে-ই ঐ নরমুণ্ডটি সাধুর পাশে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল।

সেপাইরা এসে দেখে সাধুর পাশে সুলতানের ছেলের মুণ্ড পড়ে আছে। তাঁরা তখন সাধুকে ধরে নিয়ে সুলতানের কাছে হাজির করল। সাধু বললেন, 'হুজুর, আমার তো হাত পা নেই, আমি কেমন করে আপনার ছেলের মাথা কাটব?' সুলতান তখন পুত্রশোকে অধীর, বললেন, 'তুমি কাটোনি এ কথা ঠিক, কিন্তু তুমি জানো কে এ কাজ করেছে, অথচ জেনেশুনে তুমি তার নাম বলছ না বা পরিচয় দিচ্ছ না। তাই ফাঁসিই তোমার উপযুক্ত শাস্তি। বলার সঙ্গে সঙ্গে কোতোয়ালকে তিনি হুকুম দিলেন, 'সাধুকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও।' হুকুম শুনে সাধু তখন এই দোঁহাটি আবৃত্তি করলেন –

'কাঁহা কাশী, কাঁহা কাশ্মীর, কাঁহা খোরাসান গুজরাট
পর সো রাম এ জীবকো প্রারব্ধ লে জাত।'

এইভাবেই শেষ পর্যন্ত সাধুর ফাঁসি হয়ে গেল, তিনি উপলব্ধি করে গেলেন যে জীবকে প্রারব্ধই গন্তব্যপথে টেনে নিয়ে যায় এবং যা ঘটবার সেটি ঘটায়।

দেখো ভাই পূর্ণ, প্রবল প্রারব্ধকে রোধ করা যায় না। বশিষ্ঠ এত বড় ঋষি, তিনি কি রামচন্দ্রের বনগমন রোধ করতে পারতেন না? কিন্তু তিনি তো করেননি, কারণ তিনি জানতেন যে রামের জীবনে যা যা ঘটবে তা আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। তোমাদের বাংলাদেশে একটা কথা প্রচলিত আছে – 'রাম না হতেই রামায়ণ'। রামচন্দ্র বনে যাবেন, রাবণ সীতাকে হরণ করবে আর তার ফলে রাবণ বধ হবে। যা ঘটবার তা ঘটবেই তাকে রুখবে কে? ভাই পূর্ণ, তুমি শোক ত্যাগ কর। তোমার জামাই ইহলোক ছেড়ে চলে গেছে। তারজন্য আর শোক কোরো না। শ্রীমদ্ভগবত

গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলেছেন –

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।। গী ২/১১

অর্থাৎ যাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয়, তাঁদের জন্য তুমি শোক করছ, অথচ প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ। পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কারোর জন্য শোক করেন না।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি। গী ২/১৩

অর্থাৎ যেমন দেহীর (আত্মার) এই দেহে কৌমার যৌবন ও জরা ক্রমে উপস্থিত হয়, তাতে দেহীর কোন পরিবর্তন হয় না, সেরূপ দেহান্তর প্রাপ্তিতে (মৃত্যুতে) দেহী অবিকৃত থাকেন। মৃত্যু দৈহিক বিকার মাত্র। এজন্য দেহান্তর প্রাপ্তি বিষয়ে জ্ঞানিগণ মোহগ্রস্ত হন না।

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।।'
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা –
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। গী ২/২২

অর্থাৎ মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মা সেরূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর গ্রহণ করেন।

পূর্ণ ঃ মহারাজ, আপনি বলছেন – যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে মানুষ নতুন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি আত্মা পুরাতন জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে নেয়। পুরাতন শরীর ত্যাগ করলেই যত দুঃখ শোক। পুরাতন শরীর ত্যাগ করলে আবার নতুন শরীর ধারণ হবে এই ভেবে জীবের তো আনন্দই হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো বাছা, মারা গেলে মানুষ দুঃখ পায়, এর কারণ হল অজ্ঞানতা। মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলে তখন তার আর দুঃখ থাকবে না। দেখো, কোন দেশে এমনি রেওয়াজ চালু হয়ে গেছে যে, সেখানে কেউ মারা গেলে তার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব আনন্দ করে, আর কেউ জন্মালে তারা কান্নাকাটি করে। ওদের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে গিয়েছে যে, জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই শিশু মরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে – এই ভাবনাতেই তার আত্মীয় স্বজন কাঁদতে থাকে। আর কেউ মারা গেলে তখন তারা ভাবে যে মৃত ব্যক্তি আবার নতুন শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে। এই চিন্তাতেই তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে থাকে।

পূর্ণ ঃ মহারাজ, ভাগ্য গণনা করা উচিত না অনুচিত?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না বাছা, ভাগ্য গণনা করানো ভালো নয়। কী হবে আগে থাকতে ভাগ্যের কথা জেনে? যদি গণৎকারের কাছ থেকে জানতে পারা যায় যে, এক বছরের মধ্যে আমার সর্বনাশ হতে চলেছে, তাহলে আগে থেকে এক বছর ধরে সেই শোক তোমাকে বহন করতে হবে। আবার গণৎকার যদি বলেন যে এক বছরের মধ্যে তুমি প্রচুর টাকার মালিক হবে, তাহলে আনন্দের ভাগ কমে যাবে, আগে থেকে সারা বছর ধরে তুমি আনন্দই করতে থাকবে। যা হবার তা তো হবেই, তবে ভাগ্য গণনার ফল এই হয় যে, আগে থাকতে শোক বা আনন্দ ভোগ করতে হয়। এই জন্যই ভাগ্য গণনা করা ঠিক নয়। ভূত ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়ে বর্ত্তমানকে নিয়ে থাকাই ভালো। ভবিষ্যৎ জানতে পারলে যদি আমাদের কল্যাণ হত, ভগবান আমাদের এত বুদ্ধি দিয়েছেন, ভবিষ্যৎ জানবার বুদ্ধি কি তিনি দিতেন না? তা যখন দেননি তখন বুঝতে হবে যে, ভবিষ্যৎ জেনে আমাদের কোনো লাভ নেই। এ সম্পর্কে আমার একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে যা শুনলে তুমি উপলব্ধি করতে পারবে –

আঠার প্রকারের কুষ্ঠের গল্প –

একদিন রাজা জনমেজয় ব্যাসদেবের কাছে নিজের ভাগ্য গণনা করাতে গেলেন। ব্যাসদেব রাজাকে বললেন, 'ভাগ্য গণনা করাতে তোমার কী লাভ হবে?' রাজা বললেন, 'যদি জানতে পারি ভাগ্যে কোন গ্রহের দোষ রয়েছে, তাহলে তার প্রতিকার করাব।' ব্যাসদেব হেসে বললেন, 'কিছুদিনের মধ্যে তোমার শরীরে আঠারো প্রকারের কুষ্ঠ হবে। দেখো চেষ্টা করে যদি তা রোধ করতে পারো।' এই বলে ব্যাসদেব রাজা জনমেজয়কে তাঁর ভবিষ্যৎ বলতে শুরু করলেন।

ব্যাসদেব বললেন, 'দেখো রাজা, কখনো তুমি যেন যজ্ঞের ঘোড়া কিনবে না। তবে আমি জানি আমার এই উপদেশ তুমি শুনবে না, যজ্ঞের ঘোড়া তুমি কিনবেই। বেশ, ঘোড়া না হয় তুমি কিনলে, কিন্তু ভুলেও কখনো সেই ঘোড়ায় চেপে দক্ষিণ দিকে যেও না। তাও তুমি শুনবে না, সেই দক্ষিণ দিকেই তুমি যাবে। সেখানে যদি কোন মেয়েকে দেখতে পাও, আমি নিষেধ করছি, তাকে তুমি বিয়ে কোরো না। আমি জানি, আমার এই নিষেধ অমান্য করে সেই মেয়েকেই তুমি বিয়ে করবে। তবুও আমি বলছি, সে যেন তোমার পাটরাণী হয়ে না বসে। আমার এই নিষেধও তোমার মনে থাকবে না, সেই মেয়েকেই তুমি পাটরাণী করবে। তবে দেখো, তাকে সঙ্গে নিয়ে কোন যজ্ঞ কোরো না। কিন্তু বৃথাই তোমাকে সাবধান করা। ওই পাটরাণীকে

সঙ্গে নিয়েই তুমি যজ্ঞ করতে বসবে। আর শেষবারের মতো তোমাকে সাবধান হতে বলছি। দেখো যেন কোনো অল্পবয়সী ব্রাহ্মণকে সেই যজ্ঞে নিযুক্ত কোরো না। কিন্তু আমার এই নিষেধ অগ্রাহ্য করে তুমি তোমার যজ্ঞে অল্পবয়সী ব্রাহ্মণদেরই বরণ করবে, যজ্ঞের সময় সেই ব্রাহ্মণেরা হাসাহাসি করবে, তাই দেখে তুমি ভয়ানক রেগে গিয়ে তাদের মাথা কেটে ফেলবে আর সেই পাপেই তোমার কুষ্ঠ হবে। আঠার জন ব্রাহ্মণ তোমার হাতে মারা পড়বে আর তাইতেই তোমার দেহে আঠার রকমের কুষ্ঠ হবে।'

এইভাবে রাজার ভবিষ্যতের কথা বলে এবং তাঁকে সাবধান করে দিয়ে ব্যাসদেব বললেন, 'ভবিষ্যতে তোমার জীবনে যা যা ঘটবে সবই তো তোমাকে বললাম, এখন দেখো আটকাতে পারো কিনা।' রাজা বললেন, 'আপনার কথা আমার মনে থাকবে। যজ্ঞ আমি কোনদিনই করব না।' এই বলে রাজা রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

কিছুদিন পর যজ্ঞের উপযুক্ত সুলক্ষণ যুক্ত একটি সুন্দর ঘোড়া নিয়ে এক অশ্ববিক্রেতা সেই রাজ্যে উপস্থিত হল। ব্যাসদেবের কথা স্মরণ করে রাজা সেই ঘোড়া কিনতে চাইলেন না। তখন রাজার পাত্র মিত্র সবাই বলতে লাগল, 'মহারাজ, আপনি এই ঘোড়া কিনলেন না, এই নিয়ে আপনার শত্রুরা হাসাহাসি করবে, তারা বলবে যে, যজ্ঞের ঘোড়া কিনবার ক্ষমতা আপনার নেই।' রাজা তখন ভাবলেন, তাইতো, এরা তো ঠিকই বলছে। তা ঘোড়াটা কিনলেই বা ক্ষতি কী, আমি ওতে না চড়লেই হল। এই ভেবে রাজা ঘোড়াটি কিনে নিলেন।

এরপর কয়েকদিন কাটল। একদিন রাজার শখ হল ঘোড়ায় চড়ে একটু বেড়িয়ে আসবেন। তিনি অশ্বপালকে ঘোড়া নিয়ে আসতে হুকুম করলেন। অশ্বপাল দেখল, এমন সুন্দর একটা ঘোড়া থাকতে মহারাজকে অন্য ঘোড়া দিই কেন। এই ভেবে সে নতুন কেনা সেই ঘোড়াটাকেই রাজার কাছে নিয়ে এল। রাজা তখন ভাবলেন, এমন চমৎকার ঘোড়াটা কিনেছি, একবার না চড়ে কি থাকা যায়? ঘোড়ায় চড়ে দক্ষিণ দিকে নাই বা গেলাম। এই মনে করে রাজা যেই ঘোড়ায় চেপে বসেছেন অমনি সেই ঘোড়া সোজা দক্ষিণ দিকে ছুটতে লাগল।

এইভাবে কিছুদূর যাবার পর রাজা দেখতে পেলেন এক পরমাসুন্দরী মেয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তার হাতে একগাছা বরণমালা। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুন্দরী, তুমি কাঁদছ কেন?' মেয়েটি বলল, 'আমি মনে মনে রাজা জনমেজয়কে পতিত্বে বরণ করেছি, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পেলাম না। সেই দুঃখেই আমি

কাঁদছি।' রাজা বললেন, 'আমিই রাজা জনমেজয়।' একথা শুনে মেয়েটি রাজার গলায় মালা পরিয়ে দিল। অপূর্ব সুন্দরী এমন মেয়েকে পত্নীরূপে পেয়ে পরম সমাদরে রাজা তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে পাটরাণীর পদে অভিষিক্ত করলেন। এমন সময় ব্যাসদেবের কথা রাজার মনে পড়ে গেল। রাজা তখন ভাবলেন, ব্যাসদেবের আদেশ তো আমি অমান্য করেছি, এখন কী করা যায়? যা হবার তা তো হয়েছে, এখন আমি বরং সাবধান হই। রাজা তখন স্থির করলেন যে, কিছুতেই তিনি যজ্ঞ করবেন না।

কিছুকাল পরে রাজ্যে অনাবৃষ্টি দেখা দিল। প্রজারা তখন রাজার নামে ছি ছি করতে লাগল। তারা বলতে লাগল রাজা তো কেবল নতুন বউ নিয়ে অন্দরমহলে ফূর্তি করে দিন কাটাচ্ছেন। এদিকে যজ্ঞের ঘোড়া কিনেছেন অথচ যজ্ঞ করবার নামও করছেন না। তাইতেই তো রাজ্যের এই হাল হয়েছে, অনাবৃষ্টিতে সব জ্বলে পুড়ে গেল। এমন রাজার রাজত্বে বাস না করাই ভালো। প্রজাদের এই সব কথা শুনে রাজা ঠিক করলেন যে, তিনি যজ্ঞ করবেন কিন্তু যজ্ঞে অল্পবয়সী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করবেন না। তিনি তখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন বলে মনস্থ করলেন এবং সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন যে যজ্ঞের জন্য যেন প্রবীণ ব্রাহ্মণদের নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ভাগ্যে যা আছে তা খণ্ডন করা যায় না। তাই প্রবীণ ব্রাহ্মণও মিলল না। অগত্যা বাধ্য হয়েই আঠারজন নবীন ব্রাহ্মণকে যজ্ঞের কাজে বরণ করা হল।

পাটরাণীকে সঙ্গে নিয়ে রাজা যজ্ঞ করতে বসেছেন। ঘোড়ার এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অঞ্জলিতে নিয়ে 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলে রাজা ও রাণী অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগলেন। যখন তারা ঘোড়ার লিঙ্গ নিয়ে আহুতি দিতে যাচ্ছেন তখন অল্প বয়সী ব্রাহ্মণরা তাই দেখে হাসতে শুরু করল। রাজা রাগ সামলাতে না পেরে তাঁর হাতের কাছে যে তরোয়াল ছিল তাই দিয়ে সেই আঠারজন নবীন ব্রাহ্মণদের মাথা কেটে ফেললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহে আঠার রকমের কুষ্ঠ দেখা দিল।

জনমেজয়ের সেই অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্যাসদেব উপস্থিত ছিলেন। রাজা তখন তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনি তো ভূত-ভবিষ্যতের কথা সমস্তই জানেন। কোন্ উপায়ে আমি এই কুৎসিত ব্যাধি থেকে মুক্ত হব?' ব্যাসদেব বললেন, 'যেদিন তুমি অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত শুনবে, সেইদিন এই পাপব্যাধি থেকে মুক্ত হবে।' তাই হল।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো বাছা পূর্ণ, এই গল্পের তাৎপর্য এই যে, ভবিষ্যতে কী হবে, তা আগে থেকে জেনে কোন লাভ নেই। ভূত ভবিষ্যতের কথা ছেড়ে দিয়ে বর্ত্তমানকে নিয়েই পড়ে থাক। এটাই সঠিক পথ।

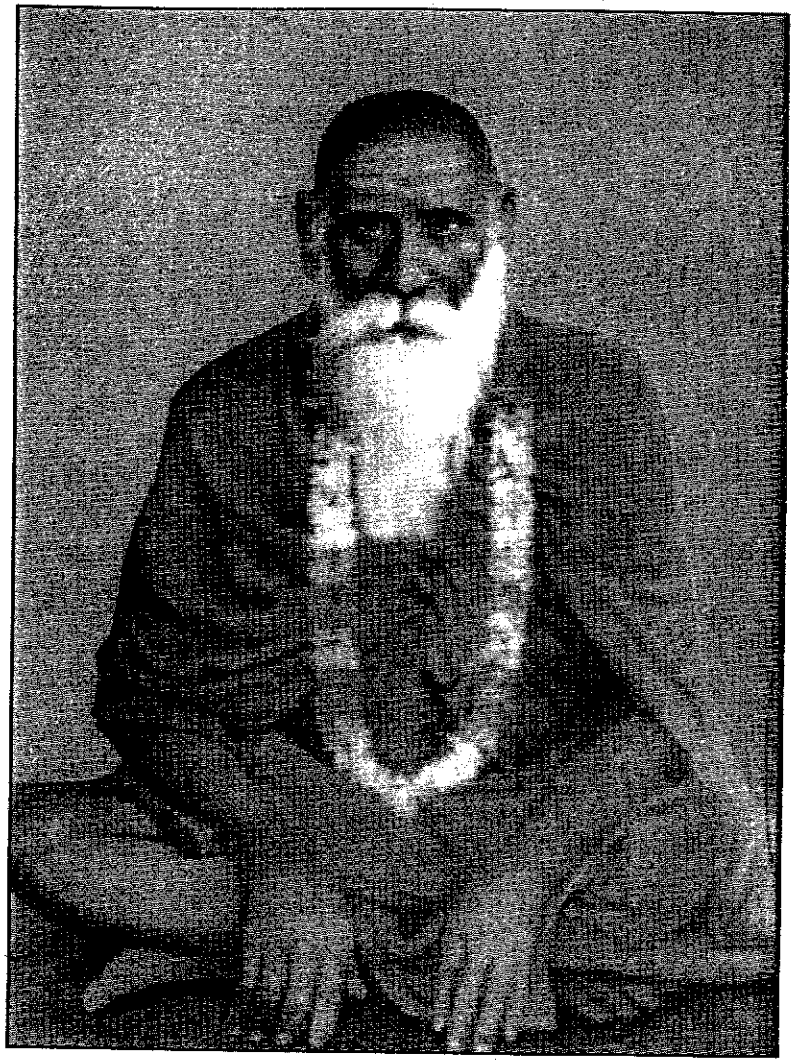

শ্রীশ্রী ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী

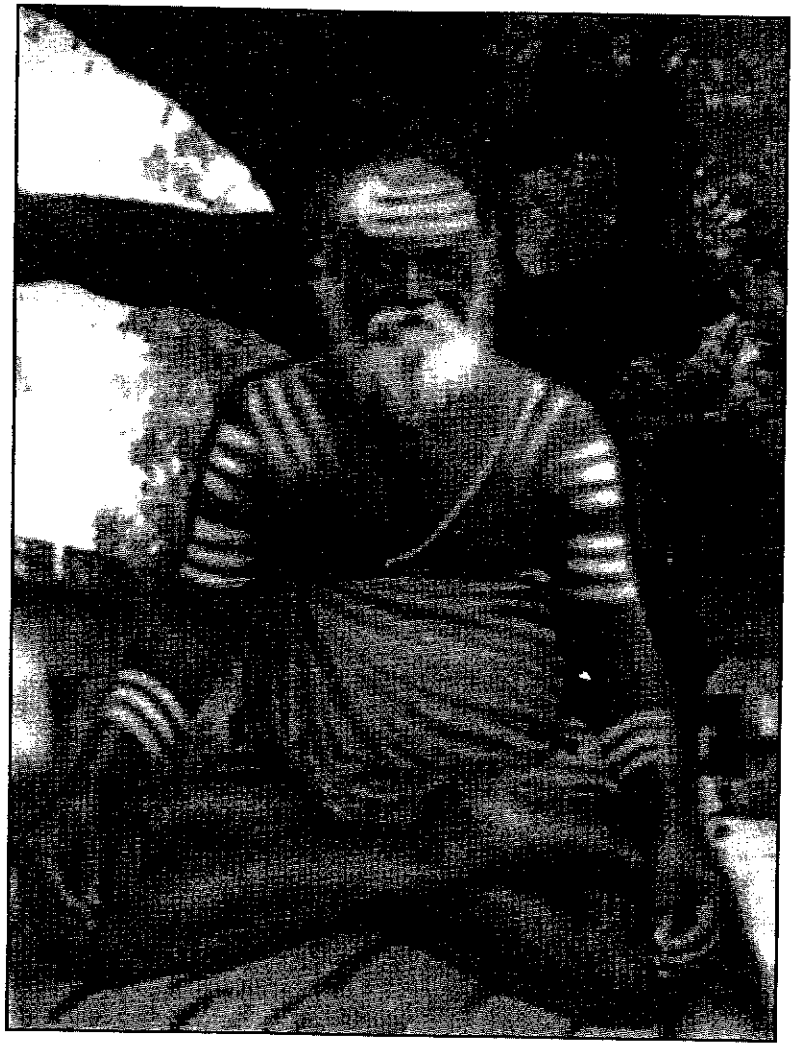

শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী

পূর্ণ ঃ মহারাজ, গল্প শুনে বুঝতে পারলাম, যা হবার তা হবেই – তা রোধ করবার ক্ষমতা কারুর নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা কি আমি জানতে সমর্থ হব?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ, বাছা পারবে। মল, বিক্ষেপ আর আবরণ এগুলি ভঙ্গ হয়ে গেলেই ভবিষ্যতের সব কিছু জানতে পারবে।

পূর্ণ ঃ মহারাজ, এই আবরণ ভঙ্গ হবার উপায় কী?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ আবরণ ভঙ্গের জন্য চেষ্টা করতে হবে। আবরণ অর্থাৎ আমার বুদ্ধিবৃত্তির উপর একটা পর্দা পড়েছে, চিত্ত দর্পণে ময়লা পড়েছে, ওই ময়লা যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে, চিত্ত যখন স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো হবে, তখন ভবিষ্যত আর অগোচর থাকবে না। এই ময়লা রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই প্রথমেই এই রজোগুণকে কমাতে হবে।

পূর্ণ ঃ মহারাজ, রজোগুণকে দূর করে দেওয়া তো খুবই কঠিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না বাছা, অধিকারীর পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। চাষালোককে যদি কোন ইংরাজী পড়তে দেওয়া হয় তাহলে তার পক্ষে বড়ই কঠিন হবে অথবা একেবারেই অসম্ভব হবে। কিন্তু ওই ইংরাজী বই যদি তোমাকে পড়তে দেওয়া হয়, তবে তোমার পক্ষে কিছুই কঠিন মনে হবে না। এর কারণ কি? এর কারণ হল – তুমি ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছ, তাই ইংরাজী ভাষায় তুমি অধিকারী হয়েছ। দেখো, এই ইংরাজী ভাষায় প্রতিপত্তি লাভ করবার জন্য তুমি বাচ্চা বয়স থেকে কতই যত্ন করেছ, তারপর ক্রমে ক্রমে এই ইংরাজী ভাষায় তোমার অধিকার জন্মেছে। বাহ্যবস্তু আয়ত্ত করবার জন্য যদি এত সময় দিয়েছ এত যত্ন করেছ, তাহলে অন্তরবস্তু আয়ত্ব করতেও একই রকম সময় ও যত্নের প্রয়োজন। একদিনেই সব কিছু আয়ত্ত হয়ে যাবে তা কখনই হবে না। অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত বিষয়বস্তু আয়ত্ত করবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তুমি অন্তর্জগৎকে আয়ত্ত করে নাও। তাহলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান – এসবই তোমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে। তবে এটা ঠিক যে, যা হবার তা হবেই, তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এ ব্যাপারে তুলসীদাসের একটি দোঁহা আছে –

'তুলসী ভাবি কঠিন হ্যায়
মেট সেকে না রাম
মেটেতো আশ্চর্য নেহি
সমঝ্ কিয়া হ্যায় কাম।'

ভগবান মানুষের ভাগ্যে যে কর্মফল ও শুভাশুভ ফল লিখে দিয়েছেন, তা তিনি উলটে দিতে পারেন না। তাহলে প্রশ্ন উঠবে – ভগবানকে সর্বশক্তিমান বলা যাবে কী করে? তার উত্তর হল, ভগবান যে সর্বশক্তিমান একথা একেবারে সঠিক। ভাগ্যের ফলাফল তিনি ইচ্ছে করলে উলটে দিতে পারেন না, কারণ অনেক ভেবে চিন্তেই তাঁকে কর্মফল নির্ণয় করতে হয়। নিজে যা স্থির করে দেন, তাকে তিনি আর বদলান না। এইজন্য ভগবানও পারেন না কর্মফল বদলাতে, মানুষের কথা না হয় ছেড়েই দাও।

দেখো বাছা পূর্ণ, তুমি বলছ যে যদি তোমার জামাইকে ভালভাবে যত্ন নেওয়া হত, তাহলে সে কখনই গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যেত না। কিন্তু দেখো, 'কর্ম অনুসারিণী বুদ্ধি' অর্থাৎ কর্মফল অনুযায়ী মানুষের বুদ্ধি হয়ে থাকে। কাল পুরোপুরি হলেই মানুষ মারা যায়। যতক্ষণ না কাল পূর্ণ হচ্ছে, মানুষ যতই সঙ্কটে পড়ুক কিছুতেই তার প্রাণ বিয়োগ হবে না। সে জলে ডুবুক, আগুনে পুড়ুক, বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে যাক্ যে কোন প্রকারেই হোক তার প্রাণ রক্ষা হবে। আবার দেখো, মরবার কথা নয় অথচ অতি তুচ্ছ কারণেই মানুষের মৃত্যু ঘটে। এর কারণ কী? এর কারণ হল যে, তার কাল পূর্ণ হয়ে গেছে। কালের কী বিচিত্র গতি! এ সম্পর্কে একটি কাহিনি তোমাকে বলছি ঃ

এক রাজা ছিল, জ্যোতিষীকে দিয়ে তিনি ভাগ্য গণনা করিয়ে দেখলেন যে, সাপের কামড়ে তাঁর মৃত্যু হবে। পাত্র-মিত্র সকলে পরামর্শ করে ঠিক করল যে রাজার জন্য এক সাতমহলা বাড়ি তৈরি করাতে হবে। সেখানে ভিতরের মহলে রাজা থাকবেন আর এমনভাবে তাঁকে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে যাতে কোন সাপ তাঁর ত্রিসীমানায় ন' আসতে পারে। সেইভাবে নতুন করে রাজপ্রাসাদ তৈরি হল এবং রাজা তাঁর রক্ষীদের নিয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু এত করেও রাজাকে বাঁচানো গেল না। রাজার কাল পূর্ণ হয়ে গেছে। একদিন খোলা জানালা দিয়ে হাওয়ায় এক টুকরো খড় এসে তাঁর গায়ে পড়ল আর দেখতে দেখতে সেই খড় সাপের রূপ ধারণ করে তাঁকে দংশন করল। রক্ষীরা সাপটি মারবার জন্য পিছু পিছু তাড়া করল। কিন্তু সাপটিকে ধরা গেল না। সাপটি তাদের পিছনে ফেলে বহুদূর চলে গেল। কেবল একজন রক্ষী তখনো সাপের পিছন ছাড়েনি। সে দেখলে যে, চলতে চলতে সাপটা মানুষের মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তখন রাজার রক্ষী তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই তুমি কে? সে বলল, আমি কালপুরুষ। জীবের যখন কাল পূর্ণ

হয়ে যায়, তখন আমিই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে তাঁকে বধ করি। তারপর তাকে নিয়ে যাই যমরাজের কাছে।' রাজরক্ষী তখন বলল, 'রাজাকে তো তুমি মারলে, এখন তুমি কী করবে?' কালপুরুষ বলল, 'সামনের ওই পুকুরে এখনই একজন লোক জল খেতে আসবে আর রাস্তায় ওই যে ষাঁড়টা বসে রয়েছে, ওই ষাড়টি তাঁর পেটে এমন গুঁতো মারবে যে তাতেই লোকটার মৃত্যু হবে। এই কাজটা সেরে তারপর আমি অন্য কাজে মন দেব।' এই বলে কালপুরুষ অদৃশ্য হয়ে গেল। রক্ষীও তখন পুকুরের ধারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় সে দেখতে পেল একজন লোক পুকুরের দিকে এগিয়ে আসছে, কিন্তু ষাড়টা পথ আটকে বসে রয়েছে দেখে লোকটা তাকে মারবে বলে একখানা পাথর হাতে তুলে নিল। রক্ষী তখন লোকটিকে বলল, 'ভাই, এখানে এক মুহূর্তও তুমি দাঁড়িও না, ষাড়টাকেও মেরো না বা জলও খেয়ো না, জল খেলেই তুমি মারা পড়বে।' রক্ষীর কথা শুনে লোকটি বলল, 'বাঃ! সুন্দর কথা বলছ দেখছি। পিপাসায় আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, সামনে এমন ভালো পরিষ্কার জল রয়েছে, সেই জল খাব না? আর তুমি বলছ কিনা ওই জল খেলেই আমি মরে যাব? এ তো পাগলের কথা।' লোকটি রক্ষীর কথা শুনল না। পাথর ছুঁড়ে ষাড়টাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে পুকুরে নেমে সে প্রাণ ভরে জল খেয়ে নিল। যেমনি সে জল খেয়ে পুকুর থেকে উঠে এসেছে, অমনি ষাড়টা তেড়ে এসে তার পেটের মধ্যে শিং ঢুকিয়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মরে গেল।

কালপুরুষ তখনই আবার ফিরে এল। রক্ষী তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এবার কী করবে তুমি?' কালপুরুষ বলল, 'এই রাস্তা দিয়ে দুই সেপাই যাবে ঘোড়ায় চেপে। আমি তখন তাদের সামনে সুন্দর এক মেয়ের মূর্তি ধরে দাঁড়াব। আমাকে দেখে দুজনেই মুগ্ধ হয়ে যাবে আর আমাকে পাবার জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারি করে দু'জনেই মারা যাবে। এই বলে কালপুরুষ সেখান থেকে সরে গেল। রক্ষী দেখল দুজন সেপাই ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে। তারা তার পাশ দিয়ে যাবার সময় রক্ষী তাদের বলল, 'ভাই, সাবধান! পথে যদি কোন মেয়েকে দেখতে পাও, তাহলে ভুলেও তার দিকে তাকিয়ো না। যদি তাকাও তা হলে তোমাদের সর্বনাশ হবে। সেপাইরা রক্ষীর কথায় কান দিল না, তার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে হাসতে হাসতে তারা চলে গেল। রক্ষী হঠাৎ দেখতে পেল, তাদের সামনে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটিকে দেখেই দুই সেপাই ঘোড়া থেকে নেমে মেয়েটির

কাছে ছুটে গেল এবং কে তাকে দখল করবে এই নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। এ বলে আমি নেব, ও বলে আমি নেব, কেউ ছাড়বার পাত্র নয়। দুজনের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল এবং দুজনের তলোয়ারের ঘায়ে দুজনেই আঘাত পেয়ে প্রাণত্যাগ করল।

কালপুরুষ আবার রক্ষীর সামনে এসে দাঁড়াল। রক্ষী তখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই, এবার তোমার কাজ কী?' কালপুরুষ বলল, 'ওই যে দেখছো গোয়ালাটা গরু দুইবে বলে তোড়জোড় করছে, তার গরু তাকে এমনি লাথি মারবে যে সঙ্গে সঙ্গে সে মরে যাবে।' এবারও কালপুরুষ সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। রক্ষী তখন গোয়ালাকে অনুরোধ করল, 'ভাই, আজ আর তুমি গরুটাকে দুইয়ো না। দুধ দোয়ালে তুমি মরে যাবে।' গোয়ালা রেগে বলল, 'বাজে কথা বলার জায়গা পেলে না। দুধ না দুইলে গরু আমার খারাপ হয়ে যাবে, তখন ছেলেপিলে নিয়ে কি না খেয়ে মরব? রোজ দু বেলা গাই দুইছি, তাতে মরলাম না, আর আজ তোমার কথাতেই মরে যাবে? যতসব আহাম্মকের দল।' গোয়ালা কোন কথা শুনল না, দুধ দুইতে শুরু করল আর অমনি গরুটা তাকে এমন এক লাথি মারল যে তাতেই বেচারার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

আবার কালপুরুষ এসে হাজির হল। রক্ষী আবার তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এবার কোন্ কাজে যাবে?' কালপুরুষ বলল, 'সামনে ঐ বটগাছের নিচে এক পথিক এসে বসবে, আর তখনই এক সাপের কামড়ে সে মারা যাবে।' কালপুরুষ আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন এক পথিককে বটগাছের কাছে আসতে দেখে রক্ষী অনুনয় করে বলল, 'ভাই, দোহাই তোমার, বটগাছের নিচে বোসো না, এখনই তোমাকে সাপে কাটবে।' পথিক বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী বাজে কথা বলছ। পথ চলতে চলতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এখন বটগাছের ছায়া মিলেছে, খানিক বিশ্রাম না করে আমি এখান থেকে যাব না। এমন পরিষ্কার স্থানে সাপ তুমি কোথায় দেখলে?' এই বলে পথিক সেই গাছের তলায় বসামাত্র কোথা থেকে এক সাপ এসে তাকে ছোবল মারল, আর সঙ্গে সঙ্গে পথিকও মারা গেল।

কালপুরুষ আবার সামনে এসে দাঁড়াতে রক্ষী জিজ্ঞাসা করল, 'এবার তোমার কী কাজ?' কালপুরুষ বলল, 'দেখো ভাই, এখন তো তোমার কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে, কদিন বাদেই তোমার ফাঁসি হবে।' রক্ষী এতগুলি ঘটনা নিজের চোখে দেখেছে, তাই কালপুরুষের কথায় তার মনে কোনো সন্দেহ জাগল না। সে ভাবল, আমার

তো ফাঁসি হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। তাহলে এখন আমি কী করি? সাধু হয়ে যাব? কালপুরুষ বলল, 'সাধু হয়েও তোমার কোনো লাভ হবে না, তোমার কাল পূর্ণ হয়ে আসছে। ফাঁসি তোমার হবেই। তবে তোমাকে আমি একটা রুদ্রাক্ষ দিচ্ছি। সেটা তুমি কণ্ঠে ধারণ করবে। ফাঁসিতে তোমার মৃত্যু হবার পর যমদূত তোমাকে ছুঁতে পারবে না, রুদ্রাক্ষের প্রভাবে শিবের দূত এসে তোমাকে কৈলাসে নিয়ে যাবে।'

রক্ষী তখন প্রথমে সাধু হয়ে গেল এবং বনের মধ্যে কুটির তৈরি করে সেখানে সাধন ভজন করে দিন কাটাতে লাগল। কদিন বাদেই সেই দেশের বাদশার ঘরে একজন খুন হয়ে গেল। খুনীরা জঙ্গলের ভিতর সাধুর আস্তানা রয়েছে দেখে নিরাপদ ভেবে সেখানে গিয়েই লুকিয়ে রইল। এদিকে বাদশার সেপাইরা খুঁজতে খুঁজতে সাধুর ঘরে এসে দেখল যে, খুনীরা সেখানে লুকিয়ে রয়েছে, তখন তারা খুনীদের সঙ্গে সাধুকেও ধরে নিয়ে গেল বাদশার কাছে। বাদশার হুকুমে সেই খুনীদের সঙ্গে সাধুরও ফাঁসি হয়ে গেল। তবে তার রুদ্রাক্ষ দেখে শিবদূত এসে তাকে নিয়ে গেল কৈলাসে।

দেখো বাছা পূর্ণ, তোমার জামাই-এর জন্যে আর তুমি শোক কোরো না। তার কাল পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, গলায় ফাঁসি দিয়ে তার মরণ হোতোই হোত, কালকে কেউ রুখতে পারবে না। এসব কথা মন থেকে দূর করে চুপচাপ বসে থাক, তাহলে চিত্তে শান্তি ও প্রসন্নতা আসবে। আর একটা কথা আছে। হে পরমাত্মাদেব, তোমার রাজ্যে তোমার কার্যে কোনো অমঙ্গল হতে পারে না।

শ্মশানেষ্বাক্রীড়া স্মরহর পিশাচাঃ সহচরা –
শ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ।।
অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈব মখিলং
তথাপি স্মর্তৃণাং, বরদ পরমং মঙ্গলমসি।। ২৪নং শ্লোক, শিবমহিম্ন স্তোত্র

– হে মদনান্তক, শ্মশান তোমার ক্রীড়াস্থান, তুমি সর্বদা পিশাচগণের সঙ্গে প্রেতভূমিতে বিচরণ কর, চিতাভস্ম তোমার অঙ্গলেপন সামগ্রী, নরকপাল পানপাত্র, নরকঙ্কাল মালার দ্বারা অঙ্গের ভূষণ কর, তোমার বেশভূষাদি সকলই অমঙ্গলসূচক, কিন্তু তোমার শিবনাম মঙ্গলপ্রদ। যারা তোমাকে স্মরণ করে তুমি তাদের কাছে পরম মঙ্গল স্বরূপ।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ শিবমহিম স্তোত্র থেকে উপরিউক্ত শ্লোক বলে চোখ বন্ধ করে বহুক্ষণ বসে রইলেন। তাঁর সেই ধ্যানমগ্ন শ্রীমূর্তি ঠিক যেন কৈলাসেশ্বর শঙ্কর

ভগবানের মতো দেখাচ্ছিল। উপদেশ দিতে দিতে প্রভু এমন ধ্যানমগ্ন কেন হলেন? মনে হল– প্রভু এটাই বোঝালেন যে, যা কিছু ভোগ তা সবই বাহ্য জগতের, অন্তর জগতে চক্ষু মুদ্রিত করে ডুবে যাও, শান্তি পাবে। সহস্র ভাষায় যা বোঝান যায় না, মনে হয় – ভাবের আভাস পেলে জীব সহজে বুঝে নেয়। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের ছোট ছোট গল্পগুলি বুঝতে বা তার ভাব ধারণা করতে দেরী হয় না, কারণ তাঁর উপদেশ অতি সহজ সরল ভাষায় বেদ বেদান্তের, গীতা সংহিতার, পুরাণদির কথা গল্প দ্বারা বুঝান, নতুবা শাস্ত্রের বড় বড় অলঙ্কারযুক্ত কথা আমাদের মতো অল্প বুদ্ধিযুক্ত লোকের বোঝবার ক্ষমতা নেই। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের শ্রীচরণে প্রণাম করে আমরা উঠলাম, পথে যেতে যেতে আমার ভাই নিম্নলিখিত গানটি গাইতে লাগল—

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।।
বিষয়পঙ্কক আর ভূতগণ,
সব তোর পর কেহ নয় আপন,
পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভুলিছ আপন জনে।।
সত্যপথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন
গোপনে অতি যতনে;
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ
পথিকের করে সর্বস্ব মোষণ,
পরম যতনে রাখরে প্রহরী
শম দম দুই জনে।।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শ্রান্ত হলে তথা করিবে বিশ্রাম।
পথভ্রান্ত হলে শুধাইবে পথ
সে পান্থনিবাসিগণে;

যদি দেখ পথে ভয়েরই আকার,
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ,
শমন ডরে যার শাসনে।।

আমার ভাই শোক সন্তপ্তচিত্তে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের শ্রীচরণে গিয়েছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের অসীম কৃপায় ও তাঁর অসীম প্রতাপে, তাঁর মধুর নির্ঝর বাণী শুনে শান্তি পেয়ে উপরিউক্ত বৈরাগ্যযুক্ত গান গাইতে লাগলেন। মহাপুরুষের সঙ্গের যে কী সুফল পাওয়া যায় তা স্পষ্ট বোঝা গেল।

তৃতীয় পর্ব

স্থান ঃ ধ্যানকুটীর ১৯৩৯, চৈত্র মাস
ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু
ও
শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[সৎসঙ্গ বা ঈশ্বর প্রসঙ্গ আলোচনায় রুচি না হওয়ার কারণ ঃ শাস্ত্রে উল্লিখিত তিন প্রকার বাক্য – যথার্থ, রোচক ও ভয়ানক বাক্য ঃ অধিকারী অনুযায়ী তিন প্রকার শিষ্য – উত্তম, মধ্যম ও অধম ঃ গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা ঃ গুরু শিষ্যকে চারভাবে পরীক্ষা করে নেন – ঘর্ষণ, তাপন, ছেদন ও তাড়ন – শৈশব থেকে প্রাপ্ত বয়স পর্যন্ত সন্তান লালন পালনের রীতি ; ঈশ্বর সম্পর্কে রুচি কী করে ফিরে আসে ঃ শবরীর গল্প ঃ সৎসঙ্গের মহিমা - গুরুর দ্বারা আত্মদর্শন ঃ গুরু শিষ্যের ভ্রান্তি দূর করেন – কীভাবে? চিত্তমল শুদ্ধ করার উপায় ঃ শিষ্যের পরীক্ষা - পায়রার গল্প ও বিষ্ঠার গল্প ঃ হরিনামের ক্ষেত লাগাও ঃ তিনশক্তি মন্ত্রশক্তি, দ্রব্যশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ঃ নাম করলে নামীকে পাওয়া যায় ঃ জপ আর নামে ঈশ্বরে রুচি ফিরে আসে। ভবরোগ বড় কঠিন রোগ ঃ সকল কর্মই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয় ঃ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জগৎ-সংসার মিথ্যা ঃ জ্ঞানীকে কীভাবে চেনা যায় ঃ জ্ঞান লাভ সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না কেন?]

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বিপিন, তোমার কাছে ব্যবহার (ব্যবহারিক কাজকর্ম) সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে চাই। তুমি আমাকে ব্যবহার সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দাও।

বিপিন ঃ মহারাজ, আমি আপনাকে পরামর্শ দেবো – এ তো হাসির কথা।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হাঁ ভাই, তুমি একজন পাকা গৃহস্থ। তোমার কাছে অবশ্যই ব্যবহার সম্পর্কে পরামর্শ নিতেই হবে।

বিপিন ঃ মহারাজ, আপনি ব্যবহার, পরমার্থ – এ সবকিছু জানেন। আপনাকে আমি কী শেখাব, কী পরামর্শ দেবো?

শ্রীশ্রীগুর ঃ আচ্ছা ভাই, তোমাকে পরামর্শ দিতে হবে না। তবে তুমি কিছুদিনের জন্য এখানে থেকে যাও। এখানকার পরিবেশ খুবই ভালো। এখানে প্রতিদিনই বেশ কিছু সৎসঙ্গ, ঈশ্বর সম্পর্কীয় আলোচনা হয়ে থাকে। আমি চাই এই আলোচনায় তুমি যোগদান কর।

বিপিন ঃ মহারাজ, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমার রুচি আসে না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হাঁ ভাই, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় আলোচনা তোমার ভালো লাগছে না, এর কারণ হল যে, তোমার ডিসপেপসিয়া ব্যারাম হয়েছে। তোমাকে তাই পাঁচন খেতে

হবে, পাঁচন খেলেই তোমার অরুচি ভালো হয়ে যাবে। তবে পাঁচন হল তেতো, সহজে খাওয়া যায় না। কিন্তু যে কোন প্রকারে খেতে হবে। শাস্ত্রে তিন প্রকার বাক্যের কথা বলা হয়েছে – যথার্থ, রোচক আর ভয়ানক। যথার্থ বাক্য কী রকম? যেমন কোন লোকের রোগ হয়েছে, ডাক্তার এসে বলল, তুমি ওষুধ খেলে ভালো হয়ে যাবে। ডাক্তারের কথা শুনে রোগী ওষুধ খেয়ে নিল। সাধকদের ক্ষেত্রে যথার্থ বাক্য কীরকম? গুরুদেব বলে দিলেন – তুমি ত্রিতাপদগ্ধ সংসারে পড়ে রয়েছ, তুমি ভগবানের শরণ নাও। তোমার ভবরোগ দূর হয়ে যাবে। এ হল যথার্থ বাক্য।

রোচক বাক্য কী? যেমন তোমার রোগ হয়েছে, তোমাকে বলা হল – ওষুধ খাও, রোগ ভালো হয়ে যাবে। তুমি বললে – না বাবা, ও ওষুধ তেতো, আমি খাবো না। তখন চতুর কবিরাজ বলল – ভাই, তুমি ওষুধ খেয়ে নাও, তাহলে তোমাকে সন্দেশ খেতে দেবো। সন্দেশের লোভে ওষুধ খেয়ে নিলে আর তাতেই তোমার অসুখ সেরে গেল। সাধকের ক্ষেত্রে রোচক বাক্য কীরকম? গুরুদেব বললেন – ভাই, তুমি ভগবানের শরণ নাও, তোমার স্বর্গবাস হবে, তুমি অমৃত খেতে পাবে, খুব আরামে থাকবে সেখানে। সাধক তখন স্বর্গের লোভে ভগবানের নাম নিতে লাগল। এটাই হল রোচক বাক্য।

আর ভয়ানক বাক্য কী রকম? কোন লোকের ম্যালেরিয়া হল। কুইনাইন খেলেই রোগ সেরে যাবে, কিন্তু তেতো বলে সে কুইনাইন খাবে না। তখন চতুর কবিরাজ তাকে ভয় দেখায় – কুইনাইন না খেলে তুমি মরে যাবে। মরার ভয়ে রোগী তখন কুইনাইন খেয়ে নিল। সাধকদের জন্য শাস্ত্রকাররা বললেন – ভগবানের শরণ নাও, নাহলে তোমার নরকবাস হবে। নরকবাসের ভয়ে সাধক তখন ভগবানের শরণ নিতে লাগল। এ হল ভয়ানক বাক্য।

শাস্ত্রে যেমন তিন রকম বাক্যের কথা বলা আছে, তেমনি তিন প্রকার অধিকারীর কথাও বলা হয়েছে – যেমন উত্তম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী আর অধম অধিকারী। উত্তম অধিকারী গুরুর ইঙ্গিতমাত্র চট্ করে তা বুঝে নেয় আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ইঙ্গিতমতো কাজ শুরু করে দেয় এবং অচিরেই সে সফলতা অর্জন করে। মধ্যম অধিকারীকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবার পর তবে সে বুঝতে পারে এবং কাজ শুরু করে দেয়, তারপর ধীরে ধীরে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যায়। আর অধম অধিকারী যে, তাকে গুরু যতই বোঝান না কেন, তার উপদেশের মর্ম কিছুতেই মাথায় ঢোকে না। তাই কোন কাজ করতে তার প্রবৃত্তি জাগে না। একই গুরুর শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও

তাই সে সফল হতে পারে না। সাধারণত উত্তম অধিকারীর পক্ষে যথার্থ বাক্য, মধ্যম অধিকারীর পক্ষে রোচক বাক্য এবং অধম অধিকারীর পক্ষে ভয়ানক বাক্য প্রয়োগ হয়।

বিপিন ঃ মহারাজ, গুরুকরণের প্রয়োজন আছে কী? ধর্মের বিষয়ে যত রকম কথা থাকতে পারে, সবই যখন শাস্ত্রে লেখা আছে, তা পড়ে নিলেই যখন সব কিছু জানা যায়, তখন গুরু করার প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, তোমার যখন ছাত্রজীবন ছিল, তখন তোমার কী কোন শিক্ষক ছিল?

বিপিন ঃ হাঁ মহারাজ, ছিল।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ কেন শিক্ষক ছিল? পড়া বুঝতে শিক্ষকের দরকার হল কেন? বইয়েতে তো সমস্ত বর্ণ লেখাই ছিল, বই দেখে তোমার বর্ণপরিচয় হল না কেন? একজন তোমাকে বলে দিলেন – এই বর্ণ হল 'ক', এই বর্ণ হল 'খ', তবেই তো তুমি একটি একটি করে বর্ণগুলি চিনতে শিখলে। নিজে নিজে তো পড়তে শেখোনি। সাধারণ শিক্ষার জন্য যেমন শিক্ষকের প্রয়োজন, তেমনি ধর্মশিক্ষার জন্যেও গুরুর প্রয়োজন।

শাস্ত্রের মধ্যে ধর্মবিষয়ে সব কিছুই লেখা আছে কিন্তু তোমাকে সে সব কথা বুঝিয়ে দেবে কে? শাস্ত্রের বাক্য, মর্ম বোঝা বড়ই কঠিন। সহজে কেউ তার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে না। যাঁর কাছে মর্ম উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, একমাত্র তিনিই শাস্ত্রবাক্য বোঝাতে পারেন। এইজন্য শাস্ত্রবেত্তা, ব্রহ্মবেত্তা গুরুর প্রয়োজন। গুরুও সব লোককে শিষ্য করেন না। যে লোক উপযুক্ত, শিষ্য হওয়ার অধিকারী, তাকেই তিনি শিষ্য করেন।

গুরুর কাছে শিষ্যকে চারটি পরীক্ষা দিতে হয়। কীভাবে? সোনার যেমন চারটে পরীক্ষা বা যাচাই হয়ে থাকে। প্রথম ঘর্ষণ, দ্বিতীয় তাপন, তৃতীয় ছেদন ও চতুর্থ ভেদন। প্রথমে কষ্টি পাথরে ঘষে দেখা হল খাঁটি সোনা কি না, তাতে সন্দেহ দূর হল না। তখন পুড়িয়ে দেখা হল। খুব তাপ দিয়ে দেখা গেল সোনার বাইরের রঙ ঠিক আছে, কিন্তু ভেতরের রং বোঝা যাবে কী করে? তখন সোনাকে কেটে দেখা গেল যে, সোনার ভেতরের রং আর বাইরের রং একই রকম। তারপর চোট বা হাতুড়ি দিয়ে ঘা মেরে দেখা হয় সোনায় খাদ আছে কি না, খাদ থাকলে হাতুড়ির ঘায়ে সোনা ফেটে যাবে, আর যে সোনায় খাদ নেই হাতুড়ির ঘায়ে তা ফাটবে না, ছড়িয়ে যাবে। তখন বোঝা যাবে সেই সোনাটি খাঁটি। তখন সেই সোনা দিয়ে ভালো ভালো

গয়না গড়া যাবে। গয়না গড়া হয়ে গেলে তাতে তখন পালিশ চড়বে, তখন আর কাটা বা পেটা কিছু নয়, শুধু যেখানকার অলংকার সেখানে ধারণ করলেই হল। কোন অলঙ্কার কণ্ঠের, তা কণ্ঠে ধারণ করল। কোন অলঙ্কার কানের, তা কানেই ধারণ করা হল। গুরুর কাছে শিষ্যকেও এইভাবে চারটি পরীক্ষা দিতে হয়।

প্রথম ঘর্ষণ ঃ এটি কীরকম? গুরু শিষ্যকে নিজের সেবাকার্যে নিযুক্ত করে দেন। সেই কাজে কোন রকম ত্রুটি না হলে প্রথম পরীক্ষায় শিষ্য উত্তীর্ণ হয়ে যায়। দ্বিতীয় পরীক্ষা – তাপন। এটা কী? এটা হল তিতিক্ষা বা সহনশক্তির পরীক্ষা। সে পরীক্ষা কেমন? কখনো রোদে পুড়ছে, কখনো জলে ভিজছে, কখনো খাওয়া জুটছে, কখনো জুটছে না, কখনো ঘর ঝাঁট দেওয়া, কখনো বাসন মাজা, এইভাবে নানারকম পরিস্থিতির মধ্যেও শিষ্য যদি হাসিমুখে সবকিছু সহ্য করতে পারে, তাহলে দ্বিতীয় পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

তৃতীয় পরীক্ষা - ছেদন। ছেদন কী? না, শিষ্যকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। যতদিন সে কাছে ছিল, ততদিন তো ঠিক ছিল। এখন দূরে রেখে দেখতে হবে গুরুর প্রতি তার মতিগতি কেমন থাকে। যদি দেখা যায় – যত দূরেই থাক শিষ্যের মন কম্পাসের কাঁটার মতো গুরু - পাদপদ্ম ছেড়ে এতটুকু বিচলিত হয়নি, সেখানেই স্থির হয়ে রয়েছে, যদি দেখা যায় যে, গরু আর তার বাছুর দূরে থাকলেও যেমন হাম্বা হাম্বা করে পরস্পরকে ডাকে, তেমনি গুরু আর শিষ্য যত দূরেই থাকুক না কেন উভয়ের মধ্যে প্রেমের টান অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তখনই শিষ্য তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল।

শেষ চতুর্থ পরীক্ষা – তাড়ন ঃ শিষ্যের ক্ষুদ্র অপরাধও গুরু সহ্য করছেন না লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিচ্ছেন। শিষ্য যদি এই আঘাত সহ্য করে গুরুর চরণকমলে শরণাগত হয়ে থাকতে পারে, তবেই সে চতুর্থ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়ে প্রকৃত শিষ্য হওয়ার অধিকার অর্জন করে। দেখো, বাজারে যখন তুমি এক পয়সা দিয়ে হাঁড়ী কিনতে যাও, তখন কত হাঁড়ী ঠোক্‌ ঠাক্‌ করে পরীক্ষা করার পর তবে একটি পছন্দসই হাঁড়ী নিয়ে থাক। আর গুরু যাকে অপার্থিব বস্তু প্রদান করবেন তাকে তিনি বিনা পরীক্ষায় তা কী করে দেবেন? গুরু শিষ্যকে আঘাত দিয়ে থাকেন তার কল্যাণের জন্য। পিতা মাতা পুত্রকে যে শাসন করে থাকেন তা তো পুত্রের কল্যাণের জন্যই। শাসন না করলে সন্তানের জীবন গঠন হয় না। যেমন অলঙ্কার তৈরী করতে গেলে সোনাকে কত চোট বা আঘাত খেতে হয়। এ সম্পর্কে একটি শ্লোক আছে –

'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি, দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ
প্রাপ্তেষু ষোড়ষে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।'

অর্থাৎ পাঁচ বছর পর্যন্ত পুত্রকে আদর করে লালন করবে, পরবর্তী দশ বছর পর্যন্ত ওই পুত্রকে তাড়ন করতে হবে, ষোল বছরের হলে পুত্রের সঙ্গে মিত্রের মতো ব্যবহার করতে হবে।

আর একটি এ রকম শ্লোক আছে –

'লালনে বহবো দোষাঃ তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ, তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ'।।

অর্থাৎ গুরু শিষ্যকে, পিতা পুত্রকে যখন লালন (অতি যত্নের সহিত পালন) করেন তখন তাদের মধ্যে অনেক দোষ দেখা দেয়, আর যখন তাড়ন (কঠোর শাসন) করেন তখন তাদের মধ্যে অনেক গুণের প্রকাশ হয়। সেইজন্য পুত্র-শিষ্যকে লালন করবে না, তাড়ন করবে। এদের তাড়ন না করলে মঙ্গলের পথ মিলবে না।

বিপিন – হাঁ মহারাজ, আমাদের বাংলাতে একটি গীত আছে – 'সন্তান মঙ্গল তরে, জননী তাড়না করে।' গুরুজন যে তাড়না করেন, তা তো সন্তানের কল্যাণের জন্যই করে থাকেন। এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আর ছাত্রজীবনে যেমন শিক্ষকের দরকার হয়, সেরকম ধর্মপিপাসু ব্যক্তির শাস্ত্রবেত্তা, ব্রহ্মবেত্তা গুরুর প্রয়োজন হয়। এ সম্পর্কে আমাদের যে প্রশ্ন ছিল, তার মীমাংসা হয়ে গেছে।

কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল – ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার রুচি হয় না কেন আর কী উপায়ে আমার রুচি ফিরে আসবে – এই দুটো প্রশ্নের উত্তর চাই।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ বাছা বিপিন, তুমি ভাল প্রশ্ন করেছ। আমি তো বলেছি – ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার ডিসপেপসিয়া ব্যারাম হয়েছে, এর জন্যে তোমার অরুচি হয়েছে, তাই তোমাকে পাঁচন খেতে হবে। পাঁচন কী? এই পাঁচন হল সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ করলে এই ডিসপেপসিয়া আরোগ্য অর্থাৎ ভাল হয়ে যাবে। ঈশ্বরের নাম নিলে রুচি ফিরে আসবে। সৎসঙ্গ লাভ করলে মানুষের কত উন্নতি হয় সে সম্পর্কে পুরাণে ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

শবরীর গল্প ঃ শবরী ভিলের মেয়ে ছিল। একদিন সে মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে গেল। সেখানে গিয়ে সে দেখল যে, মুনি শিষ্যদের সঙ্গে সৎসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছেন। সেই আলোচনা শবরীর কানে যেতে তার মনপ্রাণ আনন্দে ভরে গেল এবং তার হৃদয় জুড়ে এক পবিত্র ভাবের সঞ্চার হল। কিন্তু সে যে ভীলের মেয়ে,

মুনির কাছে বসে শিষ্যদের সঙ্গে উপদেশ শুনবার অধিকার তো তার নেই। তখন সে ভাবতে লাগল কী করে এদের কাছাকাছি থাকা যায়। ভাবতে ভাবতে সে একটা উপায় খুঁজে পেল। সে রোজ বন থেকে শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করে গোপনে মুনির আশ্রমে পৌঁছে দিতে লাগল।

রোজ রোজ এভাবে আশ্রমে শুকনো কাঠ আসছে দেখে মুনি শিষ্যদের বললেন, 'একবার খোঁজ করে দেখো তো, কে রোজ রোজ এখানে শুকনো কাঠ দিয়ে যাচ্ছে?' শিষ্যরা খোঁজ নিয়ে জানাল, 'গুরুদেব, এক ভিলের মেয়ে রোজ কাঠ নিয়ে এসে আশ্রমে রেখে যায়, তার জন্যে কোন দামও সে নেয় না।' শুনে মাতঙ্গ মুনি সন্তুষ্ট হলেন, তাকে ডাকিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রোজ তুমি কাঠ দিয়ে যাচ্ছো, কিন্তু তার জন্য একটি পয়সাও নিচ্ছ না কেন?' শবরী বলল, 'বাবা, আমার পয়সার কোন দরকার নেই, আমি শুধু আপনার সেবা করতে পেলেই ধন্য হব। আমি ভিলের মেয়ে, নীচ কূলে জন্ম, কী করে আমি আপনার সেবা করতে পারি? তাই আপনার রান্না ও হোম করবার সুবিধা হবে ভেবে আমি বনের শুকনো ডালপালা আপনার আশ্রমে রেখে যাই।' মুনি বললেন, 'বাছা, তুমি তো পয়সাকড়ি নেবে না। তাহলে তুমি এই আশ্রমে রোজ প্রসাদ পাবে আর রোজ আশ্রমের আঙিনায় ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার রাখবে।'

তাই হল। শবরী রোজ শুকনো কাঠ এনে দেয়, আঙিনা পরিষ্কার করে, আশ্রমে প্রসাদ পায়, এইভাবে সে সব সময় সাধুদের সঙ্গ পেতে থাকে। একদিন শবরী শুনতে পেল – সাধুরা সবাই আশ্রম ছেড়ে চলে যাবেন। দুঃখে শবরীর বুক ফেটে গেল। তার দু'চোখে জল ঝরতে লাগল। মুনির কাছে গিয়ে সে বলল, 'বাবা আপনারা চলে গেলে আমার কী দশা হবে, আমি কী নিয়ে থাকব?' মাতঙ্গ মুনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বাছা, তুমি কেঁদো না, তোমার মতো ভাগ্যবতী কে আছে? তুমি এই আশ্রমেই থাকো আর একমনে শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করো।' ভগবান রামচন্দ্র একদিন নিজে এসে এই আশ্রমে তোমাকে দর্শন দেবেন, তুমি মুক্তি পাবে।

মুনির কথা বিফল হবার নয়। যথাসময়ে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং এসে শবরীকে দর্শন দিলেন এবং তাঁকে মুক্তি প্রদান করলেন।

দেখো ভাই বিপিন, সৎসঙ্গের কী মহিমা! একজন সামান্য নীচ কূলে জাত ভীলের মেয়ে, সৎসঙ্গের প্রভাবে সেও তপস্যা করতে শিখল, তার মুক্তিও হয়ে গেল, উচ্চ কূলোদ্ভবদের কথা আর কী বলব? সৎসঙ্গের প্রভাবে মানুষের ঈশ্বরের কাছে যাবার,

ঈশ্বরের নাম নেবার রুচি আপনা থেকেই এসে যায়। তোমার যে ডিসপেপসিয়া হয়েছে তাঁর পাঁচন হল সৎসঙ্গ। ওই সৎসঙ্গরূপী পাঁচন সেবন করলেই তোমার ব্যারাম ভালো হয়ে যাবে। এখন বল ভাই বিপিন, আমি যে সব কথা বললাম তাতে তোমার কোন সংশয় আছে কী?

বিপিন ঃ না মহারাজ, এ ব্যাপারে আমার আর কোন সংশয় নেই। সৎসঙ্গের প্রভাব তো আমি সব সময়েই অনুভব করছি। যে যার সঙ্গ করে সে তো তারই স্বভাব পায়। আমিও আমার পুত্রদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছি যাতে কেউ খারাপ সঙ্গে মেলামেশা করতে না পারে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো বাছা, গুরুও একজন ধর্মপিতা, শিষ্যরা তাঁর পুত্রই হয়ে থাকে। তুমি যেমন পুত্রদের কল্যাণের জন্য তারা যাতে কুসঙ্গে না পড়ে তার জন্যে চেষ্টা করে থাকো, গুরুও নিজের শিষ্যদের যাতে তারা কুসঙ্গে না পড়ে সৎসঙ্গে মিলতে পারে তার জন্যে তিনি সব সময় চেষ্টা করে যান। তিনি শিষ্যদের কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেন, তাদের ভুল ভেঙে দেন। শিষ্য ভুল করলে গুরু সেই ভুল ভেঙে তা দূর করে দেন। এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ আছে, তা তোমাকে শোনাচ্ছি ঃ–

গুরুর দ্বারা আত্মদর্শন

কোন এক নদীতে খুব তীব্র স্রোত ছিল। পথিকরা ওই নদী বহু কষ্টে পায়ে হেঁটে পার হতো। একদিন কয়েকজন চাষালোক ওই নদী পার হওয়ার জন্যে তীরে এসে দাঁড়াল। কিন্তু খরস্রোতা নদী কীভাবে পার হবে তা তারা চিন্তা করতে লাগল। ওই চাষালোকগুলি ছিল মূর্খ, তবে তাদের মধ্যে একজন ছিল কিছুটা চতুর। সে বলল যে, আমরা দশজন লোক শিকলের মতো হাত ধরাধরি করে নদী পার হবো। এতে হবে কি কেউ নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে চলে যাবে না। তা-ই হল। দশজন চাষালোক পরস্পরের হাত ধরাধরি করে নদী পার হল। কিন্তু ওপারে গিয়ে গুনতিতে দেখা গেল দশজনের জায়গায় ন'জন হচ্ছে। গুনতিতে একজন কম হচ্ছে। তখন সকলে চেঁচামেচি করতে লাগল আর আক্ষেপ করে বলতে লাগল "আমাদের সর্বনাশ হল, আমাদের মধ্যে একজন লোক নদীতে ভেসে চলে গেছে।"

সে সময় এক সাধু মহাত্মা নদীতটে এসে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, "ভাই, তোমরা এত চেঁচামেচি করছ কেন? তোমাদের কী হয়েছে?' সবাই তখন সাধুর পা ধরে বলল, বাবা আমাদের মধ্যে একজন নদীর স্রোতে ভেসে গেছে। আমরা দশজন ছিলাম, এখন ন'জন রয়েছি।" সাধুজী হাসতে লাগলেন, তারপর বললেন, "তোমরা

দশজনই আছ। এ হল পরোক্ষ জ্ঞান।" তখন একজন চাষালোক বলল, বাবা, তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আমরা যে দশজন আছি তা দেখিয়ে দিন।" তখন সাধুজী তাকে বললেন, "ভাই, তুমি ফের আমার সামনে গণনা কর।" সে তখন এক দুই তিন করে গণনা শেষ করে বলল, "বাবা, ন'জন হচ্ছে।" সাধুজী তখন বললেন, দশমস্ত্বমসি "দশম ব্যক্তি তুমিই আছ। নিজেকে ছেড়ে দিয়ে গণনা করেছ, তাই একজন লোক কম হচ্ছিল। তাহলে দেখো, তোমরা দশজন ঠিকই আছ।" তখন চাষালোকদের অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) জ্ঞান হল, তারা খুব আনন্দিত হল। সাধু মহাত্মা চাষালোকদের দশ ব্যক্তির যে গুণতি করে দিলেন তার তাৎপর্য হল নিম্নরূপ ঃ–

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক) অন্তঃকরণ চতুষ্টয় (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার) এই নিয়ে হল ন'টি আর দশম হল চাষা (অর্থাৎ জীব) সদ্‌গুরু কী করলেন? তিনি চাষীকে বললেন – তুমি ন'জন লোক গণনা করছ, দশম লোককে ছেড়ে যাচ্ছো কেন? দশম ব্যক্তি তুমি নিজে। তুমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছো? তুমি তো সাক্ষী আছ, দ্রষ্টা আছ, আত্মা আছ, গণনায় তুমি নিজেকে ধর, তবেই জীবের আত্মবোধ হবে।

দেখো ভাই বিপিন, গুরু শিষ্যের জন্যে কী করে থাকেন? কিছু নয়। তিনি শিষ্যকে কী দেন? কিছুই নয়। কিন্তু তিনি শিষ্যের যে ভ্রান্তি – আমি জীব (জীবোঽহম্) তা দূর করে দেন। তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেন – তুমি জীব নও, তুমি হলে শিব, তুমি আত্মা। 'জীবোঽহম্' ভ্রান্তিকে তুমি দূর করে দাও। তাহলে তোমার মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে আরও দৃষ্টান্ত আছে।

কোন এক ব্যক্তি নিজের কানে কলম গুঁজে রেখে সে কথা ভুলে গিয়ে চারদিকে সেই কলম খুঁজে বেড়াচ্ছে আর বলছে, আমার কলম কোথায় গেল, আমার কলম কে নিয়েছে... ইত্যাদি। তখন একজন ব্যক্তি তাকে বলল – 'আরে, তোমার কলম তোমার নিজের কানেই গুঁজে রেখেছ।' অমনি প্রথম ব্যক্তির হুঁশ হল। ঝট্ করে কানে হাত দিতেই সে কলমটি পেয়ে গেল। গুরুও তেমনি শিষ্যকে বুঝিয়ে দেন যে, তোমার আত্মধন কেউ নিয়ে নেয়নি, সেই আত্মধন তোমার নিজের মধ্যেই রয়েছে। তুমি শুধু সে কথা ভুলে গেছ। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, আমার ভিতরে যে আত্মধন আছে, আমি তা দেখতে পাচ্ছি না কেন? এর উত্তর হল, উল্লিখিত উদাহরণ অনুযায়ী কলম তো কানেই আছে, কিন্তু তা দেখা যাচ্ছে না, তবে একজনের নির্দেশ অনুযায়ী কানে হাত দিতেই কলমটি পাওয়া গেল। যেমন চোখে কাজল আছে, কিন্তু চোখ সেই কাজল দেখতে পাচ্ছে না। অথচ কাজল চোখের কত কাছে রয়েছে। তেমনি

আত্মা বা ভগবান আমাদের মধ্যেই রয়েছেন, কিন্তু কাজলের মতো এত কাছে থাকা সত্ত্বেও আমরা ভগবানকে দেখতে পাই না। চোখের কাজল দেখতে হলে কী করতে হয়? একখানা পরিষ্কার আয়না চোখের সামনে ধরতে হয়। সেই আয়নার মধ্যেই দেখা যায় যে চোখে কাজল আছে।

দুটি বিষয় জানা দরকার। একটি হল – প্রাপ্তির প্রাপ্তি, আর একটি হল অপ্রাপ্তির প্রাপ্তি। গুরু কী করেন? তিনি প্রাপ্তির প্রাপ্তি করিয়ে দেন। গুরু অপ্রাপ্তির প্রাপ্তি করিয়ে দেন, তা নয়। তোমারই জিনিস তোমাকে পাইয়ে দেন। তুমি ভুলে গেছ, গুরু সেই ভুল ভেঙে দেন। আত্মা বা ঈশ্বর আমাদের চোখের কাজলের মতো একেবারে কাছেই রয়েছেন, কিন্তু তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। যে ভাগ্যবান ব্যক্তির সদ্‌গুরু লাভ হয় তারই আত্মদর্শন হয়। কীভাবে, যেমন চোখের কাজল দর্পনের সাহায্যে দেখা যায়, ঠিক তেমনি সদ্‌গুরু শিষ্যকে বলে দেন, "বাছা, তোমার এই চোখ দিয়ে ঈশ্বর দর্শন হবে না। তুমি দু'চোখ বন্ধ করে তাঁকে চিত্তদর্পণে দেখো, তাহলেই ঈশ্বরের দর্শন লাভ করবে। কিন্তু চিত্তদর্পন স্বচ্ছ হতে হবে, তাতে এতটুকু ময়লা থাকলে চলবে না। ফলে ঈশ্বর দর্শন হবে না। এই জন্যে সাধনরূপ মাজন দিয়ে চিত্ত-দর্পন পরিষ্কার করতে হবে।

দেখো, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান – সব ধর্মাবলম্বী লোকেরা চিত্তশুদ্ধির কথা বলে থাকে। মুসলমান লোক বলে থাকে 'দিলকো সাফ করনা'। হিন্দুরা বলে থাকে, 'চিত্তমল শুদ্ধ কর', এ কথার মানে তো এক রকম হল। এই চিত্তশুদ্ধির কথা সর্বজন সর্বব্যাপী সম্মত। তাহলে বল বিপিন, এতে তোমার কোন সংশয় আছে, না নেই?

বিপিন ঃ না মহারাজ, আপনার কথার মধ্যে আমার কোন সংশয় নেই। আমাদের বাংলার এক কবি চিত্তশুদ্ধির ভাবকে অবলম্বন করে একটি গীত রচনা করেছেন। তা শুনলে সাধকের পক্ষে ভাবের উপলব্ধি করা সহজসাধ্য হয় ঃ

আমি আমি করি বুঝিতে না পারি
কে আমি আমাতে আছে কোন রতন,
আমরা কোন শক্তি বলে, বেড়াই চলে বলে
কার অভাবে হবে এ দেহ পতন
চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই
তাইতে না বুঝি কে আছে আমার
চঞ্চলতা গেলে, দেখি চিত্তপটে
আঁকা আছে বাঁকা মদনমোহন।

শ্রীশ্রী ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে
শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী

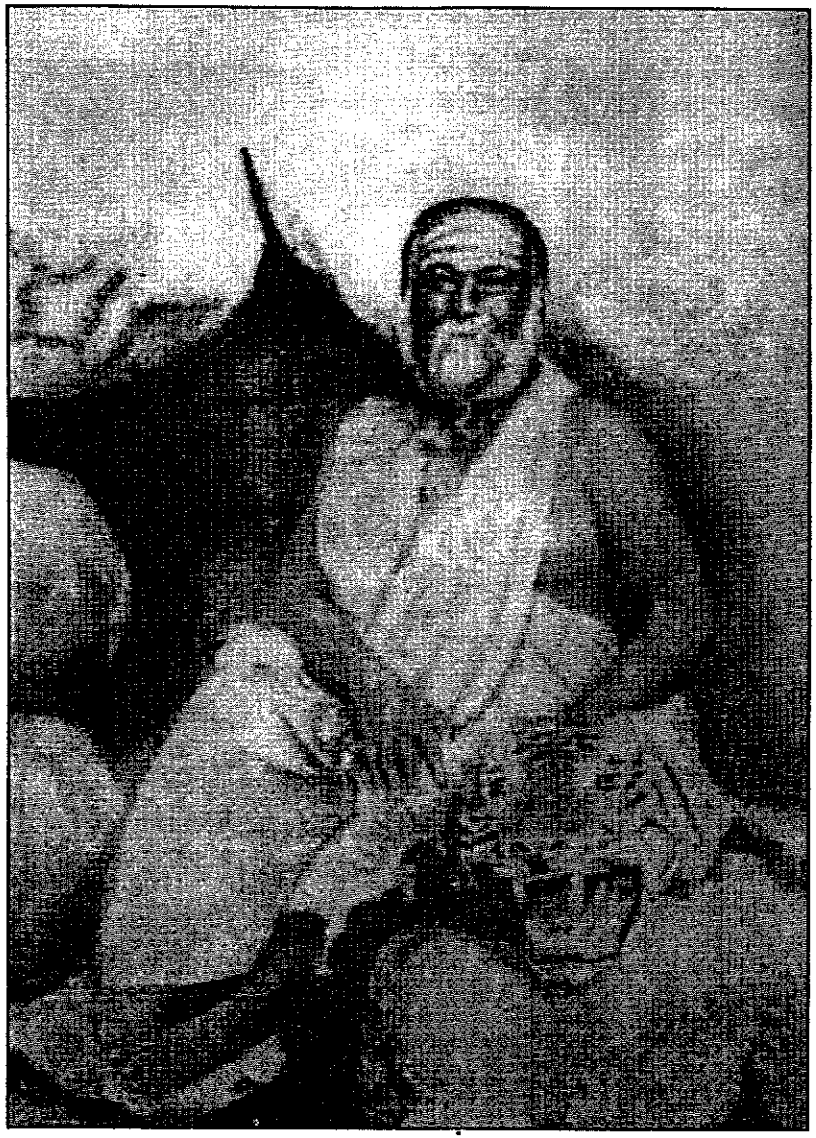

শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী (ছোটবাবা) মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হাঁ ভাই, এই গীতে যা বলা হয়েছে, তা একেবারে ঠিক। চঞ্চলতাই চিত্ত-মল। চঞ্চলতা চলে গেলে স্বরূপ দর্শন হয়ে যায়। ভক্তলোক ওই স্বরূপকে ভগবান মদনমোহন বলেছেন, জ্ঞানী তাঁকে ব্রহ্ম বলে থাকেন। যোগী তাঁকে আত্মা বলে থাকেন আর শক্তি-উপাসক তাঁকে প্রকৃতি বলে থাকেন। কীভাবে চিত্তকে স্থির করতে হবে, শুদ্ধ করতে হবে তা গুরু উপদেশের মধ্য দিয়ে সব বলে দেন শিষ্যকে। তাঁর উপদেশ অনুযায়ী সব কাজ করতে হয় শিষ্যকে। গুরু যে শিষ্যের হয়ে কাজ করে দেবেন, তা হবে না। সেইজন্যই শিষ্য করবার সময় গুরু তাকে ভালো করে পরীক্ষা করে নেন। যাকে তিনি শিষ্য হবার উপযুক্ত মনে করেন তাকেই তিনি সেইভাবে উপদেশ দেন। এসম্পর্কে একটি উদাহরণ তোমাকে বলছি ঃ

শিষ্যের পরীক্ষা – পায়রার গল্প

এক মহাপুরুষের কাছে দুজন লোক এসে বলল, বাবা, আপনি আমাদের উপদেশ প্রদান করুন, আমরা আপনার শিষ্য হব। তা শুনে ওই মহাত্মা লোক দুজনের হাতে একটা করে পায়রা দিয়ে বললেন, "তোমরা একটা কাজ কর দেখি। যেখানে কেউ দেখতে পাবে না এমন নির্জন স্থানে গিয়ে যে যার পায়রা মেরে আমার কাছে নিয়ে এসো। তারপর তোমাদের উপদেশ দেবো। লোক দুটি পায়রা দুটো নিয়ে চলে গেল।

একজন পায়রা নিয়ে নিজের বাড়িতে গেল। তারপর ঘরের দরজা জানলা ভালো করে বন্ধ করে পায়রা মেরে মহাত্মার কাছে নিয়ে এসে বলল, "যেখানে কেউ ছিল না এমন এক নির্জন স্থানে আমি পায়রাটাকে মেরে ফেলেছি। মারবার সময় কেউ দেখতে পায়নি। লোকটার কথা শুনে মহাত্মা বললেন, "সে কি কথা! নির্জন জায়গা তুমি কোথায় পেলে? কেউ দেখতে পায়নি বলছ, কেন? তুমি সেখানে ছিলে না? তুমি দেখোনি? তুমি কি তবে মানুষ নও? যাক এখনও তুমি আমার শিষ্য হওয়ার উপযুক্ত হওনি।" তখন ওই লোকটি চলে গেল। এর কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় লোকটি জ্যান্ত পায়রা নিয়ে মহাত্মার কাছে এসে বলল, "বাবা, পায়রা মারবার জন্য কোন নির্জন স্থান আমি খুঁজে পেলাম না। অন্য কোন লোক না থাকলেও আমি তো সেখানে ছিলাম। পায়রা মারবার সময় আর কেউ দেখতে না পাক, আমি তো দেখতে পাবো। তাই ভাবলাম যে আমিও তো একটি মানুষ, আমার সামনে আমি যদি পায়রাটাকে মারি, তাহলে তো আপনার আদেশ অমান্য করা হবে। এই কথা মনে করে পায়রা ফেরৎ নিয়ে এলাম।"

সাধু মহাত্মা লোকটির উপর খুব খুশি হয়ে বললেন, "দেখো বাবা, আমি তোমাদের দুজনকে পরীক্ষা করবার জনেই পায়রা দুটি দিয়েছিলাম। নইলে কোন মহাত্মাই কখনো জীবহত্যার পরামর্শ দেন না। এখন বুঝলাম – তুমিই আমার শিষ্য হওয়ার উপযুক্ত।"

শিষ্যের পরীক্ষা – বিষ্টার গল্প।

দেখো ভাই বিপিন, শিষ্য পরীক্ষার আর একটি কাহিনি তোমাকে শোনাচ্ছি। এক সাধু মহাত্মার এক শিষ্য রোজ তাঁর কাছে ব্রহ্মমন্ত্র দেবার জন্যে আবদার করত এই বলে – হে গুরুদেব, আপনি আমাকে ব্রহ্মমন্ত্র দান করুন। গুরু ভাবলেন – একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে – শিষ্য ব্রহ্ম মন্ত্র লাভের অধিকারী হয়েছে কি না। এই ভেবে তিনি শিষ্যকে বললেন, "তুমি কিছুদিন তীর্থ করে এসো, তারপর ব্রহ্মমন্ত্র দেওয়া হবে। তবে তীর্থ থেকে ফিরবার সময় সবচেয়ে খারাপ যে জিনিস দেখতে পাবে, তাই আমার জন্যে নিয়ে এসো।"

শিষ্য বহু তীর্থ ভ্রমণ করল। ফিরবার সময় তার চিন্তা হল — বিষ্টার চেয়ে খারাপ জিনিস তো আর নেই, তাই গুরুদেবের জন্যে খানিকটা বিষ্টাই নিয়ে যাই। এই ভেবে যেমনি সে মাঠ থেকে বিষ্ঠা তুলতে গেল অমনি বিষ্ঠা তাকে ধমক দিয়ে বলে উঠল "খবরদার, তুমি আমাকে ছোঁবে না। আমাকে নিয়ে তোমার কী দরকার?" শিষ্য বলল, "গুরুদেব বলে দিয়েছেন সবচেয়ে খারাপ জিনিস নিয়ে গিয়ে তাঁকে দিতে হবে। তা তোমার চেয়ে খারাপ জিনিস তো আর কিছু নেই।"

শিষ্যের কথা শুনে বিষ্ঠা ভয়ানক রেগে গেল। সে বলল, "তার মানে? তুমি ভাবছ আমার চেয়ে তুমি শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মোটেই তা নয়। জেনে রেখো, তোমার চেয়ে আমি শতগুণে শ্রেষ্ঠ। গতকালকেই আমি কত রকম উপাদেয় জিনিস ছিলাম, দেবতারাও আমাকে ভোগ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব ছিলেন আর কত রকম নামই না ছিল আমার - পুরি, কচুরি, মেঠাই, আর কত কি, আর কি তার গন্ধ! আর দেখো, দু-চার ঘন্টা তোমাদের সংসর্গে থেকেই আজ আমার কী দশা হয়েছে, এখন আমার নাম হয়েছে বিষ্ঠা। কোথায় গেল আমার সেই সুগন্ধ, তোমাদের সঙ্গদোষে এখন এই দুর্গন্ধ নিয়ে আমি পড়ে আছি। আর আমি তোমাদের সংসর্গে যাচ্ছি না, গেলে না জানি আরও কত দুর্দশায় আমাকে পড়তে হবে। এখনো শূয়রের পাল কত আদর করে আমাকে খাচ্ছে, কৃষকরা মাটিতে সার দেবে বলে কত যত্ন করে আমাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, এখনো আমি কত কাজে লাগছি, কত আদর পাচ্ছি। এখন নিজেই

বুঝে দেখো – আমি খারাপ না তুমি খারাপ। তোমাদের কাছে থেকেই আজ আমার এই দশা, আর তোমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে বসে আছ। খবরদার বলছি – তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না।"

বিষ্ঠার কথা শুনে শিষ্যের চৈতন্য হল। সে তখন বুঝতে পারল যে এই মল-মূত্র-পুঁজ - রক্ত - ভরা শরীরই হল সবচেয়ে খারাপ জিনিস। শিষ্য এসে দাঁড়াল গুরুর কাছে। গুরু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন "আমার জন্যে তুমি সবচেয়ে খারাপ জিনিস কী নিয়ে এলে?" শিষ্য বলল, "গুরুদেব, আমি অনেক ভেবে দেখলাম আমার এই শরীরটার চাইতে খারাপ জিনিস আর কিছু নেই, তাই নিজেকেই আমি আপনার পায়ে সঁপে দিলাম।" গুরুদেব দেখলেন এতদিনে শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার জন্মেছে, তাই এবার গুরুদেব তাঁকে ব্রহ্মমন্ত্র দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই বিপিন, এখন তোমাকে অধিকারী হতে হবে। তোমার বৃদ্ধকাল উপস্থিত, আর কিছু কালের মধ্যে তোমার সমস্ত প্রিয় বস্তু ছেড়ে দিয়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে। আর ছাড়তে যখন হবেই, তখন একটু আগেই ছেড়ে দেওয়া ভালো। যত শীঘ্র সম্ভব বিষয় আশয় ত্যাগ করে হরিনাম করা উচিৎ।

"মনুয়া ক্ষেতি কর্‌না হরিনাম কি, রুপেয়া না লাগে, কড়ি না লাগে ছেলাম কি।"

হরিনাম করবার জন্যে কিছু পয়সা কড়ি লাগে না, কিছু সেলামীও দিতে হয় না, তাই তুমি তোমার হৃদয় জমিতে হরিনামের ক্ষেত লাগাও, চাষ কর।

বিপিন ঃ মহারাজ, আমি তো আপনাকে প্রথমেই বলেছি – হরিনামে আমার রুচি হয় না। আপনাকে মিথ্যে আজেবাজে কথা বলার প্রবৃত্তি আমার নেই। তাই আমি সত্যি কথাই বলছি – আমার ধৃষ্টতা আপনি মাফ করবেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই, ধৃষ্টতা কিছু নয়, আমিও তোমাকে বলছি যে এতে আমার কোন স্বার্থ নেই। তবে তুমি আমাকে বলবার অধিকার দিয়েছ। ধর্মবিষয়ে উপদেশ করার আমারও এক কর্তব্য, এজন্যে আমি তোমাকে এত কথা বলছি। তোমার হরিনামে রুচি হয় না – তা আমি জানি। আসলে নামে তোমার বিশ্বাস নেই। আচ্ছা বিপিন বলতো, মন্ত্রের যে শক্তি আছে তা তুমি মান?

বিপিন ঃ না মহারাজ, মন্ত্রশক্তিতে আমার কোন বিশ্বাস নেই। মন্ত্র জপ করলে যে কিছু লাভ হবে – এ ধারণা আমার নেই।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ মন্ত্রশক্তি, দ্রব্য-শক্তি, আর ক্রিয়াশক্তি – এই তিন শক্তিকে মানতেই হবে। সুরেশ সর্বাধিকারী (একজন তৎকালীন বিখ্যাত ডাক্তার) যখন আমার কাছে এল, আমি তাকে প্রশ্ন করলাম – তুমি মন্ত্রশক্তি, ক্রিয়াশক্তি আর দ্রব্যশক্তি, এই তিনশক্তিকে মান? সুরেশ বলল, বাবা আমি তো একজন ডাক্তার, আমাকে তো দ্রব্য শক্তি মানতেই হবে। কোন রোগীর পায়খানা হচ্ছে না, তাকে জোলাপ দিলেই পায়খানা পরিস্কার হয়ে যায়। কারুর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, তাকে যন্ত্রণা কমার ওষুধ দিলে তার তখন আর যন্ত্রণা থাকে না। এ সব চোখে দেখে স্বীকার করতেই হয় যে দ্রব্য শক্তি বলে কিছু আছে।

ক্রিয়া শক্তিকেও মানতে হয়, এর কাজ তো প্রায়ই দেখে থাকি – যেমন চুন ও হলুদ মেশালে লাল রংয়ের সৃষ্টি হয়, তাদের পরস্পর মিশ্রণ ক্রিয়ার ফলে লাল রং সৃষ্টি হয়। – এ তো প্রত্যক্ষ দেখা যায়। এজন্যে ক্রিয়া শক্তিকে আমাদের মানতেই হবে। কিন্তু মন্ত্র শক্তি তো কিছু দেখা যায় না, তাই মানা যায় না।

তখন আমি বললাম – বেশ, আমি তোমাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেবো, তখন তোমাকে মন্ত্রশক্তি মানতে হবে। সুরেশ বলল – মহারাজ, আমি তো আপনার একজন সেবক। আপনি যা বলবেন আমি তা মেনে নেব। কিন্তু বিশেষ কিছু জানতে গেলে তর্ক করতেই হয়। আমি বললাম, বাছা সুরেশ যুক্তিপূর্বক তর্ককে তর্ক বলে না, তাকে সৎসঙ্গ বলা হয়। যুক্তিপূর্বক তর্ক যদি না কর, তাহলে কোন প্রশ্নের মীমাংসাই হবে না। দেখো ভাই সুরেশ – মন্ত্রের যে শক্তি আছে তা তুমি মানছো না। আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে মন্ত্রের শক্তি আছে। তখন তুমি তা মেনে নেবে।

প্রথমে দেখো, মন্ত্র কী বস্তু? ও তো একটা শব্দ। শব্দ দু'রকমের হয়, ধ্বন্যাত্মক আর বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক শব্দ কাকে বলে? যেমন, এক জায়গায় বাজ পড়ল, ভীষণ শব্দে তোমার কানে তালা গেলে গেল, দু'চোখ তোমার আপনি বুঁজে গেল আর ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। এরকম হল কেন? বাজ তো দূরে পড়েছে, তাতে তোমার কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু সেই শব্দের এমনই শক্তি যে তা শুনেই তোমার শরীর আর মনে এক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। আবার দূরে কোথাও মধুর সুরে এক বাজনা বাজছে, কিসের বাজনা তা তুমি বুঝতে পারছ না, কিন্তু সেই সুর তোমার কানে ভেসে আসছে, আর তাতে তোমার মন প্রাণ একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই মিষ্টি সুরে তোমার কিন্তু বস্তুগত কোন লাভ হচ্ছে না। তবু এত আনন্দ পাচ্ছ কেন? দেখো ভাই, দু'রকমের

ধ্বনির প্রভাব তোমাকে শুনিয়ে দিলাম। এ হল ধ্বন্যাত্মক মন্ত্রশক্তির কথা। এই শক্তিকে তুমি অস্বীকার করতে পারবে?

এখন বর্ণাত্মক মন্ত্র কী তা তোমায় বলছি। যেই তোমাকে আমি 'সুরেশ' বলে ডাকলাম, অমনি তুমি আমরা কাছে এসে দাঁড়ালে। বর্ণের বা নামের সঙ্গে যে শব্দ তাকে বলে বর্ণাত্মক মন্ত্র। তোমাকে ডাকতেই তুমি যেমন কাছে এসে দাঁড়ালে, তেমনি ঈশ্বরবাচক বর্ণ যোগ করে যদি ডাকা যায়, তাহলে ঈশ্বরেরও সাড়া পাওয়া যায়। বশীকরণ মন্ত্র তুমি মানো তো? সুরেশ বলল, "না মহারাজ, আমি মানি না।" – তাহলে এখনই তোমায় মানিয়ে দিচ্ছি। দেখো, আমি যে এখন তোমার সঙ্গে মধুর ভাবে কথা বলছি, তাতেই তো তুমি আমার কাছে বসে রয়েছ। এখন যদি তোমাকে দু-চারটে গালাগালি দিই, তাহলেই তো তুমি রেগে গিয়ে এখান থেকে ঝট্ করে উঠে যাবে, এক মুহূর্তও আর এখানে বসবে না।

তখন সুরেশ বলল, হাঁ মহারাজ, এখানে দুটি ক্ষেত্রে দু'রকম ভাব মানতেই হবে। আপনার মধুর কথা শোনবার জন্যে আমরা এখানে আসি, বসি, যদি আপনি কর্কশ কথা বলেন, তাহলে আমরা এখান থেকে চলে যাব। তখন আমি বললাম – দেখো ভাই সুরেশ, মধুর শব্দ, বশীকরণ মন্ত্র, কর্কশ বুলি, উচাটন মন্ত্র – এসব মন্ত্রশক্তি তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। মন্ত্রশক্তিকে তুমি কিছুতেই খণ্ডন করতে পারবে না।

তখন সুরেশ বলল – মহারাজ, ঈশ্বর বাচক বর্ণযোগ করলে যে ধ্বনি হবে তাতেই ঈশ্বর লাভ হবে? আমি বললাম - হাঁ, অবশ্যই ঈশ্বর লাভ হবে। নাম নামী অভেদ। নাম করতে করতেই নামীকে পাওয়া যায়। দেখো ভাই, আমি তোমাকে দৃষ্টান্ত মূলক একটি গল্প শোনাচ্ছি, যা থেকে তুমি সহজেই ভাব গ্রহণ করতে পারবে।

'নাম করলে নামীকে পাওয়া যায় ঃ

এক মহাপুরুষ বহুদিন ধরে তপস্যা করেছেন, কিন্তু তিনি ভগবানের দর্শন লাভ করেননি। একদিন তিনি দৈব আদেশ পেলেন ঃ দেখো বাছা, তুমি দুঃখ করো না। নিজের চেষ্টায় তুমি ভগবানকে লাভ করতে পারবে না। তুমি একজন উত্তর সাধক খুঁজে নাও, তারই সাধনার বলে তোমার ঈশ্বরদর্শন হবে। তোমার সাধনার মধ্যে একটি ত্রুটি রয়েছে, তা হল তোমার একাগ্রতার অভাব। গভীর একাগ্রতা যার আছে এমন একজন মানুষকে যদি উত্তরসাধক করতে পারো তাহলে তার সাহায্যে নিশ্চয় তুমি ভগবানের দর্শন পাবে। দৈববানী শুনে সাধু তখন তপস্যা বন্ধ রেখে উত্তরসাধকের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

একদিন এক নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে সাধু দেখতে পেলেন একটি ছেলে ছিপ নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে বসেছে। তার মনের একাগ্রতা কতখানি তা জানবার জন্যে সাধু ছেলেটির পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময় এক বরযাত্রীর দল নানারকম বাজনা বাজিয়ে হই-চৈ করতে করতে সেখান দিয়ে মিছিল করে যাচ্ছিল। সাধু দেখলেন, ছেলেটি একবারের জন্যও পিছন ফিরে তাকাল না, যেমন ছিপের দিকে নজর ছিল, তেমনি একমনে সে সেদিকেই তাকিয়ে রইল। এর কিছুক্ষণ পর তার ছিপে যখন মাছ উঠল তখন সে মাছটাকে ভাল করে রেখে পিছন দিকে ফিরে চাইল। ঠিক তার পিছনে সাধু দাঁড়িয়ে ছিলেন। সাধুকে দেখে ছেলেটি প্রণাম করল। সাধু তখন বললেন, "বাবা, আমি তো অনেকক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এতক্ষণ প্রণাম করোনি কেন?" ছেলেটি বলল, "মহারাজ, আমি এতক্ষণ আপনাকে দেখতে পাইনি।" সাধু জিজ্ঞাসা করলেন," আচ্ছা, এইমাত্র যে বরযাত্রীর দল এখান দিয়ে বাজনা বাজিয়ে গেল তা তুমি দেখেছ তো?" ছেলেটি বলল, "না মহারাজ, আমি বরযাত্রীদের দেখিনি, বাজনাও শুনতে পাইনি। আমার মন শুধু মাছের দিকেই পড়েছিল।"

ছেলেটির কথা শুনে সাধু অবাক হয়ে গেলেন। এমন একাগ্রতা, এমন তন্ময়তা তিনি কখনো কারুর মধ্যে দেখেননি। তিনি ভাবলেন – একে যদি উত্তরসাধক করতে পারি, তাহলে এর দৌলতেই আমার ঈশ্বরদর্শন হয়ে যেতে পারে। এই ভেবে তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ বাবা, মাছ ধরে তুমি কত টাকা রোজগার করো?" ছেলেটি বলল "চার আনা"। সাধু তাকে বললেন, "তোমাকে আর মাছ ধরতে হবে না, আমি তোমাকে রোজ এক টাকা করে দেব, যদি তুমি আমার কাজ করতে রাজী থাকো। দেখো বাবা, আমার একটা ছোটো ছেলে আছে, কিন্তু আমি তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি তাকে খুঁজে বের করে দাও।" ছেলেটি রাজী হয়ে বলল, "আপনার ছেলে কেমন দেখতে, কোথায় আর কীভাবে তার খোঁজ করতে হবে তা আমাকে বলে দিন, আমি ঠিক তাকে খুঁজে বের করে দেব।" তখন সাধু বললেন "আমার ছেলের গায়ের রং নবীন মেঘের মতো, তার কুঞ্চিত কেশ, মাথায় তার শিখিপুচ্ছের চূড়া, পায়ে নুপুর, হাতে বাঁশি, বিজলির মতো তার অঙ্গজ্যোতি। তার নাম হল গোপাল, বড়ো চঞ্চল সেই ছেলে। ঐ বনের মধ্যে সে লুকিয়ে আছে, সেখানে তুমি খোঁজ করে দেখো। 'গোপাল গোপাল' বলে ডাকলে নিশ্চয় তুমি তার সন্ধান পাবে। তবে সহজে সে ধরা দেবে না। নিবিড় বনের মধ্যে তোমাকে অনেকক্ষণ তার নাম

ধরে ডাকতে হবে, তবেই সে তোমার কাছে আসবে। কিন্তু সহজে তুমি তাকে ধরতে পারবে না। তাঁর বাঁশি শুনতে পাবে, পায়ের নুপুরের আওয়াজ শুনতে পাবে, আর তখনই বুঝবে সে তোমার খুব কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

সাধুর কথা শুনে ছেলেটি নিবিড় বনের মধ্যে গিয়ে 'গোপাল গোপাল' বলে ডাকতে লাগল। তন্ময় হয়ে ডাকতে ডাকতে সে শুনতে পেল বাঁশির মধুর সুর আর নুপুরের ঝঙ্কার। আনন্দে তার প্রাণ ভরে উঠল। সে তখনই সাধুর কাছে ছুটে এসে বলল, 'আপনার ছেলের বাঁশির আর নুপুরের শব্দ আমি শুনতে পেয়েছি, কিন্তু এখনো তাকে দেখতে পাইনি।" সাধু তাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'বাবা, ছেলেটি আমার বড়ো চঞ্চল, সহজে সে তো ধরা দেবে না, তবে একবার যখন সে তোমার কাছাকাছি এসেছে তখন এইবার দূর থেকে তাকে দেখতে পাবে। এবার দেখবে শ্যামলবরণ, পীতবসন, কণ্ঠে বনমালা, উজ্জ্বল কান্তি আমার গোপাল তোমার সামনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিদ্যুতের মতো চমক দিয়ে সে এখানে ওখানে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই জ্যোতি দেখে তুমি 'গোপাল' 'গোপাল' বলে ডেকে যাও।"

সাধুর কথা মতো পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ছেলেটি গোপালের খোঁজ করে চলল। তারপর যখন জ্যোতি দর্শন হল তখন সে আনন্দে অধীর হয়ে সাধুকে এসে বলল, 'মহারাজ, গোপালের অঙ্গের জ্যোতি আমি দেখেছি, আমি দেখেছি গোপাল দূরে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমার কাছে সে তো আসছে না। ওকে কেমন করে ধরব?' সাধু বললেন, 'এবার সে তোমাকে ধরা না দিয়ে পারবে না, তুমি শুধু নাম ধরে একমনে ডেকে যাও।' একাগ্রচিত্তে ডাকতে ডাকতে ছেলেটির মধ্যে ভাবোন্মাদ দেখা দিল, তন্ময় হয়ে সে তখন দেখতে লাগল নব ঘনশ্যাম গোপালকে।

ছেলেটি তখন সাধুর কাছে এসে বলল, 'গুরুদেব, আপনার কৃপাতেই আমি গোপালের দর্শন পেলাম।' সাধু বললেন, 'বাবা, এতদিন আমি তোমার গুরু ছিলাম, কিন্তু আজ থেকে তুমি হলে আমার গুরু। কীভাবে তুমি গোপালের দেখা পেয়েছ, আমাকে তা এখন শিখিয়ে দাও।' ছেলেটি তখন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে সাধুকে নিয়ে গেল, তারপর যেভাবে একাগ্রচিত্তে সে নাম জপ করত তা সাধুকে দেখিয়ে দিল। সাধুর প্রতি আদেশ ছিল যে উত্তর সাধকের সাহায্যে তিনি সিদ্ধিলাভ করবেন। তাই তিনি ছেলেটির কাছে দীক্ষা নিয়ে তারই নির্দেশ মতো জপতপের সাধন করতে লাগলেন এবং সেইভাবে নাম করতে করতে অতি সহজে অর্থাৎ ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হলেন। 'তদ্ জপস্তদর্থ ভাবনম্', (পাতঞ্জল যোগদর্শন ১/২৮) –

অর্থাৎ জপ কর আর তার অর্থ ভাবনা কর। অর্থাৎ তার রূপের বা লীলার ধ্যান কর। আমি নাম জপ করছি আর আমার মন বাজারে গিয়ে জিনিসপত্তর কেনাকাটি করছে – এরকম জপের কোন লাভ নেই। নাম জপ করবে আর মন ইষ্ট দেব/দেবীর রূপের ভাবনা বা চিন্তা করবে। ভাবনা করতে করতেই ভাবোন্মাদ হবে, অবশেষে ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ হবে। নাম করতে করতে নামীকে পেয়ে যাবে।

তখন সুরেশ সবাধিকারীকে জিজ্ঞাসা করলাম – এখন নামের উপর বিশ্বাস এসেছে তো? সুরেশ বলল, 'হাঁ মহারাজ, আপনার উপদেশ শুনে আমার নামে রুচি এসেছে, এখন আমি আপনার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করব।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই বিপিন, সুরেশ তো একদম নাস্তিক ছিল। কিন্তু ও এখানে দীক্ষা গ্রহণ করল আর এখানকার পরম ভক্ত হয়ে গেল। দেখো ভাই, সুরেশ সবাধিকারী তো বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিল, ও তো মন্ত্র শক্তি কী তা বুঝে নিল আর মেনেও নিল। একদিন সুরেশকে বললাম, ভাই, তুমি একজন ডাক্তার, বহু রোগ আরোগ্য করে দিচ্ছ, কিন্তু ভবরোগ ভালো করার জন্য কিছু ওষুধ দাও। মানুষ ভবরোগে আক্রান্ত হয়ে খুবই দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে। তাদের নিরোগ করা দরকার। তখন সুরেশ বলল, 'মহারাজ, আমি তো নকল ডাক্তার, আসল ডাক্তার তো আপনি, ভবরোগের ওষুধ আপনার কাছে আছে। আমাকে এই ওষুধই দিয়ে দিন। 'তখন আমি বললাম, দেখো ভাই, ভবরোগ খুবই কঠিন রোগ, তা থেকে মুক্ত হতে হবে। জন্ম আর মৃত্যু পরম্পরা ভাবে হতেই থাকবে, তা নিবারণ করতে হবে। এ সম্পর্কে প্রচলিত কথা আছে ঃ

'যমরাজ, বৈদ্যকো দেখ্‌কর হাসতা
পৃথিবী, রাজাকো দেখ কর হাসতা
লক্ষ্মী, কৃপণকো দেখ্ কর্ হাসতা।'
এর তাৎপর্য হল –

যমরাজ হাসছে ঃ যমরাজ বৈদ্যকে দেখে হাসেন। বৈদ্য রোগীকে বাঁচাবার জন্য কত চেষ্টাই না করে। যেন কিছুতেই তাকে মরতে দেবে না, ওষুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবে। তাই দেখে যমরাজ হাসেন আর ভাবেন, মূর্খ বৈদ্য জানে না যে, তার রোগীর ঘাড় আমি চেপে ধরেছি, আর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর আমি যমরাজ, ওই বৈদ্যেরও ঘাড় ধরে একদিন নিয়ে যাব।

পৃথিবী হাসছে ঃ পৃথিবী হাসেন রাজাকে দেখে। রাজা গর্ব করে ভাবছে – আমি

পৃথিবীপতি, পৃথিবীর অধীশ্বর আমি। রাজার এই গর্ব দেখে পৃথিবী হাসেন আর ভাবেন – আরে রাজা, কীসের অভিমান করছ তুমি? তোমার মতো কত রাজাই তো 'আমি রাজা, আমার রাজত্ব' বলে অভিমান করে গিয়েছে, তারা সব এখন কোথায়? সবাইকে আমি শেষ করেছি। রাম রাবণের মতো সব রাজাকেই আমি শেষ করেছি। তোমারও একদিন সেই দশা হবে। তোমারও কোথাও পাত্তা পাওয়া যাবে না।

লক্ষ্মী হাসেন ঃ লক্ষ্মী হাসেন কৃপণকে দেখে। কৃপণ ভাবে আমার ধনদৌলত কিছুই আমি খরচ করব না, সব পুঁজি করে রেখে দেব। কত তালা চাবি দিয়ে আট ঘাট বেঁধে সিন্দুকে টাকা ভর্তি করে রেখে দেয়। তাই দেখে লক্ষ্মী হাসেন আর ভাবেন - আরে কৃপণ, যতই তুমি আমাকে তালাচাবি দিয়ে আটকাও না কেন, আমি যখন চলে যাব তখন কোন্ রাস্তা দিয়ে যে যাব তা তুমি জানতেও পারবে না। আমাকে কি তুমি তালাচাবি দিয়ে আটকে রাখতে পারবে?

দেখো ভাই বিপিন, সুরেশের সঙ্গে এভাবে বহু সৎসঙ্গ হয়েছিল। সুরেশ সবাধিকারী প্রথমে নাস্তিক ছিল কিন্তু সৎসঙ্গ লাভ করে ও দীক্ষা গ্রহণ করল আর এখানকার একজন ভক্ত হয়ে গেল। তুমিও কিছু ধর্মচর্চা কর।

'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।।'

দেখো বিপিন, তুমি এই শ্লোকটি বিচার কর। শ্লোকটির অর্থ হল ঃ আমি ধর্ম জানি তবে ধর্মে আমার প্রবৃত্তি নেই। অধর্মও জানি তবে তাতে আমার নিবৃত্তি নেই। অতএব হে হৃদয়স্থিত হৃষিকেশ, তুমি আমাকে যেমন কর্মে নিযুক্ত কর আমি তেমনি কাজ করি।

দেখো ভাই বিপিন, তোমাকে আমি বহু সুগম রাস্তার সন্ধান দিয়েছি – তোমাকে জপ তপ কিছু করতে হবে না, কিন্তু ভালো করে উল্লিখিত শ্লোকটির ভাব হৃদয়ে ধারণ করে নাও।

বিপিন ঃ হাঁ মহারাজ, আমাদের বাংলায় একজন কবি একটি গান লিখে গেছেন –

'সকলি তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি তোমার কর্ম তুমি কর মা
লোকে ভাবে করি আমি।' (রামপ্রসাদ)

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হাঁ ভাই, আমার কর্ম, আমি করছি, এই ভাব ত্যাগ করে তোমার কর্ম তুমি আমাকে দিয়ে করাচ্ছো – এই ভাব গ্রহণ করতে হবে। এতে কর্মের বন্ধন হবে না। হে পরমাত্মাদেব, সব তোমারই কার্য, আমি তোমার কর্মচারী মাত্র। এ বিষয় শাস্ত্রের রাজা জনক এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। একদিন ঋষি ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব পিতার কাছে এসে বলল, হে পিতা, আমি কার কাছে দীক্ষা নেব? ব্যাসদেব বললেন, তুমি রাজা জনকের কাছে গিয়ে দীক্ষা নাও। শুকদেব রাজা জনকের কাছে গিয়ে দেখলেন, রাজা জনক অতুল ঐশ্বর্যে মগ্ন হয়ে আছেন এবং এক সুন্দরী নারীর বুকের উপর হাত দিয়ে বসে আছেন। এ দৃশ্য দেখে শুকদেবের খুব ঘৃণা হল, ভাবল — এঁর কাছে কী দীক্ষা নেব! কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল যে রাজা জনক যজ্ঞ করতে বসেছেন, অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছেন, জ্বলন্ত অগ্নিতে হাত ঢুকিয়ে অগ্নয়ে স্বাহা, অগ্নয়ে স্বাহা বলে আহুতি দিচ্ছেন। তখন শুকদেব অবাক হয়ে ভাবতে লাগল – এই রাজা জনকই হলেন প্রকৃত একজন পরম জ্ঞানী। তাঁর শরীরের কোন বোধই নেই। তাঁর কাছে সুন্দরী নারীর বক্ষস্থল কী জিনিস আর অগ্নিই বা কী জিনিস তা তিনি জানেন না। অর্থাৎ দুটি বস্তুর মধ্যে তাঁর কাছে কোন ভেদ নেই।

'সমত্বং যোগ উচ্যতে' (গীঃ ২/৪৮) (সমত্ব বুদ্ধিই যোগ)

রাজা জনকের সমজ্ঞান হয়ে গেছে। তার কাছে ঢিল আর সোনা দুই সমান। যার জ্ঞান হয়েছে যে সংসার মিথ্যা, তার কাছে সংসারের কোনও বস্তুই বাধক হয় না। দেখো – যেমন রবারের সাপ দেখে মানুষের ভয় হয়, কিন্তু একবার যদি জ্ঞান হয় এই সাপ মিথ্যে, এ তো আসল সাপ নয়, এ রবারের সাপ, তখন সাপ দেখে তার আর ভয় হবে না। ওই সাপ নিয়ে কখনো সে খেলছে, কখনো জামার পকেটে রাখছে আবার কখনো ওই সাপ নিয়ে অপরকে ভয় দেখাচ্ছে। এইভাবে ইচ্ছেমতো সে খেলা করতে থাকে।

ঠিক তেমনি সংসার যে মিথ্যা, এই বোধ একবার জন্মালে কোন বস্তুই সাধকের বাধক হবে না, শাস্ত্রে মাখনের দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে। মাখন যখন দুধের মধ্যে মিশে থাকে, তখন সে অজ্ঞানী। পরে সেই দুধকে জমিয়ে দই করে আবার যখন সেই দইকে খোল করে মাখন বের করা হয়, তখন সেই মাখনকে তুমি ঘোলের মধ্যেই ফেলে রাখো আর জলের মধ্যেই ফেলে রাখো, তা ঘোল বা জলের সঙ্গে মিশে যাবে না। মাখন তখন আলগা হয়ে উপরে ভাসতে থাকবে। এতক্ষণে মাখন হল জ্ঞানী। তেমনি মানুষও যখন জ্ঞানলাভ করে এবং সংসারকে মিথ্যা বলে বুঝতে

পারে, তখন সেও সংসারের সঙ্গে মিশে যাবে না, সংসারে থাকলেও তার কোন ক্ষতি হবে না, সে মাখনের মতো আলগা হয়ে সংসারের উপরে ভেসে থাকবে।

জ্ঞানীকে চিনবে কেমন করে? শাস্ত্র তো পাঁচজন জ্ঞানীর উল্লেখ করেছেন।

কৃষ্ণঃ ভোগী, শুকস্ত্যাগী রাজা জনকরাঘবৌ।

বশিষ্ঠঃ কর্মকর্তারঃ পঞ্চৈতে জ্ঞানিনঃ সমা।।

শাস্ত্র এই পাঁচ জ্ঞানীর কথা বলেছেন। কিন্তু এই পাঁচজনের বাইরের ভাব দেখে কী করে জ্ঞানীর ভাব বুঝতে পারবে? কিছুই বোঝা যাবে না। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর বিরহে কেঁদে কেঁদে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ষোলো হাজার মহিষী নিয়ে দ্বারকার অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করেছেন। বশিষ্ঠ ছিলেন মহাকর্মী, শুকদেব ছিলেন মহাত্যাগী আর জনক ছিলেন একজন রাজা। এঁদের কি কেউ জ্ঞানী বলে চিনতে পারবে? এঁদের সঙ্গে অজ্ঞানীদের তাহলে তফাতটা কোথায়? জ্ঞান হল সাধকের সপ্তম ভূমি। প্রথম তিন ভূমি হল অজ্ঞানীদের জন্য। চতুর্থ ভূমিতে এসে সাধক জ্ঞানরাজ্যের দ্বারে এসে পৌঁছায়। তখনো তাঁর পূর্ণ জ্ঞান হয়নি। সপ্তম ভূমিতে সাধক এসে পৌঁছলে তবেই সে হবে পূর্ণ জ্ঞানী। সপ্তম ভূমিতে পূর্ণজ্ঞানীর কী রকম অবস্থা হয় শাস্ত্রকার মাছের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মাছ জলে থাকে। জল থেকে তাকে তুলে নিলে সে মরে যায়। সপ্তম ভূমির সাধকের অবস্থাও তাই। ভগবানের সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্রও ভেদ থাকে না। তাঁর সঙ্গে অভেদভাবে তিনি অবস্থান করেন। সেই অভেদ ভাব থেকে এতটুকু বিচ্যুত হলেই তাঁর প্রাণ আর থাকবে না। তাঁর দ্বারা ব্যবহারকার্য করা সম্ভব নয়। চতুর্থ ভূমিতে সাধকের অবস্থা কী রকম হয়? তার অবস্থা হচ্ছে কচ্ছপের মতো। কচ্ছপ জলেও থাকতে পারে আবার স্থলেও ঘুরে বেড়ায়। সেইভাবে এই ভূমির সাধকরা ব্যবহার কার্যও করে, আবার ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেও চলে।

রাজা জনক সংসারকেও ভোগ করেছেন আবার পরম জ্ঞানী হয়ে ভগবানের সঙ্গে অভেদভাবে বিরাজ করতেন। এখানে প্রশ্ন জাগে – শরীর থাকতে কি কেউ পূর্ণজ্ঞানী হতে পারে? শাস্ত্রে এখানে মাতালের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মাতাল প্রচুর পরিমানে মদ খেয়েছে, বাইরের কোন হুশ তার নেই, কোথায় কোন খানা খন্দে পড়ে রইল, কাপড় চোপড়ের কোন ঠিক নেই, হয়তো উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাতে লজ্জা সরমের কোনো বালাই নেই। তেমনি কোনো সাধক যখন ধর্মের মাতাল হয়ে একেবারে বিভোর হয়ে যায়, তখন তারও বাইরের শরীরের কোনো হুশ থাকে না।

সব মানুষের জ্ঞান কেন হয় না? জ্ঞান হল সাধন সিদ্ধ। তাই জ্ঞানের পথ সকলের জন্য নয়। মল, বিক্ষেপ আর আবরণ – এই তিন দোষ জ্ঞান লাভের পরিপন্থী। এই তিন দোষ নিবারণের জন্য শাস্ত্রে তিনটি উপায়ের কথা বলা হয়েছে। যথা – কর্ম, উপাসনা আর জ্ঞান। এই তিন সাধনায় উপরোক্ত তিন দোষ স্খালন হয়ে যাবে। কর্মের দ্বার মল চলে যাবে অর্থাৎ সাধকের চিত্ত দর্পণে যে ময়লা পড়েছে, শুভ কর্মের দ্বারা ওই ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে, চিত্তশুদ্ধ হবে। উপাসনা করলে বিক্ষেপ চলে যাবে অর্থাৎ সুখ দুঃখের অস্তিত্ববোধ আর থাকবে না। জ্ঞান হলে আবরণ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আবরণ ভঙ্গ হলে দ্বৈত বুদ্ধি চলে যাবে। তখন সাধক এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ চৈতন্যসত্তায় মাতালের মতো ডুবে যায়।

আবরণের একটি দৃষ্টান্ত হল – কুয়ো থেকে খানিকটা জল নিয়ে তুমি গঙ্গার জলের সঙ্গে মিশিয়ে দাও। কুয়োর জল গঙ্গাজলের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাবে। আবরণ কাকে বলে? একটা বোতলে কুয়োর জল ভরলে। তারপরে বোতলের মুখে একটা দড়ি বেঁধে জল সমেত বোতলটাকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দাও। বোতলের মধ্যেকার কুয়োর জল গঙ্গার জলে ডুবল বটে, কিন্তু গঙ্গাজলের সঙ্গে মিশে গেল না। এবার তুমি দড়ি টেনে বোতলটাকে তুলে আনো, দেখা যাবে বোতলের মধ্যে সেই কুয়োর জলই রয়েছে। এই বোতল হল আবরণ। এই আবরণকে ভাঙলে তবেই কুয়োর জল আর গঙ্গার জল মিশে যাবে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এইভাবে সাধক যখন নিজের ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পারে, আবরণকে ভেঙে ফেলতে পারে, তখনই সে আত্মজ্ঞানরূপী গঙ্গায় নিজেকে বিসর্জন দিতে পারে, আর সেই গঙ্গার সঙ্গে মিশে গিয়ে সে পরমাত্মারূপী সমুদ্রে মিশে যায়। আবরণ না ভাঙা পর্যন্ত তা সম্ভব নয়।

চতুর্থ পর্ব

স্থান ঃ ধ্যান কুঠী, ১৩৪০ সাল (কার্ত্তিক মাস) সময় - সকাল

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বর্মন (দেওঘরের উকিল)

ও

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[মৈত্রী-করুণা-মুদিতা – উপেক্ষা ঃ ধর্ম – অর্থ – কাম – মোক্ষ]

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই সুরেন, তুমি তো উকিল, কথা বলাই তো তোমার কাজ, তুমি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু কথা বল।

সুরেন ঃ মহারাজ, আমি তো শ্রোতা, আপনি হলেন ভালো বক্তা। আপনার কাছে আমি কী কথা বলব। আপনি বলুন, আমি শুনব।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ ভাই, আমি কী বলব – শাস্ত্রকারগণ যা বলে গেছেন সেই শাস্ত্র বাক্যই আমি বলব। শাস্ত্র যে যে সাধনার কথা বলেছেন সেই সাধনার যে কোন একটি অবলম্বন করেই মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হয়।

মৈত্রী — করুণা – মুদিতা — উপেক্ষা শাস্ত্র এই চারটি শব্দ বলেছেন। এই চারটি শব্দ বা কথা সব সময় বিচার করতে হবে। **প্রথম** – মৈত্রী অর্থাৎ সুখী ব্যক্তি দেখলে তারা তোমার মিত্র না হলেও নিজ মিত্রের সুখে যেরূপ তোমার সুখ বোধ হয় সেরূপ সুখ অনুভব করাই মৈত্রী সাধন। **দ্বিতীয়** – করুণা অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর ওপর দয়া প্রদর্শন করবে, কোনো প্রাণীর সঙ্গে শত্রুতা কোরো না। **তৃতীয়** – মুদিতা অর্থাৎ অপরের ভালো উন্নতি দেখলে তাকে ঈষা কোরো না, তার সুখে নিজে সুখী হও। **চতুর্থ** – উপেক্ষা অর্থাৎ কেউ যদি তোমার প্রতি শত্রুতা বা অসদাচরণ করে তাহলে তুমিও তার প্রতি শত্রুতা করতে যেও না, তাকে উপেক্ষা করে যাও। দেখো ভাই সুরেন, এই চার রকম সাধন থেকে চার রকম ফল পাওয়া যায়। যথা

ধর্ম - অর্থ - কাম - মোক্ষ

একদিন এক ভারি রহস্যময় ব্যাপার ঘটল। আশ্রমে সেদিন কয়েকজন মায়েরা এসেছেন, আশ্রমের সব চারদিক ঘুরে দেখে তাদের খুব ভাল লেগেছে এবং শেষে আমার কাছে এসে বলছেন ঃ বাবা, আশ্রমটি এত সুন্দর, এত মনোরম, ভাবছি এখানে কিছুদিন বাস করে যাব। আমি জানিয়ে দিলাম - না মা, আশ্রমে মেয়েদের

থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। তখন তারা বললেন, "আপনার পরিবার যেখানে থাকেন, সেখানেই আমরা থাকব মা'র কাছে। আপনার স্ত্রী আছেন তো?' আমি বললাম, হ্যাঁ মা, আমার চারটি পরিবার। আমার বাবা আমার চারটি বিয়ে দিয়েছেন। এই রহস্য বা পরিহাস তারা বুঝতে না পেরে তারা জিজ্ঞেস করলেন – 'আপনার ছেলেপুলে আছে তো? আমি বললাম হ্যাঁ মা, আমার চারটি ছেলেও আছে, চারজন স্ত্রীর চারটি ছেলে। মায়েরা এ সব কথা সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমার একজন শিষ্যা বসে ছিল। এতক্ষণ এসব কথা শুনে সে হাসতে থাকায় তখন সেই মায়ের দল তাদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে গেলেন।

আমি তখন বললাম ঃ না মা! তোমাদের লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই। আমার সত্যি চারজন স্ত্রী আছে। তাদের নাম – মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, ও উপেক্ষা আর তারা চারটি সন্তানও প্রসব করেছে। তাদের নাম – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। তখন মায়েরা এসব রহস্য কথা বুঝতে পেরে বললেন 'আমাদের অপরাধ হয়েছে, আমাদের ধৃষ্টতা মার্জনা করুন। তখন আমি বললাম, অজানা অপরাধ, অপরাধ বলে গণ্য হয় না। দেখো ভাই সুরেন, এই চার বাক্যের সাধন কেউ যদি করতে পারে, তবে তার ধর্ম - অর্থ - কাম ও মোক্ষ – এই চতুবর্গ ফল লাভ হয়ে থাকে।

মৈত্রী সাধনায় তুমি ভালো লোকের সঙ্গ করলে তোমার জীবনের সব কিছু চরিতার্থ হবে, আর কিছু করার প্রয়োজন নেই। ভালো লোকের সঙ্গ করতে করতে তুমিও ভালো হয়ে যাবে। তাই ভালো লোকের সঙ্গে মিত্রতা কর। এখানে একটা প্রশ্ন থাকে – সব মানুষ যদি ভালো মানুষের সঙ্গ করে, তবে মন্দ লোকের উদ্ধার কীভাবে হবে? এক্ষেত্রে একটাই কথা – যদি কোন অধিক শক্তিসম্পন্ন ভালো মানুষ মন্দ ব্যক্তির সঙ্গে মেশামেশি করে, তবে তার কোন ক্ষতি হবে না। সে তার আপন শক্তিতেই মন্দ লোককে ভালোর দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু যদি মন্দ ব্যক্তির শক্তি অধিকতর প্রবল হয় তাহলে মন্দের টানে ভালো মানুষ মন্দের দিকে চলে যেতে থাকবে। তাই বিচারপূর্বক 'মৈত্রী'র সাধন করতে হবে।

'করুণা' সাধন থেকে তোমার সকল জীবের প্রতি প্রীতি বা প্রেম জন্মাবে, কারুর প্রতি শত্রুতা তোমার থাকবে না।

মুদিতা সাধনে তুমি অজাতশত্রু হয়ে যাবে। তুমি কারুকে হিংসা করো না, তাহলে তোমাকেও কেউ হিংসা করবে না। পুরাণে দেখা যায়, রাজা যুধিষ্ঠির অজাতশত্রু ছিলেন। তাঁর চোখ এমনই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর নজরে কোন মন্দ

জিনিস চোখে পড়ত না। পরীক্ষার জন্যে একদিন ভীষ্মদেব দুই বালক যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধনকে ডেকে পাঠালেন, যুধিষ্ঠিরকে তিনি বললেন – তুমি একজন বদমাস লোকের খোঁজ করে আমার কাছে নিয়ে এসো আর দুর্যোধনকে বললেন, তুমি একজন উত্তম লোকের খোঁজ করে আমার কাছে নিয়ে এসো। সারা দুনিয়া খোঁজ করে দু'জনে ফিরে এল। যুধিষ্ঠির বলল, হে পিতামহ, সারা দুনিয়া তন্ন তন্ন করে খুঁজে একজন খারাপ মানুষ পেলাম না, সব মানুষই বেশ ভালই। আর দুর্যোধন এসে বলল, ভাল লোক কোথায় ? সব লোকই বদমাস, ভাল লোক পেলাম না। তাহলে দেখো ভাই সুরেন – এ কী রকম কথা।

উপেক্ষা সাধনে তোমার হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি তোমার সঙ্গে শত্রুতা করছে – করতে দাও, তুমি তার সঙ্গে শত্রুতা কোরো না, তুমি তার ভালো করতে না পার, মন্দ কোরো না, উপেক্ষা কর। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা – এই চার সাধনের চার রকম ফল পাওয়া যায় – ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। দেখো ভাই সুরেন, আমি তো এতক্ষণ বক্ বক্ করে গেলাম। তুমি এ থেকে কী নিলে? সুরেন ঃ হ্যাঁ মহারাজ, কিছু কিছু কথা আমার ভাল লেগেছে, আমি সেগুলি গ্রহণ করেছি।

পঞ্চম পর্ব

স্থান ঃ রান্নাবাড়ির দালান ঃ ১৩৪০ সাল
সময় বিকেল - আশ্রমের বড় পণ্ডিতজী
ও
শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সৎসঙ্গ

[শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁর নামের মহিমা ঃ চার প্রকারের ভক্ত। সাধুকে কীভাবে চেনা যাবে ঃ পুরানো জীর্ণ শরীর সম্পর্কে নানকের দোঁহা ঃ শরীরং ব্যাধি মন্দিরম্ ঃ দেহ হল শ্রীমন্দির ঃ যে দান করে তারই পুণ্য হয়, সাধু আর অবধূতের পাপ পুণ্য বলে কিছু নেই ঃ ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই, তাহলে পুরুষকারের প্রয়োজন কেন ঃ টিপ্ টিপার গল্প ঃ অদৃষ্ট বা প্রারব্ধ বড়, না পুরুষকার বড় ঃ তিন তাপ – আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ঃ ঊর্দ্ধগতি লাভের প্রথম সোপান হল – শুভেচ্ছা আর সৎসঙ্গ – ভক্তি শিক্ষার প্রধান উৎস হল মা (ধ্রুবের উদাহরণ) ঃ সৎসঙ্গের মহিমা ঃ জ্ঞানীরা সংসারকে কীভাবে দেখে থাকেন ঃ পরমাত্মা জ্যোতিস্বরূপ ঃ প্রারব্ধ তিনভাবে বিভক্ত – আগামী, সঞ্চিত ও ক্রিয়মান ঃ রোগ-শোক, সুখ-দুঃখের সৃষ্টি হয়েছে কেন ঃ সুখ-দুঃখের অবস্থান কোথায় ঃ অবিদ্যা (প্রকৃতি) সুখ-দুঃখ সৃষ্টি করে ঃ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলেই পরমাত্মার অনুভূতি হবে।]

পণ্ডিতজী বাল্মীকি রামায়ণ পাঠ করছেন, বহু মেয়ে, পুরুষ নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করছেন, গুরুমহারাজও বসে শ্রবণ করছিলেন, হঠাৎ তিনি হেসে বললেন –

শ্রীশ্রীগুরু ঃ পণ্ডিতজী, আপনি রামায়ণ শোনাচ্ছেন, আপনি বলুন – রাম ক'জন আছেন।

পন্ডিত ঃ মহারাজ, রাম তো একজনই আছেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই, আমি তোমাকে চার রামের কথা শোনাচ্ছি।

'এক রাম দশরথকো বেটা
এক রাম ঘট ঘটমে বৈঠা
এক রাম জগৎ পধারা
এক রাম সবকো নেহারা।'

(অর্থাৎ এক রাম দশরথের পুত্র, এক রাম সকলের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজমান, এক রাম জগৎ সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বররূপে, আর এক রাম হলেন যিনি সকলের প্রতিই সমান দৃষ্টি রেখেছেন) এখন পণ্ডিতজী বলুন – এই চার রাম আছে তো!

পণ্ডিত ঃ হ্যাঁ, মহারাজ, তা তো আছেই।

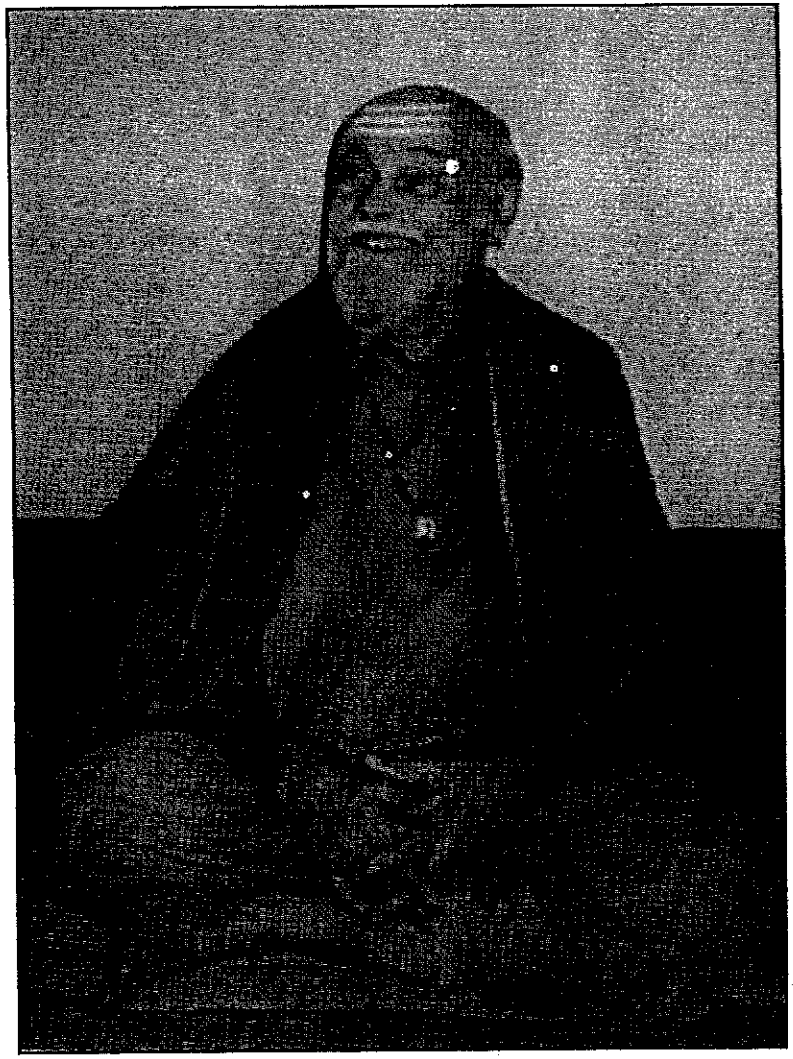

শ্রীশ্রী তারানন্দ ব্রহ্মচারী

গুরুভ্রাতা মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরু ঃ আরও রামের কথা আছে, যেমন আত্মা রাম, জগৎ আরাম, প্রাণারাম ...।

রাম বড় আরামের বস্তু। জগৎ সংসার সব রামেরই রূপ। দেখো ভাই, রাম নামের কেমন মহিমা। যে বাল্মীকি রামের নাম উলটোভাবে মরা, মরা জপ করে ভজনা করলেন, তাতেই তিনি উদ্ধার হয়ে গেলেন। বাল্মীকি রাম বলতে পারতেন না, তিনি মরা, মরা জপ করতে লাগলেন, তাতেই তাঁর কল্যাণ হল। দেখো ভাই, উল্টো হোক অথবা যে ভাবেই হোক রামের ভজনা করতে হবে। চার প্রকার ব্যক্তি ঈশ্বরের ভজনা করে থাকে। গীতাতে ভগবান বলেছেন —

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।। গী ঃ ৭/১৬

অর্থ – হে ভরতকুল গৌরব অর্জুন, আর্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও তত্ত্বজ্ঞানী – এই চার প্রকার পুণ্যকর্মা ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন। এদের মধ্যে ভক্তিযুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। তাঁর কাছে ঈশ্বরই প্রিয়, ঈশ্বরের কাছে জ্ঞানীই প্রিয়।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।। (গী ঃ ৭/১৭)

অর্থ ঃ এই চার প্রকার ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত আমাতে একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অতীব প্রিয়।

এই সময় শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরির শিষ্য শ্রীবিশ্বেশ্বরানন্দ এসে গুরু মহারাজকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা বিশ্বেশ্বরানন্দ, তুমি তো মহাপুরুষের শিষ্য, এখন তুমি ধর্ম সম্বন্ধীয় কিছু কথা বল। আচ্ছা, আমার কাছে তুমি কেন এসেছ তা বল।

বিশ্বেশ্বর ঃ মহারাজ, সাধু মহাত্মাকে দর্শন করা এক পুণ্য কাজ, তাই করতে এখানে এসেছি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ, এখন বল তো সাধুকে কী করে চিনবে?

বিশ্বেশ্বর ঃ মহারাজ, বাইরের ভাব দেখে সাধুকে চেনা যাবে না। সব লোক যেমন কাজ করে সাধুও তেমনি কাজ করে থাকে। কিন্তু যার কাছে গেলে অন্তরস্থিত বাসনা কামনার তরঙ্গ শান্ত হয়ে যায় এবং সৎবৃত্তির স্ফুরণ হয়, সেই ব্যক্তিই জ্ঞানী এবং সাধু।

সেখানে একজন বাঙালিবাবু বসে সৎসঙ্গ শুনছিলেন, তিনি বললেন,

বাবা, আমাদের ভক্তিশাস্ত্রে একটি পদ আছে –

যাঁহাকে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম।
তাঁহাকে জানিবে ভবে বৈষ্ণব প্রধান।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এ কথা তো ঠিকই আছে। কিন্তু দেখো ভাই বিশ্বেশ্বরানন্দ, এখানে একটা প্রশ্ন আছে – কোন সাধুর কাছে সৎসঙ্গ করতে দশজন লোক গেল, দেখা গেল তাদের মধ্যে পাঁচজনের শুভ ভাবের উদয় হল না – কেন?

বিশ্বেশ্বর ঃ মহারাজ, যার মধ্যে পূর্বজন্মের সুকৃতি বেশি আছে, সাধুর কাছে গেলে তার সৎবৃত্তির স্ফুরণ হঠাৎ সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়, যেমন বারুদে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালে আগুন সঙ্গে সঙ্গে দপ করে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ ভাই, সাধুর কাছে গেলেই সৎভাব দেখা দেবে তা হবে না। এ সম্পর্কে তোমাকে একটা দোঁহা শোনাচ্ছি।

'সন্ত হামারাই আত্মা
হাম সন্তন কি দেহ।
রোম রোম মে রম্ রহ
যেঁও বাদল মে মেঘ।'

অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে আমি সাধুর আত্মা, স্থূলভাবে আমি সাধুর দেহ, একটি রোমকূপ তুমি তুলে ফেলো, তোমার ব্যথা লাগবে। একটি রোমকূপে যেমন চৈতন্যসত্তা আছে, তেমনি দেহের প্রতিটি রোমকূপে চৈতন্যসত্তা বিরাজমান এবং অভিন্নভাবে থাকে, যেমন বর্ষাকালে মেঘ আর বৃষ্টি অভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন কোন সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি যদি জ্ঞানী সাধুর সঙ্গে মিলতে পারে অর্থাৎ সাধুর অন্তঃকরণের সঙ্গে মিলতে সমর্থ হয়, তাহলে ওই সাধুর সৎভাব তার অন্তরে আপনাআপনি প্রবিষ্ট হয়ে যায়। যার মধ্যে এরকম ভাব দেখা দেয়, তারপক্ষে সাধুর কাছে গিয়ে কী হবে? এইজন্যে সব ব্যক্তির পক্ষে সাধুর কাছে গেলেও সদ্‌ভাব জাগ্রত হয় না। তবে যার মধ্যে পূর্বজন্মের সুকৃতি আছে, সাধুর সঙ্গ পেয়ে তার মধ্যে সদ্‌ভাব সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হয়। যেমন বারুদে দিয়াশলাই জ্বাললে ঝট্ করে আগুনের প্রকাশও হয়। এই কারণে সকলেরই সাধুর কাছে গেলেই সদ্‌ভাব জাগ্রত হয় না।

দেওঘরবাসী একজন ভদ্রলোক ইতিমধ্যে এসে গুরুমহারাজকে প্রণাম করে বললেন –

ভদ্রলোক ঃ বাবা, আপনার শরীর কেমন আছে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ শরীর ভালই আছে, ভাই।

ভদ্রলোক ঃ না বাবা, আমি শুনেছি, আপনার শরীর বিশেষভাবে অসুস্থ আছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ, ভাই, এ সম্পর্কে নানকের একটি দোঁহা আছে –

'নানক চোলা হুয়া পুরানা
কাঁহা তক্ সিবে দর্জি।
দিলকা মহেরম কোই নেহি মিলিয়া
যো মিলিয়া মৎলবকা গর্জি।'

দোঁহার তাৎপর্য ঃ নানক বলছেন – জামা পুরানো হয়ে গেলে প্রায়ই ফেটে যায়, দর্জি ওই জামা আর কতদিন ধরে সেলাই করে রাখবে। ঠিক সে রকম দেহ যত পুরানো হতে থাকে অর্থাৎ জরা আসে, ততই দেহে নানারকম ব্যাধি দেখা দেয়, কতদিন ধরে ওই দেহকে ওষুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা যাবে?

আমার হৃদয়ের অর্থাৎ আমার ভিতরের খবরাখবর অন্য কারুর পক্ষে জানা সম্ভব নয়, কিন্তু আমার মনের কথা ঈশ্বরের কাছে লুকিয়ে রাখা যায় না, তিনি অন্তর্যামী, তিনি আমার ভিতরের গোপন কথা সবই জানেন।

'শরীরং ব্যাধি মন্দিরম্'।

শরীর থাকলেই তাতে ব্যাধি দেখা দেবে। শরীরের মধ্যে আছে কি! আছে মল, মূত্র, রক্ত, মাংস ; বিচার করে যদি দেখ, তাহলে শরীরের উপর ঘৃণা হবে। অথচ দেখ, এই শরীরের উপর কত আসক্তি রেখে চলেছি। নিজের শরীরের উপর আসক্তি সব লোকই রাখে। স্ত্রী, পুত্রের শরীরের উপর কত আসক্তি রেখে থাকি। স্ত্রী, পুত্রের উপর যে, আসক্তি হয়ে থাকে তা নিজ স্বার্থের জন্যে। এ সম্পর্কে একটি দোঁহা আছে।

'সুর নর মুনি জনকা এহি রীতি।
স্বার্থ কাম করে সব প্রীতি।'

দোঁহার তাৎপর্য ঃ সুর অর্থাৎ দেবতা, মানুষ, মুনিজন অর্থাৎ তপস্বীগণ – এরা যে যার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কাজ করে প্রীতি লাভ করে। যেখানে স্বার্থ নেই সেখানে প্রীতিও নেই। যে যার স্বার্থ নিয়ে কাজ করে চলেছে। এই স্বার্থকে উল্‌টে দাও। অমনি তা পরার্থ হয়ে যাবে। কত লোক আমাকে বলে, বাবাজীর সব সময় মাথায় ইঁট-কাঠ-চুন-সুরকি ঘুরছে, পাকা বাড়ি বানাবার বাবাজীর খুব সখ। এসব কথা শুনে

আমার হাসি পায়। এখানে গৃহস্থেরা যে টাকা পয়সা প্রণামী হিসেবে দিয়ে যায়, তা দিয়ে আমি কি করবো? গৃহস্থ ব্যক্তিরা যে টাকা দিয়ে যায় তাকে আমি সৎকাজে লাগিয়ে দিই যাতে তাদের কল্যাণ হয়।

'যিসকা চুন উসকা পুন
সাধু অবধূতকা নেহি পাপ আউর পুন।'

আশ্রমে যারা টাকা পয়সা দেয়, পুণ্য হয় তাদেরই, আমি তো দিন মজুরী করি আর একমুঠো ভাত খেয়ে নিই। আমি শুধু দেখি, এই যে হাসপাতাল, পাঠশালা, সাধুদের থাকবার জন্য যে সব ঘরবাড়ি রয়েছে, এতে আমার কী স্বার্থ আছে? আমার কোন স্বার্থই নেই। এতে দশজনের কল্যাণ হচ্ছে, দশজন এখানে এসে আরাম পাচ্ছে। প্রথমে যখন বাড়ি তৈরী হতে শুরু হল তখন কত গরীব লোক খাটতে লাগল, মজুরীর টাকায় তাদের খাওয়ার কষ্ট দূর হল। এখন তো আমার বৃদ্ধ অবস্থা, দুদিন বাদেই আমাকে চলে যেতে হবে, কিন্তু আশ্রমের সব কিছুই তো এখানে থাকবে। এইসব বাড়িঘর ধর্মশালা থাকবে, এতে কত মানুষ বাস করবে, এতে আমার কী স্বার্থ? 'আমার আমার' বলে আসক্তি পূর্ণ যে কাজ তাতে বন্ধনই হয়। বিচার বুদ্ধি দিয়ে অপরের কল্যাণের জন্য যে কাজ করা হয় তাকে স্বার্থ বলে না। সেই কাজই পরার্থ হয়ে যায়। মল-মূত্র ভরা এই শরীরটাকে শুভ বুদ্ধির দৃষ্টিতে দেখো। দেখতে পাবে শরীর ঘৃণ্য নয়, এই শরীরটাকে আশ্রয় করে এই ঘটে কে বিরাজ করছেন? তিনি হলেন আত্মারাম। যেখানে আত্মা বিরাজ করেন তা কি কখনো ঘৃণার বস্তু হতে পারে? এই দেহ হল শ্রীমন্দির। এই দেহের মধ্যেই বিরাজ করছেন চৈতন্যরূপী আত্মা। দেহের বিষয় ভোগ করবার জন্য মন যখন চঞ্চল হয়ে উঠবে, তখন শরীরের উপর ঘৃণার ভাব নিয়ে আসতে হবে। তখন বিচার করে দেখতে হয় – শরীরের মধ্যে রয়েছে কী? মল, মূত্র, রক্ত, মাংস। এ শরীরের পরিণাম কী? চিতাভস্ম। এইভাবে বিচারের দ্বারা ভোগলালসা দূর হয়ে যায়। আবার যখন ভগবানের আরাধনায় মন যাবে তখন ভাবতে হবে যে, আমার এই দেহ হল শ্রীমন্দির, এখানে চৈতন্যরূপী ভগবান বিরাজ করছেন।

ভদ্রলোক ঃ মহারাজ, আমার একটি প্রশ্ন আছে – অদৃষ্টে যা আছে তা তো হবেই, তা কখনই খণ্ডন করা যায় না; তাহলে পুরুষার্থ প্রয়োগের প্রয়োজন কী – তা আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ একদম অদৃষ্টের উপর মানুষ বসে থাকতে পারে না। রোগ হলে

মানুষ ডাক্তার দেখায়। পায়ে কাঁটা ফুটলে মানুষ তা বের করে নেয়। কেউ তো বলে না – ভাগ্যে ছিল তাই রোগ হয়েছে, ভাগ্যে ছিল তাই পায়ে কাঁটা ফুটেছে – এর প্রতিবিধানের জন্য কোন চেষ্টা কোরো না। চেষ্টা করতেই হবে, ভাগ্যে কী আছে তা তো মানুষ জানে না। আগে চেষ্টা করতে হবে। সফল না হলে বুঝতে হবে, আমার ভাগ্যে নেই। পুরুষকারবাদী বলে – 'প্রারব্ধম্ কাপুরুষাঃ বদন্তি।'

অর্থাৎ প্রারব্ধের কথা কাপুরুষরাই বলে থাকে।

অদৃষ্টবাদী ব্যক্তি অদৃষ্টের উপর ভর করে বসে থাকবে,

অদৃষ্টবাদীরা তাই বলে থাকে –

ভাগ্যম্ ফলতি সর্বত্র।

ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।

অর্থাৎ ভাগ্য যা ফল দেবে তা হবেই, বিদ্যা, পৌরুষ – কিছুই কাজ দেবে না। দেখো ভাই, প্রথমে চেষ্টা করতে হবে – সফল না হলে অদৃষ্টকে মেনে নিতে হবে, তবেই শান্তি পাওয়া যাবে। অদৃষ্ট হল এক বিশ্রান্তির স্থান।

ভদ্রলোক ঃ বাবা, অদৃষ্টে যা আছে তা হবে – এই ভাবনায় চেষ্টা একেবারে দমে যায়।

শ্রীশ্রীগুরু – না ভাই, চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। যদি মানুষের চেষ্টা প্রবল হয়, তা হলে দৈবও সহায় হয়। এ সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি।

টিপ্‌টিপার (টিট্টিভ) গল্প

সমুদ্রের তীরে এক টিপ্‌টিপা পক্ষী ও পক্ষিনী থাকত। এক সময় পক্ষিনীর ডিম পাড়বার সময় হল। তখন সে পক্ষীকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কোথায় ডিম পাড়ব?' তখন টিপ্‌টিপা বলল, 'সমুদ্রের ধারেই তুমি ডিম পাড়ো।' পক্ষীর বউ বলল, 'সে কি! সমুদ্রের জলে তো ডিম নষ্ট হয়ে যাবে সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে যাবে,' পক্ষী বলল, কী, ডিম সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে যাবে? আমি সমুদ্রকে শুষে ফেলে ডিম বের করে আনব।' বউ বলল, 'তুমি তো ছোট পাখি মাত্র, সমুদ্রের সঙ্গে তুমি পারবে কেন?' বউয়ের কথা শুনে টিপটিপা পক্ষী বলল, 'আমার বউ হয়ে একথা বলতে লজ্জা হল না তোমার? কী বলব, তুমি স্ত্রীজাতি, তোমাকে বধ করতে পারিনে, নইলে আমাকে কাপুরুষ বলবার পরিণতি যে কী তা তোমাকে দেখিয়ে দিতাম। তুমি আমার ক্ষমতা জান না। সমুদ্র যখন আমার ডিম ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তখন আমি সমুদ্র শোষণ করে ডিম বার করে নিয়ে আসবো।' বউ কী আর করে, সে অগত্যা সমুদ্রের পাড়েই ডিম পাড়ল।'

পাখি এবার বেরুবে খাবারের খোঁজে। যাবার সময় সে বউকে বলল, 'চলো, দুজনে একসঙ্গে খাবারের সন্ধানে যাই।' বউ বলল, 'না, না, তুমি একলাই যাও। একজন এখানে না থাকলে কেউ ডিম নষ্ট করে দিয়ে যেতে পারে।' বউয়ের কথা শুনে টিপটিপা পাখি আবার রেগে গেল, রাগে তার গায়ের পালক সব ফুলে উঠল, সে চিৎকার করে গর্জে উঠল, 'কার এমন সাহস আছে আমাদের ডিম নষ্ট করবে? প্রাণের ভয় নেই তার? যাক্‌গে ওসব কথা থাক্, চলো আমার সঙ্গে খাবারের সন্ধানে।' এই বলে বউকে নিয়ে খাবারের সন্ধানে পাখি চলে গেল।

ছোট্ট একটা পাখির এত আস্ফালন দেখে সমুদ্রের বড় কৌতুহল হল। সে ভাবল, ডিমগুলো আমি লুকিয়ে রেখে দিই। এবার দেখতে হবে টিপটিপা পাখি এসে কী করে। এই ভেবে সমুদ্র তার জলের তলায় ডিমগুলো লুকিয়ে রাখল। পাখি আর তার বউ ফিরে এসে দেখে সমুদ্রের ধারে ডিম নেই। পাখির বউ তো তখন কান্না জুড়ে দিল আর পাখি রাগে চোখ লাল করে সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে ডিম ছিল, কোথায় গেল তা বল।' সমুদ্র বলল, 'তা তো জানিনে ভাই। পাখি বলল, 'বটে, নিশ্চয় তুমি জান ডিম কোথায় আছে। তুমি নিশ্চয় জলের তলায় ডিম লুকিয়ে রেখে দিয়েছ। ভালো চাও তো ডিমগুলো এখনই বের করে দাও, না হলে সমস্ত জল আমি শুষে ফেলে ডিম বের করে আনব। আমার ক্ষমতা তখন তুমি টের পাবে।' এই বলে পাখি আর তার বউ বিন্দু বিন্দু করে সমুদ্রের জল ঠোঁট দিয়ে তুলে ফেলতে লাগল। এক একবার তারা ঠোঁটে করে জল নিয়ে বালিতে ফেলছে, পরের বার ঠোঁটে বালি নিয়ে সমুদ্রে ফেলছে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দিনরাত তারা এইভাবে সমুদ্র শোষণ করতে লাগল।

তখন চারদিক থেকে পাখিরা এসে তাদের জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা এ কী কাজ করছ?' তারা বলল, 'আমরা সমুদ্র শোষণ করছি, সমুদ্র আমাদের ডিম চুরি করেছে, তাই সমুদ্র শোষণ করে সেই ডিম উদ্ধার করব।' পাখিরা বলল, 'ভাই, এভাবে কতটুকু জল তোমরা শুষে নিতে পারবে? সাত জন্ম চেষ্টা করলেও এক ঘড়ার বেশি জল তুলতে পারবে না। টিপটিপা পাখি তখন চোখ পাকিয়ে বলল, 'দূর হও এখান থেকে, বাজে কথা শুনবার এখন সময় নেই। যদি আমাদের সাহায্য করতে চাও, তাহলে কথা ছেড়ে আমাদের সঙ্গে কাজে লেগে যাও।' এই কথা শুনে সব পাখি এক জোট হয়ে গেল। তারা ভাবল, সত্যিই তো, এরা হল আমাদের স্বজাতি, এদের সাহায্য না করলে কি চলে?

এরপরেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কত রঙের পাখি সেখানে এসে জুটতে লাগল। সকলে মিলে এক এক ঠোঁট জল নিয়ে বালিতে ফেলছে আর এক এক ঠোঁট বালি নিয়ে জলে ফেলছে। এমন সময় সমুদ্রের ধার দিয়ে নারদ ঋষি যাচ্ছিলেন বৈকুণ্ঠে। এত পাখি একজোট হয়ে কী করছে জানবার জন্য তাঁর কৌতুহল হল। তিনি তখন পাখিদের ডেকে জিজ্ঞাসা করে সব বৃত্তান্ত জেনে নিলেন। তাদের কথা শুনে নারদের বড়ো দয়া হল। তিনি ভাবলেন, এতটুকু সব পাখি, কিন্তু কী তাদের অধ্যাবসায়। এদের এই চেষ্টা যদি সফল না হয় তাহলে পৃথিবীতে অধ্যাবসায়ের কোন মূল্যই থাকবে না। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে নারদ বৈকুণ্ঠে গেলেন এবং গরুড়ের সঙ্গে দেখা করে সব কথা তাকে জানিয়ে বললেন, 'খগরাজ গরুড়, পাখিরা সবাই মিলে এত চেষ্টা করছে, তুমি একবার তাদের কাছ যাও। হলই বা তারা ক্ষুদ্র তবু তোমার স্বজাতি তো বটে। তুমি হলে পাখিদের রাজা, তোমার অসাধ্য কোন কাজ নেই। স্বজাতির এই দুঃখ থেকে তুমি তাদের উদ্ধার কর। একমাত্র তুমি ছাড়া এদের কোন গতি নেই। ওরা নিজেরা কত পরিশ্রম না করছে তুমি শুধু একবার ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াও।'

নারদ ঋষির অনুরোধ গরুড় ঠেলতে পারল না। সে নারদকে বলল, 'ঋষিবর, এখুনি আমি সমুদ্রের কাছে যাচ্ছি, সমুদ্রের সমস্ত জল আমি শোষণ করে নেব। দেখব কেমন করে সে টিপটিপা পাখির ডিম লুকিয়ে রাখে।' ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করে গরুড় তখনই সমুদ্রের ধারে এসে ভীষণ গর্জন করতে লাগল। গরুড়ের সেই রুদ্রমূর্তি দেখে সমুদ্র ভয় পেয়ে গেল। সমুদ্র ভাবল, গরুড় তো বিষ্ণুর বাহন, এর কোন কাজই অসাধ্য নয়। এখুনি এ আমার জল শুষে নেবে, জলজন্তু সব মরে যাবে, এর হাত থেকে কোন কিছুই রেহাই পাবে না। সমুদ্র তখন নানাভাবে গরুড়ের স্তবস্তুতি করতে লাগল। তারপর টিপটিপার ডিমগুলি এনে তার পায়ের কাছে রেখে দিল। গরুড়ের রাগ আর রইল না।

দেখো ভাই, যদি আন্তরিক চেষ্টা থাকে তাহলে দৈব সহায় হন। উল্লিখিত গল্প থেকে এই সিদ্ধান্ত হল। এখন বল, তোমার এ ব্যাপারে আর কী প্রশ্ন আছে?

ভদ্রলোক ঃ বাবা, দৈব আর পুরুষকার – এই দু'য়ের মধ্যে কে বড়?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, এই দুয়ের কে যে বড়, কে ছোট তা বলা খুব মুস্কিল। এরা হল পিতা পুত্রের মতো। পিতা যখন যোয়ান, পুত্র তখন শিশু, তখন পিতার চেয়ে পুত্রের জোর কম। আবার পুত্র যখন যোয়ান হয়, পিতা তখন বৃদ্ধ, তখন পুত্রের

চেয়ে পিতার জোর কম হয়। এখানে ছোট বড় কীভাবে ঠিক করবে? পিতা যেমন পুত্রের জন্মদাতা, তেমনি পুরুষকার থেকেই দৈব অর্থাৎ প্রারব্ধের উৎপত্তি। অদৃষ্ট বা প্রারব্ধ আসে কোথা থেকে? তোমার শুভাশুভ কর্ম থেকেই পুণ্য আর পাপ সঞ্চিত হয়, সেই পাপ পুণ্য থেকেই অদৃষ্ট বা ভাগ্য রচনা হয়। পাপ কার্যের ফল হয় দুঃখ আর পুণ্য কার্যের ফল সুখ। সুখ দুঃখ নিয়েই ভাগ্য নির্ধারণ হয়। আগের জন্মের পুরুষকারই পরের জন্মে প্রারব্ধ হয়ে দেখা দেবে, পিতার থেকে পুত্রের জন্ম হল। পুত্রও আবার একদিন পিতা হয় অর্থাৎ এই প্রারব্ধই আবার পুরুষকার হয়ে দেখা দেয়। দেখো ভাই, খাওয়া-দাওয়া, অর্থ উপার্জনের চেষ্টাকে পুরুষকারের প্রকৃত সংজ্ঞা নয়। পুরুষকারের সংজ্ঞা হল 'ত্রিভিস্তাপৈঃ নিবৃত্তিঃ পুরুষার্থঃ'

তাৎপর্য – তিন তাপ নিবৃত্ত হওয়ার যে চেষ্টা তারই নাম পুরুষার্থ বা পুরুষকার।

প্রশ্ন হল তিন তাপ কী? তিন তাপ হল – আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। আধিদৈবিক তাপ হল বিদ্যুৎপাত, ভূ-কম্পন, গ্রহপীড়া, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখকষ্ট। আধিভৌতিক তাপ কাকে বলে? যেমন বিছের দংশন, সাপের দংশন, চোর-ডাকাতের ভয়, রাজার ভয় অর্থাৎ অন্যের কাছ থেকে বিপদের যে আশঙ্কা তাকে বলে আধিভৌতিক তাপ। আধ্যাত্মিক তাপ কী? শরীরের রোগ আর মনের শোককে বলে আধ্যাত্মিক তাপ। এমন কোন মানুষ নেই যে বলতে পারে, তার কখনো শোক হয়নি, অথবা কোন রোগ হয়নি। মানুষমাত্রকেই শারীরিক রোগ আর মানসিক শোকে ভুগতে হয়। এই তিন প্রকার তাপকে নিবারণের যে চেষ্টা, তাকেই বলে পুরুষার্থ বা পুরুষকার। সমস্ত জীব এই তিন তাপে তাপিত। কেউ বলতে পারে না, যে এই তিন তাপ থেকে সে মুক্ত। তবে এই তিন তাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা অর্থাৎ পুরুষকার প্রয়োগ একমাত্র মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব। অন্য কোন জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। মায়ার তিনগুণ – সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ। দেবতারা সত্ত্বগুণ প্রধান, মনুষ্যগণ রজগুণ প্রধান আর পশুরা বা অসুররা তম গুণপ্রধান। মানুষ রয়েছে মাঝখানে। মানুষ চেষ্টা করলে দেবতা হতে পারে অর্থাৎ উর্দ্ধগতি লাভ করতে পারে অথবা নিম্নগতি হয়ে পশু বা অসুর যোনিতে চলে যেতে পারে।

ভদ্রলোক ঃ বাবা, উর্দ্ধগতি লাভ করার প্রথম সিঁড়ি বা সোপান কী?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ প্রথম সিঁড়ি হল শুভ ইচ্ছা। এই শুভ ইচ্ছা কোথা থেকে জাগবে?

সৎসঙ্গ থেকে। একটা দোঁহা শোনো –

'য্যায়সা কে ত্যায়সা মিলে
নীচকে মিলে নীচ,
পানিমে পানি মিলে
কীচাড়সে মিলে কীচ।'

অর্থাৎ, যে বস্তু যার সঙ্গে মিলতে চায় তাকে তার মত হতে হবে তা নাহলে মিলতে পারবে না। নীচের সঙ্গে নীচই মিলবে, জলের সঙ্গে মিলবে জল আর পাঁকের সঙ্গে মিলবে পাঁক। অর্থাৎ তুমি যদি ভালোর সঙ্গ করতে চাও, তাহলে তোমাকে ভালো হতে হবে, নইলে তুমি ভালোর সঙ্গে মিশতে পারবে না।

মানুষের মধ্যে তিন শ্রেণীর মানুষ দেখা যায় – দেবশ্রেণী, মনুষ্যশ্রেণী ও পশু বা অসুর শ্রেণী। দেবশ্রেণীর মানুষেরা পরস্পরের সঙ্গে মিশতে পারে, মনুষ্যশ্রেণীর মানুষ তাদের মতো মানুষের সঙ্গে মেশে আর পশু বা অসুর শ্রেণীর মানুষের পক্ষে তাদের সগোত্রের সঙ্গে মেশা ছাড়া আর উপায় নেই। দেবশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে পশু বা অসুর শ্রেণীর মানুষ যদি মিশতে যায়, তা তারা কখনো পারবে না। কিন্তু মানুষ রয়েছে মাঝখানে, তাই সে ইচ্ছে করলে দেবশ্রেণীর সঙ্গে মিশতে পারে, আর পশু বা অসুর শ্রেণীর সঙ্গেও মিশতে পারে। সেইজন্যই মানুষের উচিত আপন আপন স্বভাবের চেয়ে উচ্চকোটির মানুষের সঙ্গ করা। পশুশ্রেণীর মানুষকে মিশতে হবে মনুষ্যশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে, মনুষ্যশ্রেণীর মানুষকে মিশতে হবে দেবভাবাপন্ন মহাজনদের সঙ্গে। এইভাবে সঙ্গের গুণে মানুষ ধাপে ধাপে উর্দ্ধগতি লাভ করতে পারে। তুমি ছাদে উঠতে চাও, এক লাফে তো উঠতে পারবে না, তোমাকে সিঁড়ি ভেঙে ধাপে ধাপে উঠতে হবে।

কত মায়েরা আমার কাছে এসে বলে, বাবা, আপনার কাছে আমি দীক্ষা নেব। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি মা, তুমি তোমার স্বামীকে প্রণাম করো তো? তারা বলে – না-বাবা, প্রণাম করি না। আমি বলি – মা, তুমি পতিভক্তি শিক্ষা করোনি আর তুমি এসেছ জগৎপতিকে ভক্তি করবার শিক্ষা করতে! কত ছেলেছোকরা এসে বলে – বাবা, আপনার কাছে দীক্ষা নেব। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, তোমরা মাতাপিতাকে রোজ প্রণাম করো তো? তারা বলে – না বাবা, প্রণাম করি না। আমি তখন হাসি আর ভাবি – পিতামাতা হলেন জীবন্ত দেবদেবী তোমরা তাদের ভক্তি করো না, আর কোথায় রয়েছে জগৎপিতা, তোমরা এসেছ তাঁকে ভক্তি করতে?

ভক্তিশিক্ষার প্রথম সিঁড়ি হল পিতামাতা। পিতামাতার প্রতি ভক্তি হলে তবে গুরুভক্তি হবে, গুরুভক্তি হলে তবেই হবে ঈশ্বরভক্তি। মায়েদের জন্যও আমার এই উপদেশ। প্রথমে পিতামাতাকে ভক্তি করবে। বিয়ের পর স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ীকে ভক্তি করবে, তবেই গুরুভক্তির অধিকারী হবে, পরে ঈশ্বর ভক্তি লাভ হবে। মায়েদের ভক্তি শিক্ষার প্রথম সিঁড়ি হল স্বামী। ছেলেমেয়েদের ভক্তিশিক্ষার প্রথম সিঁড়ি হল পিতামাতা। ছেলেমেয়ে যখন খুব ছোট থাকে তখন তারা মায়ের কাছ থেকেই শিক্ষা লাভ করে। তখন তারা সব সময় মায়ের কাছে থাকে। মায়ের সঙ্গ লাভ করে। এই কারণে তারা মায়ের স্বভাব পায়। দেখো, শাস্ত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায় – পরম ভক্তিমতী জননী কয়াধুর প্রহ্লাদের মতো ভক্ত সন্তান হয়ে ছিল। পরম ভক্তিমতী বনবাসিনী জননী সুনীতির ধ্রুবের মতো পুত্র হয়েছিল। ধ্রুব মাতা সুনীতিকে জিজ্ঞাসা করেছিল – হে মাতা, ঈশ্বরকে কী কথা বলে ডাকবো? মাতা পুত্র ধ্রুবকে শিক্ষা দিলেন, 'কোথায় আমার পদ্মপলাশ লোচন হরি' – এই বলে ঈশ্বরকে ডাকবে। ধ্রুব মাতার এই শিক্ষা আয়ত্ত করে নিল। প্রহ্লাদ শৈশবে মাতা কুয়াধুকে জিজ্ঞাসা করেছিল – হে মাতা, ঈশ্বর কোথায় থাকেন? মাতা বলল – হে পুত্র, ঈশ্বর সর্বব্যাপী বিভু, সব জায়গায় সকল বস্তুর মধ্যে ঈশ্বর আছেন। মায়ের এই কথা প্রহ্লাদের মধ্যে একেবারে দৃঢ়ভূত হয়ে গেল। প্রহ্লাদের দৃঢ়ভূত সংকল্প সিদ্ধ করবার জন্য ভগবানকে স্তম্ভের মধ্যে আবির্ভূত হতে হয়েছিল। মাতার স্বভাব খুব তাড়াতাড়ি পুত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। একদিন পরমজ্ঞানী মা মন্দালসা (মদালসা) শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে দোল দিচ্ছেন আর বলছেন –

'শুদ্ধোঽসি বুদ্ধোঽসি, নিরঞ্জনোঽসি
ত্বং মায়া মোহৈঃ পরিবর্জতোঽসি
সংসারস্বপ্নং ত্যজ মোহনিদ্রাং
মন্দালসাবাক্যমুবাচ পুত্রম্।'

অর্থাৎ মন্দালসা (মদালসা) একথা পুত্রকে বললেন, তুমি শুদ্ধ, তুমি বুদ্ধ, তুমি নিরঞ্জন। তুমি হোচ্ছ মায়া মোহ পরিবর্জিত, সংসার স্বপ্নের মতো, তুমি এই সংসারের মোহ নিদ্রা ত্যাগ কর।

দেখো ভাই, এরকম জ্ঞানের কথা শৈশব কাল থেকেই যদি শিশুর কানে প্রবেশ করে, তবে ওই শিশু অবশ্যই পরম জ্ঞানী হয়ে উঠবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। হ্যাঁ এখন বল – তোমার কী প্রশ্ন ছিল?

ভদ্রলোক ঃ আমার প্রশ্ন হল – উন্নতির প্রথম সোপান কী?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এর উত্তর তো তুমি পেয়েই গেছ। উন্নতির সোপান হল – শুভ ইচ্ছা। শুভ ইচ্ছা জাগবে সৎসঙ্গ থেকে। মানুষের যা কিছু উন্নতি অবনতি, সবই সঙ্গের প্রভাবে ঘটে থাকে। সঙ্গের প্রভাব যে কতখানি তারই একটি দৃষ্টান্ত তোমাকে বলছি। দেওঘরে এক সার্কাসওয়ালা এসেছিল। সে প্রকাণ্ড তিনটে বাঘ আর একটা সিংহ নিয়ে খেলা দেখাত। সার্কাসওয়ালার নাম গজানন, আমাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করত। একদিন সে আমার কাছে এসে বলল, 'বাবা, আপনাকে একদিন আমার সার্কাস দেখতে হবে।' আমার প্রতি তার শ্রদ্ধা আর তার আগ্রহ দেখে আমি রাজি হলাম। সে একদিন মোটরে করে তার খেলা দেখাতে নিয়ে গেল। তিনটে বাঘ আর একটা সিংহ নিয়ে কত রকম আশ্চর্য খেলাই না সে দেখাল। একটা বাঘকে সে তার মাথায় বসাল, দুটো বাঘকে চেপে ধরল বগলে, আর সিংহটাকে বসাল তার কোলের উপর। বাঘ সিংহের মতো জানোয়ার নিয়ে মানুষ খেলা করছে। একবার ভেবে দেখো তো কী আশ্চর্য ব্যাপার। শেষকালে একটা টেবিলের উপর আলাদা আলাদা করে বাঘ, সিংহ, ঘোড়া আর ছাগলের খাবার রেখে দিল। যে যার খাবার নির্বিবাদে খেয়ে গেল, কারুর প্রতি কারুর হিংসা নেই। আমি গজাননকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'গজানন, তুমি যে এইসব জানোয়ার নিয়ে খেলা করো, অথচ এরা কেউ কারুর হিংসা করে না, এর কারণ কী? আমি তো শুনেছি – এদের আফিং খাইয়ে নির্জীব করে রাখা হয়, মারধোর করা হয়।' গজানন বলল, 'ওসব মিথ্যা কথা। ওরা যে হিংসা করে না তার কারণ আর কিছুই নয়, একমাত্র কারণ হল ওদের আমি খুব ছোটবেলা থেকেই পুষেছি। তখন থেকে আমি ওদের ভালবাসি আর এদের নিয়ে খেলা করি। তাইতেই এরা আমার এত অনুগত, নইলে বড় হবার পর পোষ মানাতে গেলে তা সম্ভব হয় না।'

এখন দেখো ভাই, হিংস্র জানোয়ারও মানুষের সঙ্গ পেলে কেমন তাদের হিংসাবৃত্তিকে ত্যাগ করতে পারে। বাঘ সিংহের খাদ্য হল মানুষ, কিন্তু মানুষকে খাওয়া দূরে থাক, তারা মানুষের সঙ্গে খেলা করছে। এর থেকেই বুঝে নাও সঙ্গের প্রভার কেমন। যে যেমন সঙ্গ করবে তার স্বভাবও তেমনি হবে। তাই আমার উপদেশ, তোমরা সর্বদা ভালোর সঙ্গ কর, সতের সঙ্গ কর, সাধুসঙ্গ করো।

ভদ্রলোক ঃ বাবা, আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনি তা সমাধান করে দিলে আমার শান্তি হবে। প্রশ্নটি হল – মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কী?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ মানুষের জীবন ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য হল জ্ঞান অর্জন করা। এখানে প্রশ্ন হল – কোন্ জ্ঞান অর্জন করতে হবে? এর উত্তর হল – সত্যাসত্য নির্ণয়। এ সম্পর্কে একটি ভাল শ্লোক আছে –

সংসারঃ স্বপ্নতুল্যো হি রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ
স্বকালে সত্যবদ্ ভাতি প্রবোধেঽসত্যবদ্ ভবেৎ।।

এই সংসার স্বপ্নতুল্য। মানুষ যেমন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে সেই প্রকার। বাস্তব বস্তু বলে কিছু নেই। মিথ্যাকেই সত্য বলে মনে হচ্ছে। এই সংসার অনুরাগ ও দ্বেষে (বীতরাগ) ভরা। অনুকূল কাজে, সবারই অনুরাগ হয় আর প্রতিকূল কাছে সবারই জাগে বিদ্বেষ। ঘুমন্ত অবস্থায় (স্বকালে) রাজা স্বপ্নে দেখে যে, সে কাঙাল হয়ে গিয়েছে আর কাঙাল দেখে সে রাজা হয়েছে। স্বপ্ন যেমন মিথ্যা এই সংসারও তেমনি মিথ্যা।

কিন্তু 'প্রবোধে অসত্যবদ্ ভাতি' অর্থাৎ সকালবেলা (প্রবোধে) নিদ্রাভঙ্গ হলে, তখন বোধ জন্মায় যে আমি ঘুমের ঘোরে এক মিথ্যা স্বপ্ন দেখেছিলাম। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন ছুটে গেল, স্বপ্নের সুখ-দুঃখও সব চলে গেল, আমি বাস্তবে ফিরে এলাম। কিন্তু এই স্বপ্ন-সংসার তো ভাঙে না। কাল রাতে আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেই স্বপ্ন এখন আমি দেখছি না বটে, কিন্তু কাল আমি যে সব বাড়ি ঘর মানুষ দেখেছি, আজকেও সেই সমস্তই তো ঠিক তেমনি দেখতে পাচ্ছি। তাহলে সংসারকে স্বপ্ন বলব কেমন করে? সেইজন্যই সংসারকে বলা হয় দীর্ঘ স্বপ্ন।

'প্রবোধেঽসত্যবদ্ ভবেৎ' একমাত্র প্রবোধে অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করলে সংসারের সত্যাসত্য নির্ণয় হয়ে যায়। যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হচ্ছে, ততক্ষণ সংসারকে সত্য বলেই মনে হয়। জ্ঞানলাভ হলে দেখবে যাকে তুমি সত্য ভেবেছিলে তা মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। তখন তুমি বুঝতে পারবে যে সংসার সত্যই স্বপ্নতুল্য, দীর্ঘ এক স্বপ্ন মাত্র। জ্ঞান হলে এ স্বপ্ন টুটে যায়।

জ্ঞানীরা সংসারকে নানাভাবে দেখে থাকেন। এক – সংসার স্বপ্নতুল্য, মিথ্যা, দুই – সংসার পাগলাগারদ, তিন – সংসার নাট্যশালা, চার – সংসার জেলখানা, পাঁচ – সংসার হল বাজার।

প্রশ্ন ঃ সংসার পাগলা গারদ কেন?

উত্তর ঃ দেখো, সংসারী মানুষের কাণ্ড কারখানা, কখনো পাগলের মতো হাসছে, কখনো কাঁদছে, কারুর সঙ্গে বন্ধুর মতো গলাগলি করছে, পরমুহূর্তে তার সঙ্গে

ঝগড়া মারামারি শুরু করে দিল, কারুর খুব আনন্দ হয়েছে, সেই আনন্দের আতিশয্যে একেবারে নাচ শুরু করে দিল, হঠাৎ শুনল তার ছেলে মরে গিয়েছে, ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদতে লেগে গেল। দেখো, ভাই দূরে দাঁড়িয়ে এই সংসারের কাণ্ডকারখানা যদি দেখতে পারো, তাহলেই বুঝবে মানুষ কেমন পাগলের মতো ব্যবহার করছে চলেছে। সেই জন্যই এই সংসার হল পাগলা গারদ।

প্রশ্ন ঃ সংসার নাট্যশালা কেন, কীভাবে?

উত্তর ঃ দেখো, যখন অভিনয় চলতে থাকে, তখন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রং চং মেখে সেজেগুজে রঙ্গমঞ্চে এসে দেখা দেয়। যার পালা যখন শেষ হয়, সে তখন সাজগোজ ফেলে, বেশভূষা বদল করে নিজের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে ঘরে ফিরে যায়, আমরাও এই সংসাররূপ রঙ্গমঞ্চে থিয়েটার করতে এসেছি। আমরা কারুর পিতা সাজছি, কারুর পুত্র সাজছি, কারুর পতি, কত রকম সংই না সাজতে হচ্ছে আমাদের। যেই পালা শেষ হয়ে গেল, অমনি সাজ খুলে ফেলে বেশভূষা বদল করে ঘরে ফিরে যাই। তখন কোথায় রইল পতি, কোথায় পিতা আর পুত্র – কেউ কোথাও নেই। থিয়েটারেও দেখো কেউ রাজা সাজছে, কেউ সাজছে মন্ত্রী, কেউ শত্রু, কেউ বা মিত্র, কিন্তু পালা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাজ পোশাক ফেলে যে যার ঘরে চলে গেল, তখন আর কোথাও কিছু রইল না। সেইজন্যই সংসারকে বলা হয় নাট্যশালা।

প্রশ্ন ঃ সংসার জেলখানা কীভাবে?

উত্তর ঃ দেখো, জেলখানায় কয়েদীদের থাকবার জন্য একটা কুঠ্‌রি বা ছোট ঘর দেওয়া হয়। আমাদেরও সংসারের কয়েদখানায় এই দেহরূপী এক একটা ঘর মিলেছে, মেয়াদ যতদিন আছে ততদিন এখানে আবদ্ধ থাকতে হবে, মেয়াদ ফুরলেই এই দেহরূপী ঘর ছেড়ে নিজের ঘরে চলে যেতে হবে। দেখো ভাই, বিচারবুদ্ধি দিয়ে দেখলে ঠিক বুঝতে পারবে এই সংসার সত্যিই জেলখানা। আমরা এই জেলে এক একটা কুঠ্‌রিতে পড়ে রয়েছি, মেয়াদ পূর্ণ হলে নিজের জায়গায় চলে যাব। তাই সংসারকে বলা হয় জেলখানা।

প্রশ্ন ঃ সংসারকে বাজার বলা হয় কেন?

উত্তর ঃ মানুষ যেমন বাজারে কেনাবেচা করতে আসে, আমরাও তেমনি এই সংসারে বেচাকেনা করতে এসেছি। যার বেচাকেনা শেষ হয়ে যাবে, সে আর বাজারে থাকবে না। বাজার ছেড়ে নিজের ঘরে চলে যাবে আপন আপন কর্মফলের সওদা নিয়ে।

আচ্ছা ভাই, তুমি বলতো – তুমি যখন থিয়েটার দেখতে যাও, তখন থিয়েটারের জন্য কোন জিনিস প্রথম প্রয়োজন হয়?

ভদ্রলোক ঃ মহারাজ, আমি জানি না। আপনিই বলুন। আপনার মুখারবিন্দ থেকে শুনবার জন্য আমি এসেছি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই, থিয়েটারের জন্য যে জিনিসটির প্রথম প্রয়োজন তা হল আলো। এই আলো না থাকলে থিয়েটার করবে কী করে?

এই আলো আমাদের কাছে কী জিনিস? এই আলো হল – জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মা।

আমাদের ভিতরে চৈতন্যরূপী জ্যোতি আছে। এই কারণে আমরা এই সংসাররূপী থিয়েটার করছি ও দেখছি। যেদিন এই জ্যোতি অন্তর্হিত হবে তখন জগৎ সংসার অন্ধকার হয়ে যাবে, আর কিছুই দেখা যাবে না। সূর্যের উদয় হলে জগৎ সংসার তারই প্রভাবে আলোকিত হয়ে যায়। সূর্য যদি উদিত না হয়, তাহলে রাত্রির মতো সব কিছু অন্ধকার হয়ে যাবে। সূর্যকে দেখবার জন্য আলো জ্বালতে হয় না। সূর্য সমস্ত জগৎ সংসার আলোকিত করে রাখে। নিজের, আলোকেই আলোকিত, সেই আলোকেই তাকে দেখা যায় যেমন বলা হয়ে থাকে –

'দীপেষুনান্য দীপেচ্ছা'

অর্থাৎ, প্রদীপকে দেখতে অন্য কোন আলাদা প্রদীপ জ্বালাতে হয় না। প্রদীপ অন্ধকার নাশ করে নিজে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। ঠিক সেই রকম চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা হলেন জ্যোতিস্বরূপ। তাঁকে দেখাবার জন্য অন্য কোন আলোর দরকার হয় না। তিনিই জগৎ সংসারকে আলোকিত করে রাখেন। এই চৈতন্যরূপী জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মা আমাদের ভিতরে আছেন। তাঁকে দেখতে হবে, অনুভব করতে হবে। এই চৈতন্যসত্ত্বার অনুভব যাঁর হবে, তাঁকে জ্ঞানী বলা যাবে। জ্ঞানী ব্যক্তি এক অখণ্ড চৈতন্যসত্তার উপলব্ধি করে থাকেন। সেই চৈতন্য সত্তাতেই সমস্ত জগৎ সংসারের স্থিতি। এমন কোন বস্তু নেই যাতে সেই সত্তা বিরাজ করছে না।

ভদ্রলোক ঃ মহারাজ, জ্ঞানীর প্রারব্ধ কী থাকে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ বাছা, জ্ঞানীর প্রারব্ধ থাকে। প্রারব্ধ থেকেই এই শরীর উৎপন্ন হয়েছে। কর্মকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে – সঞ্চিত, ক্রিয়মান ও প্রারব্ধ যেমন ধানের ফসল তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। এক, পুরনো ধান কিছুটা রোপন করে বাকিটা ঘরে রেখে দেওয়া হল। ঘরে যা রইল তা হল সঞ্চিত। রোপন করা বীজ ধান থেকে যে ফসল হল সেই ফসলের কিছুটা এখন ভোগ করা হল এটি হল ক্রিয়মান।

এই ফসল থেকে পরের বছরের জন্য যে বীজ রাখা হয় অর্থাৎ যে বীজ থেকে পরের বছর আবার যে ভালমন্দ ফসল ফলবে তা হল প্রারব্ধ। ক্রিয়মান কর্মই পরের জন্মে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রারব্ধ হয়ে আসে। আমাদের মধ্যেও তেমনি আগেকার কত জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফল সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, এখনো তা প্রারব্ধ হয়ে দেখা দেয়নি। কিছু কর্মের ফল এ জন্মে ফলছে তা হল প্রারব্ধই। এ জন্মে যে সব কাজ করছি অর্থাৎ ক্রিয়মান কর্ম, তার ফল প্রারব্ধ হয়ে ভালমন্দ ফলরূপে পরবর্তী কোন জন্মে দেখা দেবে। জ্ঞানীদের সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যায়। তবে তাঁদের প্রারব্ধ কর্ম দগ্ধ হয় না অর্থাৎ যে প্রারব্ধের বশে, তাঁদের শরীর উৎপন্ন হয়েছে, সেই প্রারব্ধটুকুই কেবল তাঁদের ভোগ করতে হয়। গীতাতে ভগবান বলেছেন – জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। (গী - ৪/৩৭)

অর্থ ঃ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিদগ্ধ হলে কোন কর্মই ফল প্রসব করতে পারে না। এখানে বলা হয়েছে যে, জ্ঞানীকে সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না, কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। ভোগের দ্বারাই কেবল প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হয় – 'ভোগেন নষ্টঃ ভবতি'।

ভদ্রলোক ঃ মহারাজ, আমাদের ব্যবহারিক জগতের এরকম রীতিই দেখা যায়। আমার একটি প্রশ্ন আছে, প্রশ্নটি হল – যে পিতার সব সময় মনে হয়ে থাকে – আমার পুত্রকন্যা যেন সুখে থাকে, পুত্র কন্যার সুখ শান্তির জন্য পিতা কত চেষ্টা করেন, কিন্তু আমাদের জগৎ পিতা পরমেশ্বর কেন আমাদের সুখী করতে চান না, কাউকে রোগগ্রস্ত করছেন, কাউকে শোকগ্রস্ত করছেন, কাউকে আবার সুখী করছেন, কাউকে দুঃখী করছেন। সুখী, দুঃখী, রোগী, শোকার্ত – সকলেরই তিনি পিতা। তিনি তো সর্বশক্তিমান পিতা। তিনি কি আপন পুত্রকন্যাদের সুখী করতে পারেন না?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো বাছা, এই সুখ দুঃখের তত্ত্ব বুঝতে পারা খুব কঠিন। ঈশ্বর যদি দুঃখ সৃষ্টি না করতেন, তাহলে সুখের বোধ হত কেমন করে? সুখকে বোঝাবার জন্য দুঃখের সৃষ্টি হয়েছে। অমাবস্যার অন্ধকার না থাকলে পূর্ণিমার প্রকাশের যে আনন্দ তা কীভাবে বোঝা যেত? যদি রাত্রি না থাকত তাহলে দিন হয়েছে কী করে বুঝতে? এই জন্যই ঈশ্বর সৃষ্টিকে দ্বন্দ্বরূপে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃত দুঃখ বলে কিছু নেই। সুখকে বোঝাবার জন্যই দুঃখ। আমরা যাদের দুঃখী বলে মনে করি তাদের মধ্যে কী সুখ নেই? সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই সুখ রয়েছে। বিষ্ঠার মধ্যে যে পোকা দেখি,

আমরা মনে করি কী দুঃখের জীবন এদের, কিন্তু তাতেও তাদের মধ্যে আনন্দ রয়েছে। কিছুমাত্র আনন্দ যদি না থাকত, তাহলে এক মুহূর্তও তারা বেঁচে থাকতে পারত না, তাদের প্রাণ কখন চলে যেত। অন্য কোন আনন্দ যদি নাও থাকে, আত্মার আনন্দ তো থাকতেই হবে। চৈতন্যরূপী পরমাত্মা আনন্দরূপে সকল প্রাণীর মধ্যেই বিরাজ করছেন। এ তো গেল এক কথা, অন্য কথাটি হল – ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ক্রিয়মান করছে প্রকৃতি। ঈশ্বর সুখ দুঃখ কিছুই সৃষ্টি করছেন না। প্রকৃতি (মায়া) সুখ দুঃখ সৃষ্টি করে চলেছে। এইজন্য ভগবান গীতা শাস্ত্রে বলেছেন –

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।। গী ৩/২৭

অনুবাদ – প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা সকল কর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে, কিন্তু অহংকারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি, আমি কর্তা এরূপ মনে করে থাকে।

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।। (গী ৫/১৪)

অনুবাদ ঃ প্রভু (ঈশ্বর) জীবগণের কর্তৃত্ব বা কর্ম সৃষ্টি করেন না, অথবা কর্মফলও সংযোগ করে দেন না। পরন্তু স্বভাবই (অবিদ্যা) কর্তৃত্বাদি রূপে প্রবৃত্ত হয়ে জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করে থাকে।

দেখো ভাই, শাস্ত্র বলেছেন, অবিদ্যাজনিত কর্ম থেকে কর্মফল সৃষ্টি হয়ে থাকে। তা থেকে সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়ে থাকে। জগৎ-পিতা পরমেশ্বরের এক্ষেত্রে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। তিনি কাউকে সুখী করেন না, কাউকে দুঃখী করেন না। এখন প্রশ্ন উঠবে তাহলে প্রকৃতি (অবিদ্যা) উৎপন্ন হয় কোথা থেকে? কোন আধারে প্রকৃতি অবস্থান করছে? ঈশ্বরেই প্রকৃতি আছে তো? এর উত্তর হল 'একাংশেন স্থিতো জগৎ'। (গী ১০/৪২ দ্বিতীয় পংক্তি)

অর্থাৎ ভগবান বলছেন, এক পাদমাত্র দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করে আমি রয়েছি। অবিদ্যা বা প্রকৃতি ঈশ্বরেই অবস্থান করে। কীভাবে অবস্থান করে? যেমন কোন সর্বাঙ্গসুন্দর লোকের সৌন্দর্যে কোন খুঁত নেই, কেবল এক জায়গায় একটা কালো তিল রয়েছে, তিল থাকার দরুণ তাঁর কোন বাধা জন্মাচ্ছে না, এমন কি তিল যে রয়েছে তা সে খেয়ালও করে না। এইভাবে ঈশ্বরের মধ্যে অবিদ্যার স্থিতি। সুখ-দুঃখ হল অন্তঃকরণের ধর্ম। তা কীভাবে বোঝা যায়। সুষুপ্তির সময় বোঝা যায়। দেখো, সুষুপ্তিতে মানুষ যখন গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে তখন তার মধ্যে সুখ দুঃখের কোন

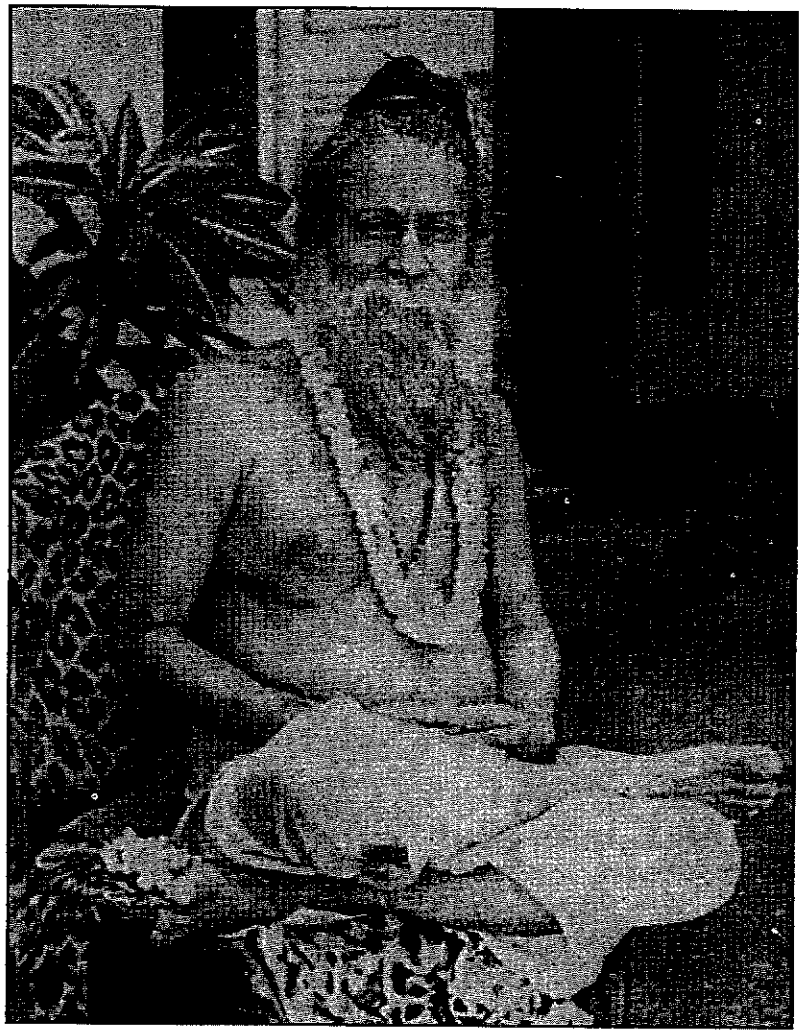

গুরুভ্রাতা শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

গুরুভ্রাতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

বোধ থাকে না। কেন থাকে না? কারণ তখন মানুষের অন্তঃকরণের কাজ স্তব্ধ হয়ে যায়। গভীর নিদ্রার মধ্যে প্রাণবায়ু চলতে থাকে। তাতেই বোঝা যায় যে সেই সময় চৈতন্যসত্তা বর্তমান থাকে, প্রাণের গতি থেকেই চৈতন্যের অবস্থিতি বোঝা যায়। চৈতন্যসত্তা লুপ্ত হয় না। সুষুপ্তিকালে তা বজায় থাকে। চৈতন্যে যদি সুখ দুঃখ থাকত তাহলে গাঢ় নিদ্রার মধ্যেও অর্থাৎ সুষুপ্তিতেও মানুষ সুখ দুঃখ অনুভব করত। সুষুপ্তিতে জাগতিক সুখ বা দুঃখ কিছুই যখন থাকে না, তখন বুঝতে হবে – জাগতিক সুখ-দুঃখ হল অন্তকরণের ধর্ম, অন্তঃকরণেই সুখ দুঃখের অবস্থান। এ থেকেই সিদ্ধান্ত হল যে সুখ দুঃখ অন্তঃকরণের ধর্ম। জগৎ সৃষ্টিতে আছে কী? সৃষ্টিতে আছে – পঞ্চভূত, তিনগুণ, মায়া আর চৈতন্য। এদের ছাড়া আর কিছু নেই। সৃষ্টিতে যা কিছু আছে সবই এদের অন্তর্গত। আমরা যখন সন্ধ্যাবন্দনাকালে ভূত শুদ্ধি করি, তখন তার প্রণালী বড়ই সুন্দর। দেখো পঞ্চভূতকে কীভাবে লয় করে দেওয়া হয় –

পৃথিবীকে (ক্ষিতি বা মাটি) জলে লয় করা হয়, জলকে অগ্নিতে লয় করা হয়, অগ্নিকে বায়ুতে লয় করা হয়, বায়ুকে আকাশে লয় করে দেওয়া হয়। আকাশ লয় হয় মায়াতে, মায়া লয় হয় চৈতন্যে। আর চৈতন্য ছাড়া তখন কিছুই নেই। ওই চৈতন্য জ্যোতিস্বরূপ তার আর কিছু স্বরূপ নেই। সেই জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মাকে চেনো জানো। তাহলে তোমার আর কিছু সুখ দুঃখ থাকবে না। অন্তঃকরণেই সুখ দুঃখ উৎপন্ন হচ্ছে, আর অন্তঃকরণেই সেই পরমাত্মার উপলব্ধিও হচ্ছে। আত্মজ্ঞান লাভ করাই মানুষের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মানুষ অন্তঃকরণকে মলিন করে রাখে। এই কারণে চৈতন্যর উপলব্ধি তার হয় না। যেমন লণ্ঠনের কাঁচে কালি পড়লে তার ভেতরের আলো দেখা যায় না, সেই কালি পরিষ্কার করলে তখন আলোর প্রকাশ হয়। আমাদের মধ্যে যে রজগুণ রয়েছে তা অন্তঃকরণকে মলিন করে রাখে। শুদ্ধ সত্ত্বগুণ যখন অন্তকরণে স্থিতি লাভ করবে, তখন অন্তকরণ শুদ্ধ হবে, পরিষ্কার হবে। আর তখনই জ্যোতিস্বরূপ চৈতন্যরূপী পরমাত্মার অনুভব হবে।

সন্ধ্যা সমাগত দেখে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ সন্ধ্যা বন্দনা করতে উঠে ধ্যান কুটিরে চলে গেলেন। সেদিনের সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় যে যে ভক্তগণ বসেছিলেন সকলেই গুরুমহারাজের পবিত্র উপদেশগুলি শ্রবণ করে পরম সন্তোষ লাভ করেছিলেন। আমি এই দিনের সৎসঙ্গ শুনে কৃতার্থ হয়েছিলাম, গুরুমহারাজের পাদপদ্ম স্মরণ করে যথাসাধ্য সৎসঙ্গ লিপিবদ্ধ করলাম।

ষষ্ঠ পর্ব

স্থান—ধ্যানকুঠীর রোয়াক ঃ ১৩৪০ সাল
পৌষ মাস ঃ সময়—সকাল
নড়ালের জমিদার ভবেন রায় মহাশয়
ও
শ্রীশ্রী গুরু মহারাজের সৎসঙ্গ

[মনুষ্য জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন। এই জীবন বৃথা অপব্যয় করা ঠিক নয়। এই প্রসঙ্গে লালমণির গল্প ঃ মনুষ্য জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন কারণ, এই জীবনেই পরমাত্মা লাভ করা যায়—এই প্রসঙ্গে কালো মাথার জানোয়ারের গল্প ঃ যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ : কীভাবে ইন্দ্রিয়-দাসত্ব মোচন হতে পারে ঃ ভোগ করে ত্যাগ করার গল্প ঃ ভোগের তৃষ্ণার শেষ নেই এবং এই প্রসঙ্গে লোমশ মুনির গল্প ঃ প্রকৃতি-ভেদে কর্ম—অন্তরে নিবৃত্তি কিন্তু বাইরে প্রবৃত্তি, অন্তরে নিবৃত্তি ও বাইরেরও নিবৃত্তি, অন্তরে প্রবৃত্তি কিন্তু বাইরে নিবৃত্তি ঃ তিন রকমের গুরু—তরণ গুরু, তারণ গুরু ও তরণ-তারণ গুরু ঃ বাইরে নিবৃত্তি সাধারণতঃ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় ঃ শুভ কর্ম কর আর ফলের আশা ত্যাগ কর ঃ ঈশ্বর তোমার কাছেই আছেন, ভালবাসায় তাঁকে লাভ করা যায় ঃ পঞ্চপ্রেম বা ভাব-শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ঃ স্বকাম ভক্তের চেয়ে নিষ্কাম ভক্তই শ্রেষ্ঠ—এই প্রসঙ্গে দুটি গল্প এক বুড়ির গরু মরার গল্প, দুই, নিষ্কামী রানীর গল্প।]

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভবেন, তোমার স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, আর যে সব লোক তোমাকে দেখছে তারাও সবাই অবাক হয়ে যাচ্ছে।

ভবেন ঃ মহারাজ, আগে আমি কোন সৎসঙ্গে মিলিত হতে পারিনি। একারণে আমার নিম্নগতি হয়েছে, কিন্তু আপনার সঙ্গ লাভ করে আমার পরিবর্তন হয়েছে। বাল্যকালে আমার ভাল শিক্ষা লাভের সুযোগ হয়নি। বহু সময় আমার অপব্যয়ে চলে গেছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো, মনুষ্যজীবনই হল শ্রেষ্ঠ জীবন, ঈশ্বরের ঠিক নিচেই মনুষ্যজীবন। এই জীবন বৃথা অপব্যয়ে চলে যাওয়া ঠিক নয়, ভাই। এ সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প আমার মনে পড়ছে—তা তোমাকে শোনাচ্ছি।

লালমণির গল্প

এক কৃষকের ক্ষেতের ধান পাখিতে খেয়ে যেত। পাখি তাড়াবার জন্যে

কৃষক এক উপায় বের করল। সে ছোটো ছোটো পাথরের টুকরো সুতোর আগায় বেঁধে সেই সুতো ঘুরিয়ে পাথরগুলোকে দূরে দূরে ছুঁড়ে দিতে লাগল, তাতে পাখিরা আর তার ক্ষেতের কাছে আসতে পারত না। ক্ষেতের পাশেই ছিল এক নদী। কৃষক রোজ সেই নদীতে স্নান করত। একদিন সে স্নান করছে এমন সময় নদীর পাড় খানিকটা ভেঙে গেল। পাড় ভাঙতেই কৃষক দেখতে পেল সেখানে একটা লাল রঙের মাটির হাঁড়ি পড়ে রয়েছে আর সেই হাঁড়ির ভিতরে রয়েছে অনেকগুলি লালপাথর। অমন চমৎকার লাল পাথর দেখে কৃষক হাঁড়িটিকে তুলে নিয়ে এল আর সেই পাথর ছুঁড়েই সে পাখি তাড়াতে লাগল। এমনিভাবে পাথরগুলো কোথায় যে ছড়িয়ে পড়ল তার আর ঠিক ঠিকানা রইল না। শেষকালে হাঁড়িতে একটিমাত্র পাথর পড়ে রইল, কৃষক তা লক্ষ্য করল না।

প্রতিদিন ধান পাহারা দিতে হয় বলে কৃষক আর বাড়ি যেত না। ক্ষেতের মধ্যে একখানা ঘর তৈরি করে সেখানেই থাকতে লাগল। একদিন কৃষকের বৌ তার ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এল। ছেলেটা দেখল হাঁড়ির মধ্যে একটা টুকটুকে লাল পাথর পড়ে আছে। দেখেই সে পাথরটা হাতে তুলে নিল। কৃষকের বৌ ক্ষেত থেকে বাড়ি ফিরে রান্নার যোগাড় করতে গিয়ে দেখে ঘরে নুন নেই। এদিকে ঘরে একটা পয়সাও নেই যে তা দিয়ে নুন কিনে আনবে। এমন সময় ছেলের হাতের লাল পাথরটার দিকে তার নজর পড়ল। পাথরটাকে তুচ্ছ সাধারণ একটা পাথর বলেই তার মনে হল। তবুও সে ভাবল যে পাথরটা দেখতে যখন এত চমৎকার তখন মুদি হয়তো এর বদলে খানিকটা নুন দিলেও দিতে পারে। এই মনে করে পাথরটা নিয়ে সে মুদির কাছে গেল। মুদি তাকে বলল : "এ পাথর নিয়ে আমি কী করব? এ তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এর বদলে আমি তোমাকে নুন দিতে পারব না।"

সেই সময় এক জুহুরী মুদির দোকানে জিনিস কিনছিল। পাথরটার দিকে তার নজর পড়ল। সে তখন কৃষকের বৌকে বলল, "পাথরটা আমাকে দাও, আমি তোমাকে নুন কিনে দিচ্ছি"। পাথর হাতে নিয়ে জুহুরী দেখল, আরে এ যে লালমণি। এমন অমূল্য জিনিসের কি দাম দেওয়া যায়? জুহুরি তখন মুদির কাছ থেকে নুন কিনে কৃষকের বউ-এর হাতে দিয়ে বলল, "তোমার এ পাথরের দাম দিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই। তবে এর বদলে আমার

যতদূর সাধ্য তা আমি তোমাকে দেবো।" এই বলে সে কৃষকের বউকে প্রচুর ধনরত্ন দিল। আর তাদের যে কুঁড়েঘর ছিল সেই জায়গায় এক প্রকাণ্ড পাকা বাড়ি তৈরি করে দিল।

এদিকে কৃষকের ক্ষেতের কাজ শেষ হয়ে গেলে সে বাড়ির কাছে এসে অবাক হয়ে গেল, নিজের বাড়ি আর সে খুঁজে পায় না। কোথায় গেল তার সেই কুঁড়েঘর? এই অট্টালিকাই বা কার? কৃষক এই সব ভাবছে এমন সময় তার বৌ সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বলল, "সেদিন ক্ষেত থেকে ছেলে যে পাথরটা নিয়ে এসেছিল, তারই দৌলতে আমাদের এই বাড়ি। এত ধনদৌলত সব হয়েছে।" এই বলে সে কৃষককে সমস্ত ঘটনা শুনিয়ে দিল। কৃষক তখন হায় হায় করে মাথা চাপড়ে বলতে লাগল, "কী বোকামিই না আমি করেছি। সামান্য পাথর ভেবে এমন মহামূল্য জিনিস আমি কি না পাখিকে ছুঁড়ে তাড়াতে গিয়ে নষ্ট করলাম। একটা পাথরেই যদি আমার এমন বাড়ি, এত ধনদৌলত মিলে থাকে, তাহলে আজ যদি সব পাথর আমার কাছে থাকত, তবে তো আমার সাত রাজার ধন মিলে যেত। হায় হায়, এমন অমূল্য সম্পদ পেয়েও আমি তো হেলায় হারালাম"!

তাৎপর্য ঃ দেখো ভাই ভবেন, এই যে শ্বাস-প্রশ্বাস আমরা নিচ্ছি ফেলছি, এ হল লালমণি, ইন্দ্রিয়রূপী পাখির পিঠে ওই মণি আমরা ফেলে দিচ্ছি। মায়ারূপী হল কৃষকের পত্নী। কৃষকের তিনটি পুত্র — রজ, তম ও সত্ত্ব। কনিষ্ঠ পুত্র হল সত্ত্বগুণ। সে জীবরূপী পিতার কাছ থেকে একটি মণি সরিয়ে নিল। দেখো ভাই ভবেন, সব শ্বাস তো ইন্দ্রিয়গণের সেবায় চলে যায়। এক আধটা যদি গুরুরূপী জুহুরীর কাছে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে আত্মধন মিলে যাবে অর্থাৎ পরামাত্মাকে লাভ করা যাবে। এ সম্পর্কে একটি দোঁহা আছে—তোমাকে শোনাচ্ছি ঃ

"আগেকে দিন পাছে গিয়া
হর্ষে কিয়া না হেত্।
আর পশ্চাতায়া কেয়া হোতা হ্যায়
চিড়িয়া চুর গিয়া খেত্।"

অর্থাৎ দোঁহার তাৎপর্য হল, যেদিন অতীত হয়ে গেছে তা তো আর ফিরে আসবে না। আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়ে বৃথাই সময় অপব্যয় করলে। পরমাত্মা

লাভের জন্যে কোন্ প্রচেষ্টাই করলে না। পরবর্তীকালে কী হবে? পাখি তো ধান খেয়ে নিয়েছে। ক্ষেত তো শূন্য হয়ে গেছে। দেখো ভাই ভবেন, প্রথম থেকেই আত্মধন (পরমাত্মা) লাভের জন্যে যদি প্রচেষ্টা না কর, শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থাৎ পরমায়ু যদি ইন্দ্রিয় সেবায় নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আত্মধন লাভের আর কোন উপায় থাকবে না। দেখো ভাই, সব জীবনের মধ্যে এই মনুষ্য জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন এই জীবনেই মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। এ সম্পর্কে এক কাহিনি তোমাকে শোনাচ্ছি ঃ

এক গভীর জঙ্গলে এক সিংহ ও এক সিংহী বাস করত। সিংহী খুবই হুঁশিয়ার। সে সিংহকে বলে, দেখো তুমি সব জন্তুদের মধ্যে বড়ো জন্তু—তুমি পশুরাজ, কিন্তু তোমার চেয়ে বড় জন্তু একজন আছে, তার মাথাটা কালো। তুমি ওই কালো মাথার জানোয়ারের সাথে কখনও দেখা করবে না। ওর সঙ্গে দেখা হলে তোমার জীবন সংশয় হয়ে যাবে। সিংহ তখন বলল, আরে সিংহী, আমি হলাম পশুরাজ, আমার চেয়ে কোন্ বড় পশু আছে? সিংহী বলল, কালো মাথার জানোয়ারটা তোমার চেয়ে বড়।

একদিন সিংহ দেখল, কুঠার নিয়ে একটা লোক গাছ কাটছে, ওর মাথা তো কালো। সিংহ মনে মনে বিচার করল—এই-ই হচ্ছে কালো মাথার জানোয়ার। সিংহের বড়ো ভয় হল। বড়ো সঙ্কোচের সঙ্গে সে লোকটার কাছে গেল। লোকটা হল এক কাঠুরিয়া, গাছ কাটবার জন্য সে জঙ্গলে এসেছে। সামনে সিংহকে দেখে তার প্রাণ শুকিয়ে গেল। সে ভাবল, সিংহ এখনই আমাকে খেয়ে ফেলবে, মরতে তো আমাকে হবেই। তাই কিছু সাহস করে দেখি যদি প্রাণ রক্ষা হয়। তখন সে বলল—এই সিংহ, তুমি এখান থেকে চলে যাও, তা না হলে তোমার প্রাণ নষ্ট হয়ে যাবে। সিংহ ভয়ে ভয়ে বলল, —কেন ভাই, কীরকম ভাবে আমার প্রাণ নষ্ট হবে! তখন কাঠুরিয়া বলল, এই যে প্রকাণ্ড গাছ, এই গাছ আমি কেটে ফেলবো। তোমার মাথার ওপর যদি গাছটি পড়ে তাহলে তুমি মরে যাবে। এই কারণে প্রথমেই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

সিংহ দেখল, কাঠুরিয়া প্রকাণ্ড গাছটা কেটে ফেললো। তার খুব ভয় হল। মনে মনে ভাবল এই কালো মাথার জানোয়ার খুবই ভয়ানক জানোয়ার। তখন

সিংহ কাঠুরিয়াকে জিজ্ঞাসা করল—

এই গাছ তুমি কি করবে?

—এই গাছ আমি আমার বাড়িতে নিয়ে যাব।

—এত বড়ো গাছ তুমি কী করে ওঠাবে আর কী করেই বা নিয়ে যাবে?

এই গাছের মাঝখানে একটি ছিদ্র করবো, তার মধ্যে পা ঢুকিয়ে দেবো। তারপর পা দিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে গাছটাকে টেনে নিয়ে যাবো।

এরপর কাঠুরিয়া ওই গাছের মধ্যে একটি ছিদ্র করল, তারপর দুটি খিল তৈরি করল। তখন সিংহ বলল, ভাই তোমার এত সামর্থ যে তুমি এত বড়ো গাছটাকে পা দিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবে। ভাই, আমি একবার আমার সামর্থকে দেখে নিই—আমি এই গাছটা টেনে নিয়ে যেতে পারি কি না। তখন কাঠুরিয়া বলল, "তুমি এই ছিদ্রটার মধ্যে পা ঢুকিয়ে দাও, আমি খিল দিয়ে তোমার পা-টাকে এঁটে দিচ্ছি"। সিংহ তা-ই করল। সে কাঠের ছিদ্র দিয়ে পা-টা ঢুকিয়ে দিল আর কাঠুরিয়া ঝট্ করে খিল দিয়ে সিংহের পা-টা এঁটে দিল। এরপর কাঠুরিয়া বলল, ভাই সিংহ, তুমি এখানে পড়ে থাকো, আমি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। ব্যস, সিংহ তো বন্দি হয়ে গেল।

এদিকে সিংহী দেখল—অনেক দেরি হয়ে গেল তবু সিংহ ফিরছে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে সিংহী সিংহের কাছে এসে বলল, আরে, তোমার এমন দুর্দশা কী করে হল। তোমার সঙ্গে কি কালো মাথার জানোয়ারের দেখা হয়েছে? সিংহ বলল, হ্যাঁ রে সিংহী, কালো মাথার জানোয়ারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ওই জানোয়ারই আমার এই দশা করেছে। সিংহী তখন অনেক চেষ্টা করে সিংহের পায়ের খিল খুলে দিয়ে বলল, দেখো, কালো মাথার জানোয়ার খুব ভারি জানোয়ার, আর তার সঙ্গে দেখা করো না। দেখো ভাই ভবেন, এ থেকে সিদ্ধান্ত হল যে মনুষ্যজীবনই হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জীবন। মানুষের চেয়ে বাঘ সিংহ হাতি ঘোড়া প্রভৃতি জানোয়ারের দৈহিক শক্তি কত বেশি। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি আর কৌশল খুবই বেশি। আমাদের এই কায়ারূপী জঙ্গলে দুর্জয় ইন্দ্রিয়রূপী বাঘ-সিংহ ঘোরাফেরা করছে। কৌশল করে তাদের বন্দী না করতে পারলে তারা তো আমাদের খেয়ে ফেলবে। এই কারণে গীতায় বলা হয়েছে—

'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'

অর্থাৎ কর্মের কৌশলই হল যোগ। যোগ আর কিছুই নয়। কৌশলপূর্বক পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মাকে মিলিয়ে দেবার নামই যোগ। কৌশল করেই দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণকে জয় করতে হবে। দেখো ভাই, এই দুর্লভ মনুষ্যজীবন তুমি পেয়েছ, তা ইন্দ্রিয় সেবায় বহু সময় কাটিয়ে দিলে। এখন কিছু আত্মধন সংগ্রহের চেষ্টা কর। দেখো ভাই, ইন্দ্রিয় সুখ তো ক্ষণিকের, তা নিয়ে মেতে থাকা তো বোকামি ছাড়া কিছু নয়। রসনা ইন্দ্রিয় তো খুব প্রবল কিন্তু তার স্থায়িত্ব খুব অল্প। খাবার মুখে দিলে, আস্বাদ মিলল, কিন্তু যেই গলা থেকে নেমে গেল তখন আর কোন আস্বাদ নেই। পেটের মধ্যে গিয়ে মলমূত্রে পরিণত হয়ে গেল। তাহলে বল ভাই ভবেন, রসনার ক্ষণিক তৃপ্তির জন্যে মনকে ব্যাকুল করে তোলা উচিত, না মন ব্যাকুল হলে তাকে বিচারের দ্বারা দাবিয়ে রাখা উচিত?

ভবেন ঃ মহারাজ, দাবিয়ে রাখাই ঠিক। আমরা তো ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস হয়ে গিয়েছি। কী উপায়ে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব আমাদের মোচন হবে তা আমরা জানি না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, বিচার-বুদ্ধিতেই ইন্দ্রিয়-দাসত্ব মোচন হবে।

'তৃষ্ণাপি তরুণায়তে'

তৃষ্ণার ক্ষয় করা চাই। তৃষ্ণা কিন্তু দিন দিন তরুণ হতে থাকে। এ বিষয়ে এক সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রভাতে যখন সূর্যের উদয় হয় তখন মানুষের ছায়া খুব লম্বা হয়ে আগে আগে যেতে থাকে। ওই ছায়াকে ধরবার জন্যে যতই তুমি ছুটবে, ছায়াও তত সামনের দিকে লম্বা হয়ে বাড়তে থাকবে। মানুষের ছায়ার মতো তৃষ্ণাও আগে বাড়তে থাকে। যতই তুমি তৃষ্ণার পিছনে ছুটবে তৃষ্ণাও তোমার সামনে প্রভাতের ছায়ার মতো লম্বা হয়ে চলবে। তাই বলা হয়েছে—'তৃষ্ণাপি তরুণায়তে'।

এ অবস্থায় তোমাকে কী করতে হবে। তৃষ্ণার পিছনে ছুটোনা, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। তাতে কী হবে? দুপুর বেলায় সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর আসবে, তখন ছায়া তোমার পায়ের তলায় এসে লুটিয়ে পড়বে অর্থাৎ জ্ঞানরূপী সূর্য মাথার উপর এলে ছায়ারূপী তৃষ্ণা পায়ের তলায় এসে যাবে। বিকেলবেলায় ছায়া যেমন সরে, তৃষ্ণারূপী ছায়াও তেমনি তোমাকে ছেড়ে পিছনে চলে যাবে। তাই বলি, তৃষ্ণার পিছনে ছুটো না। বিচারকে সম্বল করে দাঁড়াও, জ্ঞানসূর্যের আরাধনা কর। জ্ঞান হলে তৃষ্ণা আপনি চলে যাবে। ভোগ

দ্বারা ভোগের তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। যেমন আগুন আর কাঠের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। আগুনে যতই ইন্ধন যোগাতে থাকবে, আগুন ততই প্রবল হয়ে উঠবে। আর ইন্ধন না পেলে আপনা থেকেই আগুন নিবে যাবে। এরকমভাবে ইন্দ্রিয়রূপী আগুন আমাদের মধ্যে জ্বলছে, যতক্ষণ বিষয়রূপী কাঠ তাতে দিতে থাকবে, ততক্ষণ সে প্রবল হয়ে জ্বলবে, কমবে না। বিষয় থেকে বিরত হও। ইন্দ্রিয় আপনা থেকে দমন হয়ে যাবে। আগুনে ঘৃতাহুতি দেবে, কাঠ দেবে। অথচ মনে মনে ভাববে আমার ইন্দ্রিয়-অগ্নি নিবে যাক, তা কি কখনও সম্ভব?

ভবেন ঃ মহারাজ, কোন কোন লোক বলে—ভোগ করলে ত্যাগ আসে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ ভাই, এর একটা দৃষ্টান্তমূলক গল্প আছে। তোমাকে শোনাচ্ছি

ভোগ করে ত্যাগ করার গল্প

এক সাধু কঠোর সংযম পালন করে সাধন ভজনে মনকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। কিন্তু যখনই তিনি ধ্যানে বসতেন তাঁর কেবলই মনে হত এখন যদি একটু পায়েস পরমান্ন পাই তাহলে বেশ হত। অনেক চেষ্টা করেও তিনি মন থেকে পায়েস খাওয়ার লোভ দূর করতে পারলেন না। তাই তিনি নিজের উপরেই বিরক্ত হলেন। একদিন তিনি এক বড়লোকের বাড়িতে ভিক্ষে করতে গিয়েছেন। ধনী গৃহস্থ সাধুকে দেখে বহু স্তব-স্তুতি করে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, আপনার সেবার জন্য কীরকম ব্যবস্থা করব বলুন।" সাধু বললেন, "আমার জন্যে পায়েসের ব্যবস্থা করো।" প্রচুর পরিমাণ পায়েস প্রস্তুত করো। গৃহস্থ ব্যক্তি প্রচুর পায়েস করে সাধুর সামনে ধরে দিলেন। সাধুও ভগবানকে নিবেদন করে সেই পায়েস খেতে শুরু করলেন। পায়েস খেতে খেতে সাধুর পেট ভরে গেল, কিন্তু তবু তিনি থামলেন না। তিনি পায়েস খেয়েই চলেছেন আর নিজের মনকে বলছেন, "ওরে মন, পায়েসে তোর এত লোভ যে আমাকে ধ্যান পর্যন্ত করতে দিসনে। কেবল পায়েস খাওয়ার জন্যে মুখিয়ে থাকিস। এবার দ্যাখ, তোকে জন্মের মতো পায়েস খাওয়াচ্ছি। দেখি তুই কত পায়েস খেতে পারিস।"

সাধু আকণ্ঠ পায়েস খেয়ে চলেছেন, খেতে কষ্ট হচ্ছে, তবু খাচ্ছেন। ক্রমে সব পায়েস বমি হয়ে গেল। তবুও তিনি থামলেন না। শেষে যখন বেহুঁশ হয়ে পড়বার উপক্রম হল, তখন তিনি খাওয়ায় ক্ষান্তি দিলেন। সেদিন থেকেই পায়েসের ওপর তাঁর লোভ চলে গেল। এমনকি পায়েসের কথা মনে হলেও

তখন তাঁর বমি আসত।

দেখো ভাই ভবেন, এই দৃষ্টান্তমূলক গল্প থেকে তুমি বুঝতে পারছ যে ভোগ দ্বারা ত্যাগ কীভাবে আসে। বিবেকি পুরুষ ভোগ দ্বারা ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে ভোগ-বাসনা দমন করাই উচিত। ভোগবাসনাকে দাবিয়ে রাখতে রাখতে তবেই দমিত হবে তখন আর ভোগবাসনা মনে উদয় হবে না। ভোগের শেষ নেই। তুমি যতই ভোগ করবে ভোগের তৃষ্ণা ততই বেড়ে যাবে। এই কারণেই বলা হয়—'তৃষ্ণাপি তরুণায়তে'। দেখো স্বর্গের রাজা ইন্দ্রেরও ভোগ তৃষ্ণার নিবারণ হয় না। তাঁর সম্পর্কে এক কাহিনী আমার মনে হয়েছে, বড় মজার এই পৌরাণিক কাহিনি।

লোমশ মুনির উপাখ্যান

রাজা ইন্দ্রের এক সভাগৃহ বানাতে হবে। তিনি বিশ্বকর্মাকে হুকুম করলেন—তুমি একটা খুব সুন্দর সভাগৃহ বানিয়ে দাও। বিশ্বকর্মা খুব সুন্দর করে সভাগৃহ বানিয়ে দিলেন, কিন্তু ইন্দ্রের পছন্দ হল না। তাই তিনি ভেঙে দিলেন। যতবার বিশ্বকর্মা সুন্দর করে সভাগৃহ তৈরি করে দেন, ততবারই ইন্দ্রের পছন্দ না হওয়ায় ভেঙে দিতে লাগলেন। বিশ্বকর্মা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, আমি ইন্দ্রের সভাগৃহ বানাতে পারব না। আমি যতবার বানিয়ে দিই ততবার পছন্দ না হওয়ায় তিনি ভেঙে দেন। এখন আমার কি উপায় হবে বলে দিন। ব্রহ্মা বললেন—আমি ইন্দ্রের কাছে যাচ্ছি, তুমি আমার সঙ্গে তাঁর কাছে চল। ব্রহ্মা ইন্দ্রের কাছে গিয়ে বললেন—আমরা মর্তলোকে যাচ্ছি, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।

ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও বিশ্বকর্মা তিনজনে মর্তলোকে এলেন। পথিমধ্যে লোমশ মুনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মুনির সর্বাঙ্গে লোম, কেবল বুকের উপর একটা টাকার মতো টাক রয়েছে। মুনি একটা গাছের তলায় বসে আছেন। গ্রীষ্মকালে রোদ্দুর, বর্ষাকালে বৃষ্টি, শীতকালে শিশির-এ সব মুনিকে সহ্য করতে হয়। এসব দেখে ইন্দ্র বললেন, হে মুনি, তুমি কেন তোমার থাকবার জন্যে একটা পর্ণকুটীর বানাচ্ছো না? একটা পর্ণকুটির থাকলে তোমার এত কষ্ট হতো না। মুনি হেসে বললেন, হে ইন্দ্র আমার পরমায়ু অতি অল্প। আমি তো কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবো। এই কারণে আমি পর্ণকুটির বানাইনি। তখন ইন্দ্র বললেন, তোমার পরমায়ু কতদিন আছে? লোমশ মুনি বললেন, এই যে আমার বুকের উপর

টাক পড়ছে, এই টাক যখন আমার সর্বাঙ্গে পড়বে তখন আমার মৃত্যু হবে। প্রতি মন্বন্তরে একজন করে ব্রহ্মার পতন হচ্ছে। ব্রহ্মার সাথে সাথে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ—সবারই ব্রহ্মার সাথে পতন হয়ে যাচ্ছে। সেই সময় আমার একটা করে লোম উঠে যায়। এভাবে আমার টাক পড়েছে। যখন সব লোম উঠে যাবে তখন আমার মৃত্যু হবে। আর ক'দিনই বা আমি বাঁচবো, তাই কার জন্যে আমি পর্ণকুটির বানাবো?

মুনির এরকম কথা শুনে ইন্দ্রের বড় বৈরাগ্য হল, ভাবলেন—আমার মতো কত ইন্দ্রের পতন হয়েছে, আর কত ইন্দ্র উৎপন্ন হয়েছে, তবে লোমশ মুনির একটা টাকার মতো টাক পড়েছে। এইভাবে সমস্ত লোম পড়ে গেলে তবে তাঁর মৃত্যু হবে। সেই আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে লোমশ মুনি গাছের তলায় বসে আছেন। আর আমি এমনই মূর্খ যে আমার জন্যে নিত্য সভাগৃহ তৈরি হচ্ছে আর আমার পছন্দ হচ্ছে না বলে আমি তা ভেঙে দিচ্ছি। আমি আর ক'দিন থাকবো? আমারও তো কিছুদিনের মধ্যে পতন হবে। তাহলে কার জন্য এত বড় সভাগৃহ বানাতে বলছি? তাই এবার যে সভাগৃহ তৈরি হবে আমি আর তা ভাঙবো না। সুতরাং বিচারের দ্বারা ইন্দ্রের ভোগ-ভাব দূর হয়ে গেল, তাঁর মনে ত্যাগের ভাব এসে গেল।

দেখো ভাই ভবেন, স্বর্গের রাজা ইন্দ্র, তারও ভোগ বাসনা পূরণ হওয়া মুস্কিল। ভোগদ্বারা ভোগ পূরণ হয় না, ত্যাগের দ্বারাই হয়। এইজন্যে আমার এই উপদেশ হল যে, তুমি তো গৃহী লোক, ভোগ থেকে তুমি কোথায় চলে যাবে? ভোগেই তোমাকে পড়ে থাকতে হবে। তাই তুমি অন্তরে নিবৃত্তি আর বাইরে প্রবৃত্তি নিয়ে থাকে। অন্তরে নিবৃত্তি আর বাইরে প্রবৃত্তি কী রকম? যেমন জনক প্রভৃতি রাজাগণ অন্তরে নিবৃত্তি রেখে বাইরে রাজত্ব ভোগ করে গেছেন। যেমন ব্যাসদেব, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ তো গৃহী ছিলেন, তাঁরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অন্তরে নিবৃত্ত ও বাইরে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা কত বড় জ্ঞানী ছিলেন, তাঁদের জ্ঞান শাস্ত্ররূপে আমাদের আজও জ্ঞান দান করে চলেছে। ঋষিগণ বাইরে প্রবৃত্ত কেন হয়েছিলেন? তাঁরা কেন বাইরে নিবৃত্ত হতে পারেন নি? হ্যাঁ, তাঁরা বাইরে নিবৃত্ত হতে পারতেন, কিন্তু নিবৃত্ত হননি, কেন হননি? এর উত্তর হল—অপরের উপকারের জন্যে অর্থাৎ ঋষিগণ যদি বাইরে নিবৃত্ত হয়ে বসে থাকতেন তাহলে আমরা এই অমৃতোপম জ্ঞানময় শাস্ত্র কোথা থেকে

পেতাম? ঋষিগণ প্রথমে অন্তরে এবং বাইরেও নিবৃত্ত হয়ে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা সমস্ত কিছু অনুভব করে নিয়ে পরে অপরের উপকারের জন্যে বাইরে প্রবৃত্ত হয়ে শাস্ত্র রচনা করেছেন। তাঁদের অনুভব সিদ্ধ বস্তুই শাস্ত্ররূপে তাঁরা আমাদের কল্যাণের জন্যেই দিয়ে গেছেন।

দেখো ভাই, তোমরা আমার কাছে আসছো, আমি যদি একদম অন্তর নিবৃত্তি আর বাইরেও নিবৃত্ত হয়ে বসে থাকি তাহলে আমি তোমাদের কিছুই উপকার করতে পারবো না। কিন্তু অন্তরে নিবৃত্তি হয়ে তোমাদের জন্যে বাইরে আমি প্রবৃত্তি হয়ে যাই, ফলে কত শোকাতুরা ব্যক্তি, রোগাতুর ব্যক্তি, দুঃখাতুর ব্যক্তি এখানে এসে সৎসঙ্গ প্রবচন শুনে শান্তি লাভ করে তারা এখান থেকে যায়।

অন্তর নিবৃত্তি আর বাইরে প্রবৃত্তি—এটাই হল শ্রেষ্ঠ কর্মপদ্ধতি। অন্তরে নিবৃত্তি আর বাইরেও নিবৃত্তি যার হয়ে থাকে তার দ্বারা সংসারের কিছু কল্যাণ হবে না। তবে তার নিজের কল্যাণ সাধন হবে, সে নিজে উদ্ধার হয়ে যাবে। এইজন্যে শাস্ত্রকার তিন প্রকার গুরুর কথা বলেছেন। প্রথমঃ তরণ গুরুঃ—তরণ-গুরু নিজে উদ্ধার হয়ে যান। কিন্তু অন্য কাউকে উদ্ধার করতে পারেন না। এদের অন্তরে আর বাইরে দু'দিকেই নিবৃত্তি। দুই ঃ তারণ গুরু—এর দৃষ্টান্ত হল এক ধরনের পণ্ডিত। তাঁরা তোমাকে বড় বড় জ্ঞানের কথা শোনাবেন, কিন্তু তাঁদের অন্তরটা অজ্ঞানে ভরা, একেবারে অন্ধকার। এইসব পণ্ডিত শাস্ত্র থেকে পরকে উদ্ধারের রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু নিজেদের তাঁরা উদ্ধার করতে পারবেন না। এইজন্যেই এদের বলা হয় তারণ গুরু, পরকে উদ্ধার করবার ক্ষমতা এদের থাকে। তৃতীয়ঃ তরণ-তারণ গুরু ঃ এ ধরনের গুরু অন্তরে নিবৃত্তি নিয়ে থাকেন, কিন্তু লোক-কল্যাণের জন্যে বাইরে প্রবৃত্তি রেখে দেন। নিজের সাধন বলে তিনি যা উপলব্ধি করেছেন, ভক্ত ও শিষ্যদের কল্যাণের জন্যে তিনি তাদের কাছে সেই উপলব্ধির উপদেশ দেন। এইভাবে নিজেরা সিদ্ধিলাভ করেন এবং নিজেরা পার হয়ে গিয়ে অপরকেও পার করে দেন অর্থাৎ অপরকেও উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

এই তিনরকম ছাড়া আর এক গুরু দেখা যায় যাদের অন্তরে প্রবৃত্তি, বাইরে নিবৃত্তি। এ তো হল মর্কট বৈরাগ্য। এ বড় খারাপ জিনিস। গীতা শাস্ত্রে একে 'মিথ্যাচার' বলা হয়েছে।

'মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে'

এই মিথ্যাচারীরা বাইরে খুব নিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখায়, কিন্তু অন্তরে ইন্দ্রিয় সেবায় ব্যস্ত থাকে। সাধারণ মানুষ এদের চিনতে পারে না, তাদের সেই নিবৃত্তির ভান দেখে ভুলে গিয়ে তাদের গুরু করে নেয়। এইসব গুরু নিজেরাও নরকে যায়, শিষ্যদেরও নরকে নিয়ে যায়। তাদের উদ্ধার হবে না।

"প্রবৃত্তিঃ বেশভূতানাং
নিবৃত্তিস্তু মহৎ ফলা।"

প্রবৃত্তিতে কিছু আরাম নেই, নিবৃত্তিতে অনেক ফল পাওয়া যায়। দেখো ভাই ভবেন, অন্তরে নিবৃত্তি হও আর বাইরে প্রবৃত্তি হও—এই আমার উপদেশ। বাইরে নিবৃত্তি মানুষের কোথা থেকে হবে? বাইরের বস্তু তুমি যদি সব ছেড়ে দাও তাহলে শরীর ধারণের জন্যে খাওয়া দাওয়া কী করে সম্ভব হবে, আর খাওয়া দাওয়া না করলে তো শরীর টিকবে না। আমি যখন হিমালয়ে পরিব্রাজনরত ছিলাম তখন এমন এমন সাধু দেখেছি—যে সাধু দিগম্বর হয়ে ময়দানে পড়ে রয়েছে, তার শরীরের ওপর ধুলো পড়ছে, বৃষ্টি পড়ছে, ওই সাধু খাবার দাবারের কোন চেষ্টাই করছে না। কিন্তু সাধুভক্ত মানুষ যখন সাধুর মুখে খাবার দিচ্ছে তখন সে খেয়ে নিচ্ছে। এইভাবে সে শরীর ধারণ করে আছে। দেখো, সাধুর মুখে একজন মানুষ খাবার দিল, কিন্তু সাধুকে ওই খাবার চিবোতে ও গলা দিয়ে নামাতে হল। এই স্থূল শরীরটা ভোগ বিনা টিকে থাকে না। এই শরীরকে কিছু আহার দিতেই হবে। ঈশ্বর এক চালে সব সংসারকে বেঁধে রেখেছেন—তা হল 'আহার'। আহার করতে যদি না হোত তাহলে কাউকে কারোর অপেক্ষায় থাকতে হোতো না। এই আহারের জন্যেই একজন অপরজনের অধীনে থাকে। কত সাধকলোক আমাকে বলে থাকে—আমি কর্মশূন্য হয়ে থাকতে চাই। আপনি এ বিষয়ে উপদেশ দিন। আমি তাদের বলি, আমার কাছে কর্মশূন্য হয়ে যাবার কোন উপদেশ নেই। তুমি সমস্ত কর্ম ত্যাগ করতে পারবে না। প্রাণ-কর্ম তো প্রাণীমাত্রেই করতে হবে। প্রাণ-কর্ম হল শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলা আর গ্রহণ করা—এ-ও তো এক কর্ম। দেখো ভাই, কবিতার একটি পদ আছে—

'বাড়তে বাড়তে বাড় গিয়া
হাতী ঘোড়া জিন।

ঘটতে ঘটতে ঘট যায়
কর করোয়া কৌপিন।'

কাজ বাড়ালেই কাজ বেড়ে যাবে। তখন কত জিনিসের দরকার হবে তোমার। হাতী চাই, ঘোড়া চাই, ঘোড়ার পিঠে দেবার জন্যে জিন চাই। আবার সাধু হয়েও যদি কাজ বাড়াতে থাকো, তাহলে হাতে কমণ্ডলু নিতে হবে, কৌপিন ধারণ করতে হবে। কাজ বাড়ালেই কাজ বাড়বে। তাই আমার উপদেশ—যে শুভ কাজ তোমার সামনে এসেছে তা ভালোভাবে সম্পন্ন করবার চেষ্টা করো। কাজের ফলের দিকে নজর দিয়ো না। কাজের ফলাফলকে ভগবানের উপর ছেড়ে দাও। এখানে অন্তর নিবৃত্তি, বাইরে প্রবৃত্তি এই ভাব বজায় রাখতে হবে। অন্তরে কিছু ফলাকাঙ্খা রাখবে না, বাইরে কাজ করে যাও।

'অন্তর নিবৃত্তি বাহারমে প্রবৃত্তি'

এই ভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই ভাব অবলম্বন করে কাজ করে যাও। সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরকে অর্পণ করে দাও।

ভবেন ঃ মহারাজ, ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না। মনে মনে যখন ঈশ্বরের ধ্যান করি তখন দেখি তিনি কত দূরে রয়েছেন। এইজন্যে আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারি না।

শ্রীশ্রীগুরু — না ভাই, ঈশ্বর তো আমাদের খুব কাছেই রয়েছেন — হস্তামলকবৎ অর্থাৎ হাতের মুঠোর মধ্যে আমলকী থাকলে যতটা নিশ্চিত ও কাছে মনে হয়, তেমনি ঈশ্বরও তোমার মধ্যে খুব কাছেই রয়েছেন। আর যদি তুমি মনে কর যে ঈশ্বর দূরে রয়েছেন, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। এ সম্পর্কে একটি দোঁহা আছে ঃ-

জলমে বৈঠে কমলিনী সূর্য বৈঠে আকাশ।
যো যিসকো হৃদয়মে বৈঠে, ওহি উসিকো পাশ।।

দেখো ভাই ভবেন, ভালবাসার কী সুন্দর দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হয়েছে। সরোবরে পদ্মফুল রয়েছে। আর কোথায় দূর আকাশে রয়েছে সূর্যদেব। সূর্যের প্রতি পদ্মের কী মধুর ভালবাসা। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পদ্ম তার সমস্ত পাপড়ি মেলে ফুটে ওঠে, আর সূর্য অস্ত গেলেই পদ্মের পাপড়িগুলি আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। দেখো ভাই ভবেন, ভালবাসা কোনো দূরত্ব মানে না। যে ভালবাসতে জানে তার প্রেমের পাত্র যতদূরেই থাকুক না কেন, তার প্রতি

আকর্ষণ, ভালবাসা সদাসর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকে, কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। ঈশ্বরকে যদি তুমি সত্যিই ভালবাসতে পারো, তিনি দূরে থাকলেও তাঁর নাম স্মরণ মাত্রেই তোমার হৃদয়পদ্ম আপনা থেকেই বিকশিত হয়ে উঠবে। দেখো ভাই, এর এক দৃষ্টান্ত আছে।

পুত্র শোকাতুরা মাতা

বহুদিন হল এক মায়ের একমাত্র পুত্র মারা গেছে। তার সঙ্গে আর দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, পুত্র কতদূর চলে গেছে, কোনো পাত্তাই নেই। পুত্রের মরদেহ চিতায় ভস্ম হয়ে গেছে—এ সবই মায়ের জানা আছে। কিন্তু যখনই পুত্রের নাম স্মরণ হয় তখনই মায়ের চোখের জল দরদর করে বেরিয়ে আসে। এর কারণ কী? এর কারণ হল ভালবাসা।

মায়ের বুকে সদাসর্বদা পুত্র প্রেমই জাগ্রত থাকে। ভালবাসার মৃত্যু নেই, দূরত্ব নেই। ভালবাসা একবার এসে গেলে তা আর চলে যায় না। তুমি যদি একবার ঈশ্বরকে ভালবাসো, তাহলে সেই ভালবাসা অজর অমর হয়ে হৃদয়ে বসে যাবে, আর উঠে যাবে না। ঈশ্বর যেখানেই থাকেন সেখানেই মঙ্গল হয়, কোন ক্ষতি হয় না। দেখো ভাই ভবেন, মাতার প্রেম বড়ই নিঃস্বার্থ প্রেম।

"মাতা বিনা কোন্ আদর করে
বর্ষা বিনা কোন্ সাগর ভরে।।"

মাতার প্রেম ভালবাসা বৃষ্টির মতো স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ অনায়াসলব্ধ হয়, এ রকম নিঃস্বার্থ ভালবাসা আর কিছু নেই। নিঃস্বার্থ প্রেমই অমৃত। এই প্রেম পাঁচ ভাগে বিভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের জীবনীতে এই পঞ্চ প্রেমের ভাব খুব সুন্দর করে লেখা আছে। যেমন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর মধুর। শান্ত প্রেম কী রকম? পুত্র পিতাকে ভালবাসে' প্রজা রাজাকে, শিষ্য গুরুকে ভালবাসে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উপর যোগী ঋষিগণের এরকম শান্ত প্রেম ছিল। দাস্য প্রেম কী রকম? যেমন ভৃত্য প্রভুকে ভালবেসে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উপর নারদের এরকম দাস্য প্রেম ছিল। হে ভগবান, তুমি আমার প্রভু আমি তোমার দাস—এই 'দাসোঽহম্' ভাব বড় মিষ্টি। এইভাব নিয়ে নারদ জীবনমুক্ত হয়েছিলেন, আর নারদের হৃদয় একেবারে মধুভরা হয়ে গিয়েছিল।

সখ্য প্রেম কী রকম? যেমন সখার প্রতি সখার ভালবাসা হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উপর ব্রজ বালকদের এইভাব ছিল। অর্জুনের, উদ্ধবের এই ভাব

ছিল।

বাৎসল্য প্রেম কী রকম? যেমন পিতামাতার পুত্রের প্রতি হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উপর পিতা নন্দ, মাতা যশোদার এই ভাব ছিল। বাৎসল্য প্রেমের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এঁনাদের মধ্যে দেখা গেছে।

মধুর প্রেম কী রকম? যেমন পতির প্রতি পত্নীর হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উপর ব্রজ-গোপিকাগণের এরকম ভাব ছিল। রক্মিনী প্রভৃতি মহিষীগণেরও এই ভাব ছিল।

দেখো ভাই ভবেন, কোন সাধক ভক্তিমার্গের আশ্রয় নিলে তাকে এই পঞ্চ প্রেমের বা ভাবের যে কোন একটি আঁকড়ে ধরে ঈশ্বরের আরাধনা করতে হবে। ভক্তি বা প্রেমের মাধ্যমে যে সাধক ঈশ্বরের আরাধনা করে তার সাধনা খুব সুগম হয়ে থাকে। আর জ্ঞানের মাধ্যমে যে আরাধনা করে থাকে তার সাধনা বড়ই কঠিন। সাধক দু'প্রকারের হয়ে থাকে। এক নিষ্কাম, আর এক হল সকাম। সকামের চেয়ে নিষ্কাম সাধক শ্রেষ্ঠ। সকাম সাধকের প্রেম স্থায়িত্বহীন। যতক্ষণ পর্যন্ত তার কামনা পূর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্তই তার প্রেম, কামনা পূর্ণ হয়ে গেলেই তার ছুটি হয়ে গেল। আর সে ভগবানকে ডাকবে না। আমার কাছে বহু সকামী লোক এসে বলে, বাবা আমার ছেলের বড় অসুখ। 'আশীর্বাদ' করুন যেন সে ভালো হয়ে যায়। কেউ বলে বাবা, আমার একটা মামলা চলছে, মামলায় যেন জিততে পারি সেই আশীর্বাদ করুন। আমি দেখতে পাই—এই সব সকাম লোকেদের ভক্তি টেঁকে না। তাদের কামনা পূর্ণ হলেই তারা চলে যায়। তারা সরে পড়ে, কামনা পূর্ণ না হলেও চলে যায়। তারা ভাবে, এতদিন স্বামীজীর কাছে যাতায়াত করছি লাভ তো কিছুই হল না, বৃথা এখানে এসে কী হবে? যাদের কামনা পূর্ণ হয় তারাও আর আসে না। ভাবে, কামনা যা ছিল তা তো মিটেই গেছে, আর এখানে আসার দরকার নেই। এই কারণে নিষ্কাম সাধক বা ভক্তই শ্রেষ্ঠ। তারা কখনো এভাবে চলে যায় না। পুরাণে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। নিষ্কাম ভক্তকে ভগবান কত রকমের দুঃখ দুর্দশায় ফেলে তাকে পরীক্ষা করে দেখেন, সে কিন্তু তার মধ্যেই অচল অটল ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ভেঙ্গে পড়ে না। দেখো ভাই ভবেন, নিষ্কাম সাধকদের জন্যে একটি বাংলা দোঁহা আছে। আমি তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি—

"যে করে আমার আশ
আমি করি তার সর্বনাশ।
তবুও যদি করে আশ
আমি হই তার দাসের দাস।।"

এই পদের তাৎপর্য নিয়ে একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প আছে, গল্পটি তোমাকে শোনাচ্ছি—

বুড়ির গরু মরার গল্প

এক বুড়ি ব্রাহ্মণী, বড় ভক্তিমতী। সাধন ভজন নিয়েই তার দিন কাটে। পতি পুত্র সবাই তার মারা গিয়েছিল। তবু সে শোকাতুর হয়নি। ভগবানের ভজনে ও সেবায় সে ডুবে থাকে। খাওয়া পরারও বেচারীর সংস্থান নেই। থাকবার মধ্যে একটি মাত্র সম্পত্তি, তা হল একটি গরু। সেই গরুটি দুইয়ে সকালে যেটুকু দুধ পায় তা দিয়ে বুড়ি অতিথি সৎকার করে, আর সন্ধেবেলা যেটুকু দুধ হয় তা আপন ইষ্টদেবকে নিবেদন করে প্রসাদরূপে গ্রহণ করে। এইভাবে কোনোমতে বুড়ির দিন কেটে যায়।

একদিন দেবর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠে গিয়ে ভগবানকে বললেন, "হে ভগবান, মর্তলোকে দেখে এলাম, আপনার পরমভক্ত এক বৃদ্ধা রয়েছে, তবে তার খাওয়া পরার কোন সংস্থান নেই। আপনি তার উপর একটু কৃপা করুন।" শুনে ভগবান হেসে বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয় তাকে কৃপা করব, তা তুমিও চল, দুজনে একসঙ্গে তার কাছে যাই।" ভগবান তখন নারদকে সঙ্গে নিয়ে মর্তলোকে নেমে এলেন এবং ছদ্মবেশ ধারণ করে বুড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলেন। ভগবান এসেছেন বুড়ি তো কিছুই বুঝতে পারল না, তবে অতিথি এসেছেন এই মনে করে নিজ হাতে তাঁদের পা ধুইয়ে দিল, বসবার জন্যে কুশাসন পেতে দিল, তারপর দুধ জ্বাল দিয়ে সেই দুধ দই অতিথিকে খেতে দিল। অতিথিরাও সেই দুধ পান করে পরম পরিতৃপ্ত হলেন। যাবার সময় ভগবান অর্ধস্ফুট স্বরে বুড়িকে বলে গেলেন, "বুড়িমা, তোমার সেবায় আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি আর আমি তোমাকে বর দিয়ে যাচ্ছি তোমার একমাত্র সম্পদ গরুটিও মরে যাক্।।"

নারদ তো ভগবানের এই অন্যায় অবিচার দেখে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন মনে মনে। ভাবলেন, এ কীরকম হল! ভক্তিমতী বুড়ি আন্তরিকভাবে এত সেবা করল আর তার প্রাণধারণের একমাত্র সম্বল গরুটি 'মরে যাক' এই হল কিনা

বরদান! কিন্তু ভগবানের মুখের উপর তিনি আর কী বলবেন? তিনিই তো দুনিয়ার মালিক। তার মুখের উপর কি আর কথা বলা চলে? এই ভেবে নারদ চুপ করে গেলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বুড়ির জন্যে তাঁর দুঃখ হতে লাগল।

এরপর ভগবান নারদকে নিয়ে এক ধনী গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে বললেন, "আমরা ক্ষুধার্ত অতিথি, আমাদের কিছু খেতে দাও।" শোনামাত্র সেই ধনী গৃহস্বামী তাঁর দারোয়ানকে ডেকে আদেশ দিলেন, "এদের দুজনকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দাও।" হুকুম শুনে অতিথিরা সেখান থেকে চলে গেলেন। যাবার সময় ভগবান গৃহস্বামীকে বর দিয়ে গেলেন, "তোমার ধন ঐশ্বর্য আরও বেড়ে যাক্।"

তখন নারদ আর চুপ থাকতে পারলেন না, বললেন, "ভগবান, এ আপনার কেমন বিচার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বুড়ি আপনার এত সেবা যত্ন করল, তাকে আপনি বর দিলেন—তার একমাত্র সম্বল গরুটি মরে যাক, আর এই ধনী লোকটি আমাদের গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দিল, তার ওপর আপনি প্রসন্ন হয়ে বর দিলেন, তার আরও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হোক!" নারদের কথা শুনে ভগবান হাসতে হাসতে বললেন, "দেখো নারদ। তুমি এতদিনেও আমার ভাব ঠিক ধরতে পারলে না। এই যে ধনী লোকটি, এ ঐশ্বর্যের অহংকারে উন্মত্ত। সেই কারণেই তাকে বর দিলাম—তার ধনসম্পদ আরও বৃদ্ধি হোক, ঐশ্বর্যে সে একেবারে ডুবে যাক, যাতে আমার কাছ থেকে একেবারে দূরে চলে যায়। আর এই যে বুড়ি, এ সর্বক্ষণ আমার ভজনা করে থাকে, তার মনের গতি যেন একসূত্রে গাঁথা হয়ে আমার চরণে এসে লগ্ন ও বিলীন হয়ে আছে। কিন্তু ওর সামান্য চিত্তচাঞ্চল্যের একটিই কারণ, ঐ ওর গরুটি। বুড়ির মন মাঝে মাঝে ঐ গরুর দিকে চলে যায়, আর সেই কারণেই আমি ওকে বর দিলাম—ওর গরুটি মরে যাক্। গরুটি মরে গেলে ওর মন ষোল আনা আমাকেই দিতে পারবে। তাহলেই বুড়ি মুক্তি লাভ করবে। এবার বুঝলে তো—কেন আমি দুজনকে দু'রকম বর দিলাম।

দেখো ভাই ভবেন, নিষ্কাম ভক্তের প্রতি ভগবান কীরকম পরীক্ষা করলেন। বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে তো বুড়ির সর্বনাশ ঘটে গেল। ঐ গরুর দুধটুকু দিয়ে সে অতিথি সৎকার করতো, নিজের প্রাণধারণও করত। সেই গরুটাও মারা গেল। কিন্তু ভিতরের দিক দিয়ে দেখলে তার বড় কল্যাণ হল।

নিষ্কাম ভক্তের জন্যে ভগবান কিছু বিভূতি দেন না। সকাম ভক্তকে বিভূতি দেন আর নিষ্কাম ভক্তকে ভগবান নিজেকেই দিয়ে দেন। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর কাহিনী আছে, তোমাকে শোনাচ্ছি—

এক সমৃদ্ধশালী রাজা ছিলেন। তাঁর অনেকগুলি রানী। একবার সেই রাজাকে অন্য এক রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে হল। যাবার আগে তিনি রানীদের কাছে দূতীদের পাঠালেন—জানতে চাইলেন যুদ্ধ জয় করে যখন ফিরবেন তখন কোন্ রানীর জন্যে কী কী জিনিস আনতে হবে। প্রত্যেক রানী দূতীর হাত দিয়ে তাদের পছন্দমতো জিনিসের নাম লিখে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল। রাজা একবার ফর্দগুলি দেখে নিলেন। কিন্তু ছোটোরানীর ফর্দ দেখে তিনি তো অবাক। তাতে একটি ১ চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই লেখা নেই। রাজা তখন মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, "দেখো মন্ত্রী, রানীরা প্রত্যেকে কতরকম জিনিস চেয়ে ফর্দ পাঠিয়েছে। আর ছোট রানীর কান্ডকারখানা দেখো। সে শুধু কাগজে ১ সংখ্যা লিখে পাঠিয়েছে। ওর বুদ্ধিশুদ্ধি কি কিছু নেই?" মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ রানীদের মধ্যে ছোটরানী হলেন সবচেয়ে বুদ্ধিমতী, তিনি আপনার নিষ্কাম ভক্ত। রাজসভায় সকলের সামনে তিনি তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করতে চান না, তাই তিনি কাগজে ১ লিখে আপনাকে ইঙ্গিত জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি আপনার কাছ থেকে অন্য কোন জিনিস চান না, তিনি একমাত্র আপনাকেই চান।"

রাজা যুদ্ধে চলে গেলেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজধানীতে ফিরবার সময় রানীদের জন্যে নানারকম জিনিসপত্তর সঙ্গে নিয়ে এলেন। রানীদের ঘরে ঘরে তাদের পছন্দমতো জিনিস পাঠিয়ে দেওয়া হল, আর রাজা নিজে এলেন ছোটরানীর ঘরে। রানীকে তিনি বললেন, "তুমি আমার কাছে যা চেয়েছিলেন, আমি তাই এনে তোমাকে দিলাম। তুমি তো অন্য কিছু চাওনি, একমাত্র আমাকেই চেয়েছিলে। আমিও তাই নিজেকে তোমারই হাতে সঁপে দিলাম।"

ছোটরানীর মহলে তখন আনন্দের রোল পড়ে গেল। রাজার সঙ্গে সঙ্গে রাজার যত বৈভব যত ঐশ্বর্য সব কিছুই ছোটরানীর মহলে এসে গেল, জিনিসপত্রের আর অভাব রইল না।

দেখো ভাই ভবেন, এই গল্পের তাৎপর্য হল—পরমাত্মারূপী রাজার কাছে কিছু চেয়ো না, শুধু রাজাকেই চেয়ো। রাজাকে পেলে সঙ্গে সঙ্গে তার অষ্টসিদ্ধিরূপী সম্পদ, বিভূতি সবই লাভ হয়ে যায়। নিষ্কামী সাধক কিছু চায়

না, কিন্তু তার সব কামনা আপনা থেকেই পূরণ হয়ে যায়। কত লোক আমাকে এসে বলে ভগবানকে আমি তো কত ডাকি কিন্তু তাকে পাই না, এর কারণ কী? আমি বলি 'সূচকা দান' 'আবরণকা আশা' অর্থাৎ তুমি দেবে মাত্র একটি ছুঁচ আর আশা করবে যেন সব আবরণ হয়ে যায় অর্থাৎ ঢাকা পড়ে যায়। সূচাগ্র পরিমাণ দিয়ে কি সেই সর্বব্যাপক পরমাত্মাকে লাভ করা যায় কখনো? তুমি তার না হলে, তোমার সর্বস্ব তাঁকে না দিলে তিনি তোমার হবেন কেন? তুমি যখন তাঁর হয়ে যাবে। তখন তিনিও তোমার হয়ে যাবেন। নইলে দু-চারবার ভগবানের নাম নেবে আর তাঁকে পেয়ে যাবে—সে তো ভাই হবে না।

ভবেন ঃ হ্যাঁ মহারাজ, আমাদের ভগবানকে ডাকার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে—এই কারণে আমরা ভগবানকে পাই না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ আচ্ছা ভবেন, তোমার সঙ্গে আজ অনেকক্ষণ ধরে সৎসঙ্গ হল, এখন আমার ওঠবার সময় হয়েছে। এখন সৎসঙ্গের ঝাঁপ ফেলে দাও। পরে আবার খোলা হবে।

ভবেন ঃ মহারাজ, সৎসঙ্গ হল অমৃত। এতক্ষণ ধরে তার মধুর আনন্দ যেন পান করলাম। এত বেলা হয়ে গেছে তা আমরা বুঝতে পারিনি।

ভবেনবাবুর সঙ্গে আজকের এই সৎসঙ্গ যখন হচ্ছিল তখন আমরা বহু লোক সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং সকলেই এই সৎসঙ্গ শুনে তৃপ্তি লাভ করেছিলাম।

সপ্তম পর্ব

স্থান—রান্নাবাড়ির দালান ঃ ১৩৪০ সাল :

পৌষ মাস : সময়—বিকেল

শ্রী প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সৎসঙ্গ

[কাশীতে মৃত্যু হলে মুক্তি হয়—এটা কি অন্ধ বিশ্বাস না এর পেছনে কোন যুক্তি আছে ঃ কেউ মৃত্যুকে ভয় পায় আবার কেউ মৃত্যুতে আনন্দ করে ঃ চতুরের স্বর্গবাস ঃ পুণ্যের দ্বারা পাপের খণ্ডন হয়? পাপের প্রতিকারে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন বা গৃহদেবতার পুজোয় কি কোন ফল হয় ঃ রোগ-শোক নিবারণের উপায় ঃ 'দুঃখ পাইয়ে তো সুখ লাগাইয়ে', এই প্রসঙ্গে সুবর্ণ কৌটোর গল্প]

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই প্রাণগোপাল, আজ তোমাতে আমাতে খুব লড়াই হবে। হাতাহাতি হবে না ভাই, কিন্তু 'বাতাবাতি' অর্থাৎ কথা কাটাকাটি হবে। আমার একটা প্রশ্ন আছে, তার উত্তর তোমাকে দিতে হবে। শাস্ত্রে লেখা আছে, কাশীতে মরলে মুক্তি হয়, এর পিছনে অন্ধ বিশ্বাস কাজ করে যাচ্ছে অথবা এ কথার পিছনে কোন যুক্তি আছে?

প্রাণগোপাল ঃ মহারাজ, যুক্তি এর কিছু নেই। অন্ধবিশ্বাস করতে হবে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ অন্ধ বিশ্বাস তো সব মানুষ মানবে না। অবিশ্বাসী মানুষকে কিছু যুক্তি তো দিতেই হবে। আমার মনে একটি যুক্তি এসেছে। শস্য প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য সব জমিতে হয় না, উর্বর জমিতেই হয়ে থাকে। যে জমি কঠিন ও রসশূন্য অর্থাৎ জলের অভাব, সেই রকম জমিতে যতই বীজ বপন কর না কেন, অঙ্কুর গজাবে না। এই দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে পারা যায় কাশী স্থানটি কিছু রসশূন্য কঠিন স্থান, উষর ভূমি—যেখানে মানুষ মারা গেলে আর জন্মাবে না। মানুষ তো ফসলের মতোই হয়ে থাকে। মরে যাচ্ছে আবার জন্মাচ্ছে। দেখো, ভগবান শঙ্করাচার্য কি লিখেছেন —

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং,
পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্। (চর্পট পঞ্জরিকা স্তোত্র)

এর তাৎপর্য হল, মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করছে, বার বার মরে যাচ্ছে। ফসলও এরকমভাবে ফলছে, আবার মরে যাচ্ছে, আবার জন্মাচ্ছে

"মরনা মরনা সবকোই কহে
মরভিনা জানে কোই
এ্যায়সি মর্না যো মরে
ফেরনা আবন হোই।।"

অর্থাৎ সবাই মরার কথা বলে, কিন্তু মরতে জানে কজন। এমনভাবে মরতে হবে, যাতে আর ফিরে আসতে না হয়।

দেখো ভাই প্রাণগোপাল, সাধারণভাবে মরে গেলে কোন লাভ নেই। এমনভাবে মরতে হবে, যাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয়। এজন্যেই বলা হয়—

"ন স পুনরাবর্ততে।"

অর্থাৎ মানুষ মরে গেলে আর যেন পুনরাবৃত্তি না হয়।

"মরনে হি সে জগ ডরে।
মেরে মন আনন্দ।।
মরনে হি সে পাইয়ে
পূর্ণ পরমানন্দ।।"

এই দোঁহার তাৎপর্য হল—কোন কোন মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে না, বরং আনন্দ পায়। কিন্তু জগৎ সংসারের প্রায় সবাই মৃত্যুকে ভয় করে থাকে, এর কারণ কি! একই মৃত্যু, কিন্তু কেউ একে ভয় করে, কেউ আবার আনন্দ পায়। এর কারণ হল—আমার মনে হয়, যে মানুষের মধ্যে পুণ্যের অংশ বেশি, যাদের কিছু জ্ঞান অর্জন হয়েছে—তারাই মৃত্যুকে ভয় পায় না। আর যাদের মধ্যে পাপের অংশ বেশি, অজ্ঞানতা বেশি তারাই মৃত্যুকালে ভয় পায়। মানুষের পাপের দ্বারা পুণ্য খণ্ডন হয় না, তেমনি পুণ্যের দ্বারাও পাপের খণ্ডন হয় না। পাপের ফল ভোগ করতেই হবে। মানুষ বহু পাপ করল আর মনে মনে ভাবল—আমি বহু পুণ্য করব, তাতে আমার পাপের খণ্ডন হয়ে যাবে, ও তো ভাই হবে না। দেখো ভাই প্রাণগোপাল, এই ভাব নিয়ে একটি বড় মজার গল্প আছে।

চতুরের স্বর্গবাস

এক ব্যক্তি বহু পাপ করেছিল—এর ফলে তার অনেক দিন নরক বাস হবে,

অবশ্য কিছু পুন্য কাজও করেছিল, যার ফলে অল্প সময়ের জন্য তার ভগবানের দর্শন হবে। কিছুদিন বাদে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হল। যমদূত এসে তাকে বলল, দেখো তুমি নরকে অনেক দিন থাকবে, কেননা তুমি বহু পাপ করেছ। কিন্তু কিছু পুণ্যও তোমার আছে, যার ফলে অল্প সময়ের জন্য তোমার ভগবৎ দর্শন হবে। তুমি আগে ভগবৎ দর্শন করবে না আগে নরক ভোগ করবে? তোমার কি অভিপ্রায় তা আমাকে বলো। লোকটি তখন যমদূতকে বলল, আমি তো তীব্র পুণ্য অর্জন করেছি যার ফলে আমার ভগবৎ দর্শন হবে। ওই পুণ্যের দ্বারা আমার পাপকে খণ্ডন করে দাও। যমদূত বলল, আমার যমরাজের এমন আইন নেই। পাপের দ্বারা পুণ্যকে খণ্ডন করা যাবে না, আবার পুণ্যের দ্বারা পাপকে খণ্ডন করা যাবে না। পাপের ফল ভোগ করতে হবে। পুণ্যের ফলও ভোগ করতে হবে। এখন তুমি বল, আগে পাপের ফল ভোগ করে নেবে, না আগে পুণ্যের ফল ভোগ করে নেবে। তখন পাপী লোকটি বলল—ভাই আমার তো বহু পাপ হয়েছে। আমাকে তো বহুদিন নরকে থাকতে হবে। তাই আগে পুণ্যের ফল ভোগ করে নেয়াই শ্রেয়। আগে আমাকে ভগবৎ দর্শন করিয়ে দাও। যমদূত অনেক করে তাকে বলল, আগে দুঃখ ভোগ করে নেয়াই ভাল, তাই নরক ভোগ আগে করে নাও। তারপরে ভগবৎ দর্শন করবে। পাপী লোকটি বলল, না ভাই আমি আগে ভগবৎ দর্শন করবো। তাই হল—যমদূত তাকে প্রথমে স্বর্গে নিয়ে গিয়ে ভগবৎ দর্শন করিয়ে দিল। এরপর যমদূত বলল, এখন তোমার ভগবৎ দর্শন হয়ে গেছে, এবার তুমি আমার সাথে এস। তখন ওই পাপী ব্যক্তি বলল, আরে মূর্খ যমদূত, তোমার কোন বুদ্ধি নেই, আর আমার পাপ কোথায়, কোটি কোটি জন্মের পাপরাশি ভগবৎ দর্শনে নাশ হয়ে গেছে, আমার পাপ আর নেই। ভগবৎ দর্শনে আমি নিষ্পাপ হয়ে গেছি। এখন কী রীতিতে নরকে যাব। এই বলে সে ভগবানের চরণ আঁকড়ে ধরল। তখন যমদূত কী করবে, অবস্থা দেখে যমদূত সেখান থেকে চলে গেল। ভগবান তাকে স্বর্গবাসের হুকুম দিয়ে দিল। ভগবানের হুকুম কে অমান্য করবে? চতুর উপায়ে লোকটির স্বর্গবাস হয়ে গেল, নরকে তার আর যেতে হল না।

প্রাণগোপাল ঃ—মহারাজ, আপনি বললেন যে পুণ্যের দ্বারা পাপের খণ্ডন হয় না। কিন্তু আপনার এই দৃষ্টান্তমূলক গল্প থেকে বোঝা গেল নরক যন্ত্রণাও

খণ্ডন হয়ে যায়। ভগবানের পা আঁকড়ে ধরতে পারলে আর পাপ থাকে না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ ভাই, পাপীর জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করার যে বিধি আছে, তা থেকে এই সিদ্ধান্ত হয় যে পাপের কিছু কিছু খণ্ডন হয়, তা না হলে শাস্ত্রকারগণ প্রায়শ্চিত্ত করার বিধি কেন দিয়েছেন? পাপের সবটা খণ্ডন হয় না, কিন্তু কিছু কিছু খণ্ডন হয়। দেখো, সংসারে যত রোগ শোক দুঃখ হয়ে থাকে, এ সব পাপেরই ফল। রোগ নিরাময়ের জন্যে ডাক্তার পুরুষকার প্রয়োগ অর্থাৎ চেষ্টা করে, তার জন্যে রোগীকে ওষুধ খাওয়ায়। জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিতলোক শান্তির জন্যে গ্রহশান্তি স্বস্ত্যয়ন প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি করে থাকে।

রোগ দু'রকমের হয়। এক প্রারব্ধিক যা প্রারব্ধ থেকে হয় আর এক আগন্তুক। প্রারব্ধিক রোগ ওষুধ খাওয়ালে সারে না, তার জন্যে দৈবের ব্যবস্থা করতে হয়। আগন্তুক রোগের ক্ষেত্রে কিছু শারীরিক নিয়ম পালন করতে হয়, কিছু ওষুধও খাওয়াতে হয়, তাতেই আগন্তুক রোগ সেরে যায়। কিন্তু মানুষ তো জানে না কোন রোগটা প্রারব্ধিক আর কোন্ রোগটা আগন্তুক। তাই রোগ হলে ডাক্তারও দেখাও আবার শান্তি-স্বস্ত্যয়নও করাও।

শারীরিক রোগের নাম ব্যাধি আর মানসিক রোগের নাম আধি। শারীরিক ব্যাধি দূর করার কথা তো হল। এখন কথা হল মানসিক আধি দূর হবে কেমন করে? এই প্রশ্নের উত্তর হল মনকে ভাগ করে দাও। মনের যে দুঃখকর বৃত্তি, তাকে ঘুরিয়ে দাও। যে ব্যক্তি সাধক তার প্রতি উপদেশ হল, তোমার মনকে ইষ্টচিন্তায় লাগিয়ে রাখতে পারলে তোমার মনের দুঃখ দূর হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বলতে হয়, যেমন করে পারো মনকে ভুলিয়ে রাখো। তোমার শোক হয়েছে, পুত্র মারা গেছে, তাহলে যাও তীর্থদর্শন করে এসো। নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে, তীর্থসেবা, দেশসেবা করতে করতে অনেকদিন কেটে যাবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোকও দূর হয়ে যাবে। তাই শোকের সময় তীর্থভ্রমণের বিধি আছে।

বিচারের দ্বারা আধি বা শোকের হাত এড়ানো যায়। শোকের সময় বিচার করতে হয় যে ভগবান আমার মহাজন, সেই মহাজনের কাছে আমি পাপরূপী ঋণ করেছি, সেই ঋণের ফল যে দুঃখ তা আমাকে ভোগ করতে হবে। দুঃখ শোক যতই আসুক মনে জানবে যে আমার পাপের ঋণ শোধ হয়ে যাচ্ছে।

এবার আমি ক্রমশঃ নিষ্পাপ হয়ে যাব। এখানে একটা কথা বলা দরকার। ভগবান এমন দয়ালু মহাজন যে একেবারে সমস্ত ঋণ তিনি একসঙ্গে উসুল করেন না। কিস্তিবন্দি করে আদায় করেন। এক সঙ্গে সমস্ত ঋণ যদি পরিশোধ করতে হোতো তাহলে আমাদের দুর্দশার অন্ত থাকতো না। ভগবান তো তা করেন না, কিস্তিতে কিস্তিতে ঋণশোধের ব্যবস্থা করে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তাই কখনো আমরা সুস্থ শরীরে আরামে থাকি, আবার কখনো রোগ শোকে দুঃখকষ্টে কাতর হই। এইভাবে কিস্তিতে কিস্তিতে পাপের ঋণ শোধ করতে হয় বলে তাঁর কাছে যে মূল ঋণ সেটাও আস্তে আস্তে শোধ হয়ে যায়। আমাদেরও খুব বেশী অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় না।

প্রাণগোপাল ঃ মহারাজ, পরমাত্মাদেব যখন এতই দয়াময় তখন সমস্ত ঋণটাই তিনি মাপ করে দেন না কেন?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই, কিছু কিছু তো তিনি ছেড়ে দেন। মূল ঋণ ছাড়েন না বটে, তবে সুদ তো তিনি মাপ করে দেন।

প্রাণগোপাল ঃ— মহারাজ, মূল যখন ছাড়বেন না, তখন সুদ ছাড়লে লাভটা কি হল?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ—আরে ভাই, সুদ কখনো কখনো যে মূলকেও ছাড়িয়ে যায়। সুদেতেই তো দেনাদার কাবু হয়ে পড়ে। সুদ নেবে না অথচ মূল ঋণও কিস্তিবন্দি করে নেবে, এমন মহাজনকে দয়াময় বলতেই হবে। এখন প্রশ্ন হল—মূল আর সুদ কাকে বলব? পাপের ফলে তোমার রোগ হয়েছে, যন্ত্রণায় তুমি অস্থির হয়েছ—এই হল মূল ঋণ। এই ঋণের উসুল তোমাকে দিয়ে দিতেই হবে। আর সুদ কী? রোগ হয়েছে, ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হচ্ছে। অথচ তুমি বাপরে মারে গেলামরে বলে হইচই চেঁচামিচি না করে স্থির হয়ে আপন ইষ্টচিন্তায় মনকে নিবিষ্ট করে রেখেছ, একেই বলা যায় তোমাকে সুদ দিতে হচ্ছে না। অর্থাৎ ব্যাধি হল মূল, আর ব্যাধিজনিত যে আধি, তা হল সুদ। রোগ আসে আসুক, শোক আসে আসুক, দুঃখ আসে আসুক ভগবানের আরাধনা যে করে, সে এসবে বিচলিত হয় না, তাকে সুদ দিতে হয় না। যে ব্যক্তি ভগবানের আরাধনা করে সে ব্যক্তি চিত্তে আনন্দ উপভোগ করে। তার মানসিক বিকার বা কষ্ট বেশি হয় না। এ প্রসঙ্গে একটি কথা আছে—

"দুঃখ পাইয়ে তো সুখ লাগাইয়ে"

অর্থাৎ দুঃখ পেলে সুখ বা আনন্দে থাক

এ সম্পর্কে একটি গল্প আছে, তা তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি ঃ—

সোনার কৌটার গল্প

এক রাজা ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মন্ত্রী, দুঃখে পড়লে কী করা উচিত?" মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, দুঃখে পড়লে সেই দুঃখ ভুলে আনন্দ করুণ, তবেই মঙ্গল হবে।" মন্ত্রীর কথা ঠিক কিনা তা যাচাই করবার জন্য রাজা একটা সোনার কৌটো মন্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন, "এই কৌটোটা তুমি এখন রেখে দাও। যখনই আমি এটা ফেরৎ চাইব তখনই আমাকে ফেরৎ দিতে হবে। যদি না পারো, তাহলে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।" শুনে মন্ত্রীর তো ভয় ধরে গেল। মন্ত্রী ভাবল—এই কৌটো কৌশল করে রাজা আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবে। আমি এখন কী করি? মন্ত্রী অনেক ভেবে চিন্তে নিজের শোবার ঘরের দরজার খিলান ভেঙে সেখানে কৌটো রেখে ভাঙা খিলান এমনভাবে মেরামত করে দিলেন যাতে কেউ বুঝতে না পারে।

এদিকে রাজা ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করলেন, যে তাঁর একটা কাজ করে দিতে পারবে তাকে তিনি এক হাজার টাকার বকশিশ দেবেন। তা শুনে দুজন বেশ্যা রাজবাড়িতে এল। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কী কাজ করতে পারো?" একজন বলল, "আমি আকাশে ফাঁদ পাততে পারি।" আর একজন বলল, "আমি আকাশে ছিদ্র করতে পারি।" তাদের কথা শুনে রাজা প্রথম বেশ্যাকে বিদায় করে দিলেন। দ্বিতীয়জনকে তিনি বললেন, "আমার একটা সোনার কৌটো মন্ত্রীর কাছে আছে, সেটা সে খুব গোপনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। তুমি সেটা খুঁজে বের করে আমাকে এনে দিতে পারবে?" বেশ্যা বলল, "নিশ্চয় পারবো হুজুর।" রাজা বললেন, "যদি পারো তাহলে তোমাকে আমি এক হাজার টাকা বকশিশ দেবো।"

পরদিন থেকেই বেশ্যা রোজ মন্ত্রীর বাড়ির দরজার সামনে বসে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। প্রত্যহ একটা স্ত্রীলোককে বাড়ির সামনে এভাবে কাঁদতে দেখে মন্ত্রীর বড় দয়া হল। তিনি তাকে বললেন, "তুমি কি কোন বিপদে পড়েছ? তোমার কী চাই বলো। আমি তোমার অভাব মিটিয়ে দেব।" বেশ্যা বলল,

"বাবা, আমার কোনো কিছুর অভাব নেই। আমার একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিল। অনেকদিন হল সে কোথায় হারিয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। তোমার বউকে দেখতে ঠিক আমার মেয়ের মতো। তাই তাকে দেখবার জন্যে আমি এখানে বসে কাঁদছি।" মন্ত্রী তখন বেশ্যাকে সঙ্গে করে অন্দরে নিয়ে এসে স্ত্রীকে সব কথা বললেন। সব শুনে বেশ্যার প্রতি মন্ত্রীর স্ত্রীরও দয়া হল। তিনি তাকে বললেন, "আপনার জন্যে কী করতে হবে বলুন, আপনি যা চাইবেন, আমি তাই করব।" বেশ্যা বলল, "তুমি হলে আমার মেয়ের মতো, তোমার কাছে আমি কিছুই চাইনে, শুধু তোমার সেবা যত্ন করব, সব সময় তোমার মুখখানি দেখতে পাব, এইটুকু আমার প্রার্থনা।" বেশ্যার কথা শুনে মন্ত্রী ও তার স্ত্রী দুজনেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মন্ত্রী তাকে বললেন, মা তুমি আমার বাড়িতেই থাকো, নিজের ইচ্ছেমতো চলাফেরা করো, তোমার কোন কাজে কেউ বাধা দেবো না।

সেভাবেই সব ব্যবস্থা হল। বেশ্যাও মন্ত্রীর স্ত্রীকে নিজের মেয়ের মতো আদর যত্ন করতে লাগল, এমন কি মন্ত্রীর সঙ্গেও এমন ব্যবহার করতে লাগল যেন মন্ত্রীই তার জামাই। ক্রমে ক্রমে সে মন্ত্রীর বাড়ির কর্ত্রী হয়ে উঠল, তার হুকুমমতো বাড়ির সব কাজ চলতে লাগল। বাড়ির যত তালা চাবি সব তার হাতে এসে গেল। কিন্তু বেশ্যার মন পড়ে আছে রাজার সেই সোনার কৌটোর সন্ধানে। যখন ধারে কাছে কেউ থাকে না তখন সে বাক্স পেঁটরা সিন্ধুক খুলে কৌটোর খোঁজ করতে থাকে। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। বেশ্যা হতাশ হয়ে পড়ল। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গা খুঁজেও যখন কৌটো পাওয়া গেল না, তখন সে মন্ত্রীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে শুরু করল। সে লক্ষ্য করল যে মন্ত্রী যখনই নিজের শোবার ঘর থেকে বাইরে যান তখনই তিনি ভালো করে দরজার খিলানের দিকে লক্ষ্য করতে থাকেন। আবার শোবার ঘরে ঢুকে প্রথমেই তিনি সেদিকে চেয়ে দেখেন। তাই বেশ্যার সন্দেহ হল ঐ খিলানের মধ্যে মন্ত্রী হয়তো সেই কৌটো গেঁথে রেখেছেন।

মন্ত্রী একদিন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে রাজবাড়িতে গেছেন, সেই সুযোগে বেশ্যা খিলান ভেঙেই দেখে, সেই সোনার কৌটোটি রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে কৌটো নিয়ে কাউকে কিছু না বলে মন্ত্রীর বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। মন্ত্রী বাড়ি ফিরেই দেখে সর্বনাশ, খিলান ভাঙা কৌটো সমেত বেশ্যাও উধাও হয়ে গেছে। মন্ত্রী

তখন বুঝতে পারলেন, বেশ্যাকে রাজাই পাঠিয়ে ছিলেন কৌটোটা চুরি করে আনতে। মন্ত্রীর চিন্তা হল—এবার তো রাজা কৌটোটা ফেরত চাইবেন, আর তা দিতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত। মন্ত্রী কী যে করবেন তা ভেবে পেলেন না।

এদিকে বেশ্যা সেই সোনার কৌটো রাজার কাছে পৌঁছে দিয়ে বকশিশ্ নিয়ে চলে গেল। রাজা ভাবলেন, মন্ত্রী আমার চেয়ে ঢের বেশী চালাক। যেখানেই কৌটো রাখব ও ঠিক বের করে নেবে। এই ভেবে তিনি নিজের হাতে কৌটোটা দিঘির জলে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা রুই মাছ তা গিলে ফেলল।

রাজা তখন মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। মন্ত্রী আসার পর রাজা তাকে বললেন, "এবার আমার কৌটো ফেরৎ দাও।" মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, কৌটো আমার কাছে নেই, এখন আমি ফেরৎ দিতে পারব না।" রাজা বললেন, "তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। মন্ত্রী বললেন, "মহারাজের আদেশ শিরোধার্য। তবে আপনার কাছে নিবেদন এই যে আপনি আমাকে সাতটা দিন সময় দিন। এই সাতটা দিন আমি ভগবানকে ডাকবো"। রাজা সাতটা দিন মন্ত্রীকে সময় দিলেন। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মন্ত্রী এক সদ্‌গুরুর কাছে গিয়ে বললেন, "বাবা, আর সাতদিন বাদে আমার মৃত্যু হবে, শেষ সময়ে আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" সদ্‌গুরু বললেন, "তুমি দুঃখ করো না। বিপদ এসেছে, তাতে তুমি কাতর হোয়ো না, বিষণ্ণ হোয়ো না, আনন্দ করো, কেবল আনন্দ করো।"

সদ্‌গুরুর উপদেশ শুনে মন্ত্রী নিজের বাড়িতে উৎসবের আয়োজন করলেন। নাচগান, দান-ধ্যান, যাত্রা-কথকতা প্রভৃতির জন্য লোকজনের আনাগোনায় মন্ত্রীর বাড়ি গমগম করতে লাগল। শহরের লোকজন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল মন্ত্রীর বাড়িতে এ উৎসবের কারণ কী? মন্ত্রী দরাজ হাতে খরচ করে চলেছেন, যে যা জিনিস নিয়ে আসছে দ্বিগুণ দামে তিনি তা কিনে নিচ্ছেন। উৎসবের এই বিপুল কর্মব্যস্ততায় মন্ত্রীর আর মৃত্যু চিন্তা করবার অবসর মিলল না।

এইভাবে সাতদিন কেটে গেল। রাজা আবার মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। মন্ত্রী রাজাকে খবর দিলেন, তার বাড়িতে এখন উৎসব চলছে, উৎসব শেষ হলেই তিনি রাজার সঙ্গে দেখা করবেন। এভাবে আরও সাতটা দিন কেটে গেল। এদিকে হয়েছে কি, রাজার দিঘিতে ফেলে দেওয়া সোনার কৌটোটি একটা

রুই মাছ গিলে ফেলেছিল, সেই মাছটি এক জেলের জালে ধরা পড়ল। জেলে ভাবল, এ মাছ বাজারে বিক্রি না করে মন্ত্রীর বাড়িতে যদি বিক্রি করতে পারি তাহলে অনেক বেশি দাম পাওয়া যাবে। এই ভেবে সে মাছটা মন্ত্রীর বাড়িতে নিয়ে এল মন্ত্রী দ্বিগুণ দাম দিয়ে তা কিনে নিলেন। দাসী যখন সেই মাছটা কুটছে তখন মাছের পেট থেকে সোনার কৌটোটা বেরিয়ে পড়ল। দাসী ভাবল মন্ত্রী মশাইকে কৌটোটা দিলে অনেক পুরস্কার মিলবে। তখন কৌটোটা মন্ত্রীর হাতে দিল। কৌটো হাতে পেয়ে মন্ত্রীর তো আনন্দ ধরে না। তিনি বুঝতে পারলেন যে রাজা কৌটোটা দিঘির জলে ফেলে দিয়েছিলেন আর রুই মাছ সেই কৌটো গিলেছে। তিনি দাসীকে অনেক পুরস্কার দিয়ে কৌটোটা নিজের জামার পকেটে রেখে দিলেন, আর ঠিক সেই সময় রাজবাড়ি থেকে পেয়াদা এসে জানাল যে রাজামশাই হুকুম দিয়েছেন—মন্ত্রীমশাই যে অবস্থায় থাকুন না কেন, সেই অবস্থায় তাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।

মন্ত্রী তখন বুক ফুলিয়ে রাজার কাছে এলেন। রাজা বললেন, "তোমাকে বারবার ডেকে পাঠাচ্ছি তা সত্ত্বেও তুমি আসোনি কেন?" মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, আমার অপরাধ নেবেন না। আমি বাড়িতে উৎসব নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিলাম। তাই আসতে পারিনি।" রাজা বললেন, "এখনই আমার কৌটো ফেরৎ দাও।" মন্ত্রী অমনি পকেট থেকে কৌটো বের করে রাজার হাতে দিলেন। রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কৌটো তুমি কোথা থেকে পেলে?" তখন মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, উৎসবের আনন্দে মেতে ছিলাম বলেই এই কৌটো আমার হাতে এসেছে। আমি জানতাম আপনি আমার প্রাণদণ্ড দেবেনই। তাই বৃথা দুঃখ না করে আমি উৎসবের আয়োজন করেছিলাম। শুধু যদি দুঃখ করেই দিন কাটাতাম, আনন্দে ডুবে না যেতাম, তাহলে এই কৌটো ফিরে পেতাম না। আপনি তো কৌটোটাকে দিঘিতে ফেলে দিয়েছিলেন, একটা মাছ সেই কৌটোটা গিলেছিল, জেলের জালে সেই মাছ ধরা পড়ে, বেশি পয়সার লোভে জেলে সেই মাছ আমার কাছে বিক্রি করে আর এভাবেই কৌটো আমার হাত এসেছে। মহারাজ, আপনাকে আমি বলে ছিলাম 'দুখ পাইয়ে তো সুখ লগাইয়ে'। এখন বুঝে দেখুন কথাটা সত্যি কিনা। সামান্য এই কথাটা আপনাকে বোঝাবার জন্য আমি এত কষ্ট পেলাম।"

দেখো ভাই প্রাণগোপাল, এই ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তমূলক গল্পে কী সুন্দর উপদেশ

দেওয়া হয়েছে। বিপদে পড়লে বিষণ্ণ হয়ে পড়বে না। তাপিত হবে না। সন্তাপ নিয়ে এলে কিছু লাভ হবে না। বরং আরও দুঃখ বেড়ে যাবে। সেই সন্তাপে ইন্দ্রিয় মন একেবারে শুকিয়ে যেতে থাকে। তাতে শরীরেও রোগ দেখা দেয়। এক গুণ দুঃখ দশগুণ হয়ে যায়। সেইজন্যে দুঃখ, বিপদকালে আনন্দে থাকার চেষ্টা করো, দুঃখ দূর হয়ে যাবে। ঘরে আলো জ্বাললে অন্ধকার আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। সুখ এলে দুঃখ আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। উপরোক্ত দৃষ্টান্তমূলক গল্পের উপদেশের সঙ্গে তোমার ধর্ম শাস্ত্রের মিল আছে। দেখ, গীতায় ভগবানও বলেছেন—

'গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ' (২/১১) অর্থাৎ পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কারোর জন্য অর্থাৎ গত বস্তুর জন্য শোক করেন না।

মহাভারতের শান্তি পর্বে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়েছেন—হে যুধিষ্ঠির, দুঃখের সময় শোক কোরো না। বিষণ্ণ হোয়ো না—এতে দুঃখ আরও বেড়ে যায়। বিচারপূর্বক দুঃখকে সরিয়ে দিলে দুঃখ লঘু হয়ে যায়।

এইজন্যে আমি বলেছি, বিচারশীল ব্যক্তিদের সুদ দিতে হয় না। শুধু আসলটা শোধ দিলেই হয়। অর্থাৎ দুঃখ হয়েছে বিপদ এসেছে কিন্তু তা আনন্দ চিত্তে ভোগ কর, তাতে সুদ দিতে হল না।

অষ্টম পর্ব

স্থান—ধ্যান কুটীর বোয়াক ঃ ১৩৪১ সাল : শ্রাবণ মাস

সময়– সকাল

ব্যারিষ্টার দুর্গানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সৎসঙ্গ

[ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং এই সম্পর্কে একটি গল্প ঃ দুঃখ না হলে ঈশ্বরের স্মরণ হয় না আর বৈরাগ্য আসে না – এ সম্পর্কে বাবু রাম রাম কহো গল্প ঃ সাধুর ভাব কেমন হবে, এ সম্পর্কে ভাঁড়কে কৃপা করার গল্প ঃ কোন জিনিস গড়তে সময়, কিন্তু ভাঙতে দেরি হয় না ঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব দু ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, এক ঃ বিধিবাক্য দিয়ে, দুই – নিষিদ্ধ বাক্য দিয়ে ঃ ঈশ্বর সত্য আর তার মায়া হল মিথ্যা, এ সম্পর্কে সোনার ডেলা আর মাটির পিণ্ডের উদাহরণ স্বরূপ গল্প ঃ ঈশ্বরের তিন গুণ আর মায়ারও তিন গুণ ঃ যে যার ধর্ম অবলম্বন করেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, পরধর্ম গ্রহণ করলে ঈশ্বর লাভের জন্য অনেক ঘুর পথ হয়ে যায় ঃ জাতি ভেদ বা জাতি বিচারের পিছনে কি যুক্তি আছে ঃ একমাত্র পূর্ণ জ্ঞানীর জাতি বিচার থাকে না ঃ বুদ্ধি হবে ব্রহ্মবেত্তা হওয়ার জন্য আর শরীর হবে সংসার করার উপযোগী ঃ মনকে সব সময় বিশেষ কাজে লাগিয়ে রাখো, তাহলে শোক দুঃখ করবার অবসর পাবে না ঃ মনকে বশে আনার উপায়]

দুর্গানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের প্রিয় শিষ্য কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় কাতর হয়ে শ্রীশ্রী গুরুমহারাজের চরণ দর্শনে এবং তাঁর অমূল্য উপদেশ শ্রবণে শোকে শান্তি লাভ করবার জন্য আশ্রমে এসে গুরুমহারাজের শ্বেত কমল সদৃশ চরণ কমলে মাথা রেখে প্রণাম করলেন এবং তাঁর জ্ঞান উদ্ভাষিত মুখমণ্ডলের পানে তাকিয়ে রইলেন। দুর্গানন্দ আজ যেন ভিখারী, গুরু মহারাজের চরণে কি ভিক্ষা চাইছেন, কি সেই বস্তু যে বস্তুর জন্য আজ এই বিদ্যাগর্বে গর্বিত যুবকটি একনিষ্ঠ মনে হাত জোড় করে কাতর প্রাণে বসে আছেন। গুরুদেবের নিকট কি বস্তু সে ভিক্ষা নেবে তা দেখবার জন্য কত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু হায়, সে বস্তু স্থূল দৃষ্টির অগোচর, 'অনুভবৈক বেদ্যম্' অর্থাৎ অনুভবের বিষয়মাত্র। সে বস্তুটি হল জ্ঞানামৃত, গুরুমহারাজ তাপদগ্ধ জীবের জন্য যা অকাতরে বিতরণ করে থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা দুর্গানন্দ, তুমি তো বুদ্ধিমান, তুমি উত্তম অধিকারী, তোমাকে তো বিশেষ বলবার কিছু নেই। 'ঈশ্বর হলেন মঙ্গলময়' – এই একটি বাক্য যদি তুমি ধারণা করে নাও, আর তোমার শোক থাকবে না। এ সম্পর্কে তোমাকে একটা ছোট দৃষ্টান্তমূলক গল্প শোনাচ্ছি।

ঈশ্বর মঙ্গলময়ের গল্প

এক রাজা তাঁর পাত্র-মিত্রদের নিয়ে শিকার করতে বেরোলেন। তাঁরা ঠিক করে নিলেন যে, যাঁর সামনে যে জন্তু জানোয়ার আসবে তিনি তাকে মারবার জন্যে ঘোড়া ছোটাবেন। রাজার সামনে এক হরিণ এসে পড়ল, রাজাও সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু পিছু ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। মন্ত্রী কিন্তু রাজাকে একা ছাড়লেন না, তিনি রাজার পিছনে পিছনে ঘোড়া ছোটালেন। এইভাবে গভীর বনের মধ্যে এসে হঠাৎ রাজা ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন, তাঁর হাত কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। তা দেখে মন্ত্রী এক টুকরো কাপড় দিয়ে রাজার হাত ভালো করে বেঁধে দিয়ে বললেন, 'মহারাজ, আপনার হাত কেটেছে তার জন্য আপনি দুঃখ করবেন না। ভগবান মঙ্গলময়, তাঁর কাজে কখনো অমঙ্গল হতে পারে না। এই যে আপনার হাত কেটে রক্ত পড়ছে, এতেও আপনার মঙ্গল হয়েছে জানবেন।' মন্ত্রীর কথা শুনে রাজার ভয়ানক রাগ হল। এত বড় একটা আঘাত পেলাম, এমনকি রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গেল, আর মন্ত্রী বলে কি না আমার মঙ্গল হয়েছে। রাজা মনে মনে ঠিক করলেন মন্ত্রীকে একবার দেখে নিতে হবে।

কিছুক্ষণ পর রাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'আমার বড় জল তেষ্টা পেয়েছে, কোথাও জল পাওয়া যায় কি না দেখো। মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, কাছেই একটা কুয়ো আছে। চলুন, সেখানে জল পাওয়া যাবে।' কুয়োর কাছে এসে মন্ত্রী জল তুলে রাজাকে দিলেন। জল খেয়ে রাজার প্রাণ ঠাণ্ডা হল। মন্ত্রী তখন নিজে খাবেন বলে যেই জল তুলতে গিয়েছেন, অমনি রাজা মন্ত্রীকে ঠেলে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলেন। কুয়োয় পড়তে পড়তে মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, আপনি আমাকে কুয়োয় ফেলে দিলেন, এতেও আমার মঙ্গল হবে। ঈশ্বর হলেন মঙ্গলময়, তাঁর রাজ্যে অমঙ্গল হতে পারে না।'

মন্ত্রীকে কুয়োতে ফেলে দিয়ে রাজা চলে যাচ্ছেন, এমন সময় একদল যক্ষ

রাজাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, তারপর তারা রাজাকে ধরে নিয়ে চলল, রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই, তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ?' যক্ষরা বলল, 'দেবতারা নরমেধ যজ্ঞ করবেন, নরবলির জন্য তোমাকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। তুমি হলে রাজা, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' কথা শুনে ভয়ে রাজার বুক শুকিয়ে গেল। রাজা দেখলেন – আর রক্ষা নেই, এবার তাঁকে মরতেই হবে। এমন সময় হঠাৎ একজন যক্ষের নজরে পড়ল – রাজার হাতে রক্ত লেগে আছে। দেখেই সে তার সঙ্গীদের বলল, 'শোনো, একে তো বলি দেওয়া চলবে না, এর দেহে যে খুঁত রয়েছে, এর হাত দিয়ে এখনো রক্ত পড়ছে। নিখুঁত দেহ না হলে বলি হবে কেমন করে?' রাজার হাতে রক্ত দেখে যক্ষরা তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। রাজার তখন হুঁশ হল, মন্ত্রী তো তাহলে ঠিক কথাই বলেছিল যে হাত কাটার দরুণ তাঁর মঙ্গলই হবে। তখন আমি মন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করিনি, এখন দেখছি – ভাগ্যি আমার হাত কেটেছিল, তাইতো অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলাম। এই ভেবে মন্ত্রী বেঁচে আছে কিনা দেখবার জন্য রাজা আবার সেই কুয়োর কাছে ফিরে এলেন।

মন্ত্রীর ভাগ্য ভালো, কুয়োয় পড়তে একটা গাছের শিকড়ে তাঁর হাত ঠেকে গিয়েছিল। সেই শিকড় ধরে ঝুলে তিনি কোনো রকমে প্রাণে বেঁচেছিলেন। কুয়োর উপর থেকে রাজার ডাক শুনতে পেয়ে এবার তিনি সাড়া দিলেন। রাজাও তখন একটা দড়ি কুয়োর ভিতর নামিয়ে দিতেই মন্ত্রী সেই দড়ি ধরে উপরে উঠে এলেন। রাজা তখন মন্ত্রীর কাছে যক্ষদের কথা, কেমন করে বলি দেবে বলে তারা তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তারপর তাঁর হাতে রক্ত দেখে কেমন করে তারা তাঁকে ছেড়ে দিল সব কথা একে একে বলে শেষে বললেন, 'মন্ত্রী, আমার হাত কেটে রক্ত বেরিয়েছিল বলেই আজ আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম। তাতেই যে আমার মঙ্গল হয়েছে, তোমার সেই কথায় আমার কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি কুয়োর মধ্যে পড়ে এত যে কষ্ট পেলে, তাতে তোমার কী মঙ্গল হল?' মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, আপনি যদি আমাকে কুয়োয় ফেলে না দিতেন, তাহলে যক্ষরা আমাকেই বলি দেবে বলে ধরে নিয়ে যেত। কুয়োয় ফেলে দিয়ে আপনি আমার যথার্থ মঙ্গল করেছেন। এখন দেখলেন তো মহারাজ, ঈশ্বর যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই।'

দেখো বাছা, দুর্গানন্দ, আমাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, তাই আমরা সব সময় মঙ্গল দেখতে পাই না। প্রশ্ন উঠতে পারে, সকল ঘটনার মধ্যে মঙ্গল কীভাবে দেখা যাবে? যখন দেখা যায় একমাত্র ছেলে উপার্জন করে, সেই উপার্জনে সে বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে প্রতিপালন করে, হঠাৎ সেই ছেলে মারা গেল। এতে কী মঙ্গল হল? স্থূল দৃষ্টিতে এতে কোন মঙ্গল আমরা দেখতে পাই না। আমরা শুধু দেখতে পাই, সহায় সম্বলহীন বৃদ্ধ পিতামাতা আর স্ত্রী পুত্র কন্যার খাওয়া পরা কীভাবে চলবে তার কোনও ঠিকানা নেই, এরা সবাই তো চরম দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হল। এতে মঙ্গল কোথায়? তবু এর মধ্যে মঙ্গল খুঁজে বের করতে হবে। তার জন্য চাই বিচার। ভেবে দেখো, ওই ছেলে যদি অনেক দিন ধরে রোগশয্যায় পড়ে থাকত, তার রোজগার বন্ধ হয়ে যেত, রোগযন্ত্রণা যদি তার অসহ্য হয়ে উঠত, তাহলে তার চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধ পিতা কোথা থেকে যোগাড় করত? খরচ যদি বা কোন রকমে যোগাড় করল, তার অসহ্য রোগযন্ত্রণা দূর করত কেমন করে? ছেলের এই যন্ত্রণা তাকে মুখ বুঁজে সহ্য করতে হত, কোন প্রতিকার করা তার পক্ষে সম্ভব হত না, আর তার ফলে বৃদ্ধ পিতামাতার দুঃখের অন্ত থাকত না। তাই মেনে নিতে হয় মঙ্গলময় ভগবান মৃত্যুরূপে এসে সমস্ত রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে তাঁর কোলে তুলে নিয়েছেন। তখন বলতে হয় ভগবান, রোগের যন্ত্রণা থেকে তুমি তাকে মুক্তি দিয়েছ, তোমার কোলে আশ্রয় পেয়ে সে শান্তিলাভ করেছে। এইভাবে বিচার করে সমস্ত দুঃখকষ্টের মধ্যেও যদি ভগবানের মঙ্গল হস্তের স্পর্শ অনুভব করবার চেষ্টা করতে থাকো, তাহলে ভগবান যে মঙ্গলময় তা একদিন বুঝতে পারবে। খোঁজ করেও যদি মঙ্গল দেখতে না পাও, তাতেও কোন ক্ষতি নেই। শুধু অন্ধবিশ্বাসে মেনে নাও – ভগবান মঙ্গলময়, তাঁর রাজ্যে অমঙ্গলের স্থান নেই।

ভগবান মঙ্গলময়, এই মহাবাক্য দৃঢ়ভাবে ধারণা করা চাই। তাতে মনের মধ্যে পরম শান্তি লাভ করা যায়। ধারণা দৃঢ় হলে রোগ শোক, দুঃখ যাই আসুক না কেন, তাতে চিত্ত-চাঞ্চল্য হবে না।

দেখো দুর্গানন্দ, তোমার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। তোমাকে যদি বলা হয় – এতে তোমার মঙ্গল হয়েছে, এ কথা শুনে তোমার কাছে বাক্যটি কড়া মনে হবে। কিন্তু এতেই মঙ্গল হবে। তোমার মনে আজ যে বৈরাগ্য ভাব হয়েছে,

এই ভাব আগে তোমার হয়নি। স্ত্রী বিয়োগজনিত দুঃখ তোমার মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় ঘটিয়েছে, দুঃখ না হলে মানুষের ঈশ্বরের স্মরণ হয় না, বৈরাগ্য আসে না। দেখো ভাই দুর্গানন্দ, এ সম্পর্কে একটা গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি।

বাবু রাম রাম কহো গল্প

এক অঢেল টাকার মালিকের উপর এক সাধুর কৃপা দৃষ্টি পড়ল। সাধু তাকে বললেন, 'দেখো, বাবা, তুমি রোজ রাম নাম করো।' ধনী লোকটি বলল, 'আমার কত কাজ, রামনাম করবার সময়ই নেই। তাই আমি রামনাম করতে পারবো না।' সাধু দেখলেন, 'এ তো ধন-মদে উন্মত্ত হয়ে গেছে। তাই তিনি ভাবলেন, একে কী করে উদ্ধার করা যায়?

সাধু ছিলেন সাধন-শক্তি সম্পন্ন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। একদিন ধনী লোকটি গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছে। এমন সময় সাধু অবিকল ধনী লোকটির মূর্তি ধারণ করে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। এমন নিখুঁতভাবে চেহারা পাল্টে ফেলেছেন যে ধনীলোকটির চেহারার সঙ্গে তাঁর এতটুকুও তফাৎ নেই। ঘরে ঢুকে তিনি ঐ লোকটির ছেলেদের বললেন, 'দেখো আমি মুশকিলে পড়েছি। আমি গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখি এক বহুরূপী ঠিক আমারই মতো চেহারা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখুনি হয়ত সে আমার এই বাড়িতে আসবে। যদি আসে তাহলে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ো। কিছুতেই সে যেন বাড়ির মধ্যে ঢুকতে না পারে।' এই বলে সাধু ঘরের ভিতরে পালঙ্কের উপর গিয়ে বসলেন।

একটু পরেই বাড়ির আসল মালিক ঐ ধনী লোকটি নিজের বাড়িতে ঢুকতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলেরা তাঁকে আটকে দিল। লোকটি তো অবাক। সে তখন ছেলেদের বলতে লাগল, 'তোমরা করছ কী? তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? আমি গঙ্গা স্নান করে ফিরছি আর তোমরা আমাকে বাড়ি ঢুকতে দেবে না? আমি তোমাদের পিতা, আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা ঠিক হচ্ছে না।' ছেলেরা তখন রেগে গিয়ে বলল, 'ভেবেছ তোমার মতলব আমরা বুঝতে পারিনি? তুমি যে বহুরূপী তা আমরা জানি। আমাদের বাবা ঘরের ভিতরেই রয়েছেন। ভাল চাও তো এখনি বিদায় হও।' এইভাবে দুপক্ষে বচসা হতে লাগল। শেষে ছেলেরা দু-চার ঘা চড়-চাপড় ও গলাধাক্কা দিয়ে তাকে

বাড়ির বাইরে বের করে দিল।

ধনী লোকটি অন্য কোন উপায় না দেখে সে রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করল। রাজা তখন সাধুকে ডেকে পাঠালেন। সাধু আসতেই রাজা তো অবাক হয়ে গেলেন, দুটি লোক হুবহু এক রকম দেখতে। কে আসল, কে নকল তিনি ঠিক করতে পারলেন না। রাজার এই অবস্থা দেখে সাধু রাজাকে বললেন, 'রাজামশাই, যে আসল লোক, সে ঘরের সব খবরই বলতে পারবে। আপনি এক কাজ করুন। ঘরের যে কোন গোপন খবর আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কে আসল আর কে নকল।' রাজা দেখলেন, কথাটা মন্দ নয়। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বড়ো ছেলের বিয়েতে কত খরচ হয়েছে? সেজো ছেলের বিয়েতে কত খরচ হয়েছে?' সাধু তো অলৌকিক শক্তির অধিকারী। তিনি পটাপট সব জবাব দিয়ে দিলেন। রাজা তখন ধনী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ যা যা বলেছে সব ঠিকমতো বলেছে তো?' ধনী লোকটি বলল, 'রাজামশাই, ও সব খরচের হিসাব আমার মনে নেই।' সাধু তখন রাজাকে বললেন, 'আপনি আমার বাড়ি থেকে খাতাপত্র আনিয়ে দেখুন আমি ঠিক বলছি কিনা।' রাজার হুকুমে তখনই খাতাপত্র আনানো হল। রাজা দেখলেন, সাধুর কথাই ঠিক, তাই তার বিচারে ধনী লোকটিই বহুরূপী বলে সাব্যস্ত হল।

ধনী লোকটির অবস্থা তখন শোচনীয় হয়ে উঠেছে। সারাদিনের অনাহার, ছেলেদের হাতে মার খাওয়া, নিজের বাড়িতে ঢুকতে না পারা – এসব কারণে তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এদিকে বিনা অপরাধে সবাই তাকে জোচ্চর বলছে। মনের দুঃখে সে গঙ্গার ধারে বসে কাঁদতে লাগল। এভাবে দু চারদিন কেটে যাবার পর সাধু নিজের মূর্তিতে লোকটির সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'বাবা, এখন তো তোমার ধন-ঐশ্বর্য কিছুই নেই, ছেলেরা তোমাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। এখন আর কী করবে বাবা, তুমি রামনাম করো।' ধনী লোকটি বলল, 'সাধুজী, এখন আমার চোখ খুলেছে। আমি বুঝতে পারছি – টাকা, পয়সা, ধন দৌলত কিছুই আমার নয়, সব ভগবানের, আমার যদি হোত তাহলে আমার এমন দুর্দশা হবে কেন? এখন থেকে আপনার কথামতো রামনাম করেই দিন কাটাব।' সাধু খুশি হয়ে বললেন, 'বাবা, তোমার মঙ্গলের

জন্যই আমি তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছি। এখন তুমি নিজের ঘরে যাও, ঐশ্বর্য ভোগ কর আর সেই সঙ্গে রামনাম করতে থাকো। এতে তোমার কল্যাণ হবে।' সাধুর কথা শুনে ধনী লোকটি তখন থেকে বিষয় কর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ আরাধনায় মন দিল। সাধুর কৃপায় তার পরম কল্যাণ হল।

এই দৃষ্টান্তের তাৎপর্য হল যে, মানুষের দুঃখ না হলে তার বৈরাগ্যের উদয় হয় না, ঈশ্বরকে স্মরণ মনন করার কোন ইচ্ছাই হয় না। তোমাদের পুরাণে এই কারণে ভগবানের কাছে কুন্তীদেবী বর প্রার্থনা করেছিলেন – হে ভগবান, আমাকে তুমি দুঃখ দাও, সুখ দিলে আমি তোমাকে ভুলে যাব। যখন দুঃখ হবে, তখনই তোমাকে স্মরণ করব।

দেখো দুর্গানন্দ, এখন তুমি দুঃখের মধ্যে পড়েছ, তাই তুমি আমার কাছে এসেছ। সৎসঙ্গ করা, ঈশ্বরীয় কথা শোনবার ইচ্ছা তোমার হয়েছে। এখন তো তুমি সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছ, তবে এখন তোমার, অনেক কর্তব্যকর্ম আছে, তা না হলে তোমাকে এখান থেকে যেতে দিতাম না। গতকাল তুমি আর তোমার ছোট ভাই শ্যামানন্দ যখন এখানে আসছিলে তখন তোমরা দু ভাই বচসা করছিলে। তুমি বলছিলে, শ্যামানন্দ, তুমি বিয়ে করে গৃহী হও আর আমি ব্রহ্মচারী হয়ে গুরু মহারাজের কাছে থাকব। দেখো ভাই দুর্গানন্দ, গেরুয়া কাপড় পরিধান করলেই সাধু হওয়া যায় না। যার চিত্ত সাধুভাবাপন্ন হয়েছে সেই প্রকৃত সাধু। তুমি এখন শুক্ল সন্ন্যাসী হয়ে যাও অর্থাৎ সাদা কাপড় পরে সাদা স্বভাব লাভ করে যাও। সাদার ভাব কী রকম হয়ে থাকে তার একটা ক্ষুদ্র উদাহরণ-স্বরূপ গল্প শোনাচ্ছি –

ভাঁড়কে কৃপা করার গল্প

এক সাধু নৌকো করে নদী পার হচ্ছিলেন। তাঁর সাথে অনেক যাত্রী ছিল। এক ধনীলোকও তার ভাঁড়কে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় উঠেছিল। ভাঁড়ের কাজই হল মনিবকে খুশি রাখা, তামাসা করা ইত্যাদি। ভাড় সাধুর উপর নানাভাবে অত্যাচার শুরু করে দিল। কখনো তাঁর মাথায় খোঁচা মারে, কখনো তাঁর ঝোলা ধরে টানে আর হো হো করে হাসতে থাকে। সাধু কিন্তু নির্বিকার হয়ে বসে রইলেন, একটি কথাও তিনি বললেন না। কিন্তু সাধুর এই অপমান দেবতাদের সহ্য হল না। সাধু শুনতে পেলেন দেবতারা তাঁকে বলছেন, 'সাধু মহারাজ,

আপনার এই অপমান আমরা আর সইতে পারছি না। আপনি হুকুম দিন, এই ভাঁড়ের সঙ্গে নৌকোর সবাইকে ডুবিয়ে মারি।' সাধু বললেন, 'না, অমন কাজ তোমরা কোরো না। কেন এতগুলি লোকের প্রাণ তোমরা নষ্ট করবে।' দেবতারা তখন বললেন, 'আপনি তবে অনুমতি করুন, ওই ভাঁড়কে জলে ফেলে দিই।' সাধু দেবতাদের বললেন, 'তোমরা যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকো, তাহলে আমি অনুনয় করে বলছি তোমরা ওকে প্রাণে মেরো না। তার চেয়ে ওর দুর্বুদ্ধি নষ্ট করে তার জায়গায় সুবুদ্ধি এনে দাও। সুবুদ্ধি হলে ও আর কখনো কোন লোককে এভাবে অপমান করবে না। ওর কল্যাণ হবে। জানো তো, ভাঙতে সকলেই পারে, কিন্তু গড়তে পারে ক'জন? গড়তে গেলেও সময় অনেক বেশি লাগে।'

'সূই সোহাগা সুজন
গড়ে তিন জন
উই ইঁদুর দুর্জন
ভাঙ্গে তিন জন।'

দেখো ভাই দুর্গানন্দ, সাধুর কেমন শীতল স্বভাব হয়ে থাকে, সে কারোর অনিষ্ট করে না আর কারোর অনিষ্ট চিন্তাও করে না। সে শুধু ইষ্ট চিন্তাই করে থাকে। সূই, সোহাগা আর সুজন – এরা নতুন করে গড়ে, ভাঙে না। অপরদিকে উই, ইঁদুর আর দুর্জন – এরা সব সময় ভাঙে, নষ্ট করে। দেখো বাছা, এখন তুমি সাদা কাপড় পরে শুল্ক সন্ন্যাসী হয়ে যাও, জ্ঞান অর্জন কর আর ঈশ্বর যে আছেন তা নিশ্চিত করো। ঈশ্বরের অস্তিত্ব দুভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়। এক বিধি বাক্যে নিশ্চিত হওয়া যায় আর এক নিষেধ বাক্য দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

দুর্গানন্দ ঃ মহারাজ, বিধি বাক্য আর নিষেধ বাক্য কাকে বলে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বিধিবাক্য হল – ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর হলেন সত্য আর তাঁর মায়া হল মিথ্যা। এই জগৎ সংসার সব হল মায়ার খেলা। তাই যা কিছু দেখছ সবই হল মিথ্যা উপাদানে গড়া কারণ ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, মায়া মিথ্যা।

এটা সহজে বোধগম্য হওয়ার জন্য একটা গল্প বলছি।

এক পথিক প্রাতঃকালে রাস্তা দিয়ে চলেছে। যেতে যেতে সে দেখল একটি লোক পথের ধারে বসে আছে আর তার পাশে রেখে দিয়েছে একটি মাটির পিণ্ড। আরও কিছুদূর গিয়ে সে দেখল একটি লোক বসে রয়েছে আর লোকটি তার পাশে একটি সোনার ডেলা রেখে দিয়েছে। পথিক এসব দেখে চলে গেল। সন্ধ্যায় ফেরবার সময় পথিক দেখল, যে লোকটির পাশে সোনার ডেলা ছিল, এখন সোনার ডেলার বদলে সাজান রয়েছে অলঙ্কার যেমন হার, বালা, আংটি, মুকুট ইত্যাদি। লোকটি পথিককে বলল, 'ভাই সকালে আমার পাশে যে সোনার ডেলা দেখেছিলেন, ওই সোনার ডেলা থেকে এইসব অলঙ্কার তৈরী হয়েছে, সোনা ছাড়া এই সব অলঙ্কারের কোন অস্তিত্ব নেই।' পথিকের বিশ্বাস হল না, সে লোকটিকে বলল, 'এ তো সব অলঙ্কার অর্থাৎ ভূষণ পড়ে রয়েছে, সোনার ডেলা কোথায় গেল?' বারবার পথিক যখন একই কথা বলছে, তখন ওই লোকটি সব অলঙ্কার নিয়ে আগুনে সেগুলি গালিয়ে ফেলল, কিছুক্ষণ পর তা আবার সোনার ডেলায় পরিণত হল। এর তাৎপর্য হল যে, সোনার ডেলাটি হল ঈশ্বর, আর যত অলঙ্কার সাজানো হয়েছে সেগুলো হল মায়া দ্বারা নির্মিত বস্তু। সোনা ছাড়া যেমন অলঙ্কারের অস্তিত্ব নেই, তেমনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছাড়া এই জগৎ সংসারের কোনও অস্তিত্বই থাকে না।

পথিক আবার চলতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে দেখল, যে লোকটা সকালে মাটির পিণ্ড নিয়ে বসেছিল, সেখানে মাটির পিন্ডের বদলে সাজান রয়েছে অনেক খেলনা, ঘড়া বাটী, থালা ঘটি ইত্যাদি। পথিক বলল, 'তোমার মাটির পিণ্ড কোথায় গেল?' লোকটি বলল, 'ভাই, মাটির পিণ্ড থেকেই এই সব খেলনা, পুতুল, ঘটি, বাটী ইত্যাদি তৈরী হয়েছে। মাটির পিণ্ড ছাড়া এই সব জিনিসের কোন অস্তিত্ব নেই। মাটির পিণ্ড হল ঈশ্বর আর এই সব খেলনা, পুতুল, ঘটি বাটী ইত্যাদি হল মায়া দ্বারা নির্মিত বস্তু। এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ, ঘর বাড়ি মানুষ যা কিছু দেখছো এ সবই মায়ার খেলা, তার মূল হল ঈশ্বর।'

ঈশ্বরের তিন গুণ – অস্তি, ভাতি, প্রিয়। অস্তি অর্থাৎ তিনি আছেন, ভাতি অর্থাৎ তিনি প্রকাশিত হয়ে আছেন, প্রিয় অর্থাৎ আনন্দরূপে সব কিছুর মধ্যে বিরাজ করছেন।

মায়ারও তিন গুণ যথা – নাম, রূপ, ক্রিয়া। যেমন সোনার ডেলা থেকে

অলংকার তৈরি হল, তার নাম হল বালা। এর রূপ হল গোলাকার আর ক্রিয়া হল হাতে পরা। এই নামরূপ ক্রিয়া নাশ হয়ে যায়। বালাকে গলিয়ে ফেললে বালা আবার সোনার ডেলা হয়ে যাবে। তার নামরূপ ক্রিয়া লোপ পাবে। তাই মায়ার গুণ নষ্ট হয়ে যায়, ঈশ্বরের যে তিনগুণ তা কখনও নষ্ট হয় না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছাড়া কিছুই থাকতে পারে না, এই দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ মায়ার খেলায় বহুরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু এর মূলে রয়েছেন একই ঈশ্বর, যেমন একই সোনার ডেলা থেকে নানারকম অলংকার তৈরী করা হয়। সবের মূলে ঈশ্বর – এটা হল বিধিবাক্য।

আর নিষিদ্ধ বাক্য হল – ঈশ্বর বলে কিছু নেই। কত নাস্তিক লোক আমার কাছে এসে বলে, ঈশ্বর বলে কিছু নেই, ঈশ্বর মানি না। আমি হেসে তাদের বলি, তোমার ভিতরে থেকে যে সাক্ষী দিচ্ছে যে ঈশ্বর নেই, সেই সাক্ষীই তো হলেন ঈশ্বর বা পরমাত্মা। প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক কেউই নয়। নেতি, নেতি করে যাও অর্থাৎ ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর নেই যে বলে থাকে তাকেই ঈশ্বর বলে জান। ঈশ্বর সকল বস্তুর মধ্যেই আছেন – এ হল বিধিবাক্য। বিধিবাক্যে যেমন ঈশ্বর নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হন, নিষিদ্ধ বাক্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চিত হওয়া যায়। একজন বলছে ঈশ্বর আছেন, আর একজন বলছেন – ঈশ্বর নেই। এই দুই মতাবলম্বীই একই ঈশ্বরের সত্ত্বাকেই প্রতিপাদন করে দিচ্ছে। এই সংসারে যত ধর্মাবলম্বী মানুষ আছেন, তারা সবাই এক ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে থাকে। তবে কোন কোন মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ বিধর্মী হয়ে যায়। যেমন কেউ হিন্দু হয়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছে অথবা খ্রীস্টান হয়ে গেছে।

দুর্গানন্দ ঃ মহারাজ, মুসলমান অথবা খ্রীস্টান – এরা কি ঈশ্বরের পুত্র নয়? এরা কি আমার ভাই নয়? এইসব লোকের ধর্মগ্রহণ করলে আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট কেন হবে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ বাছা দুর্গানন্দ, তুমি ভাল প্রশ্ন করেছো। এ ব্যাপারে আমার মতানুসারে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। তপোবনে একদিন আমার কাছে দু'জন পাদরী এসে বলল, 'স্বামীজী আমার ধর্ম আপনি গ্রহণ করুন।' আমি বললাম, 'আমি যদি তোমার ধর্ম গ্রহণ করি, তাহলে আমি তো একলা গ্রহণ করব না।

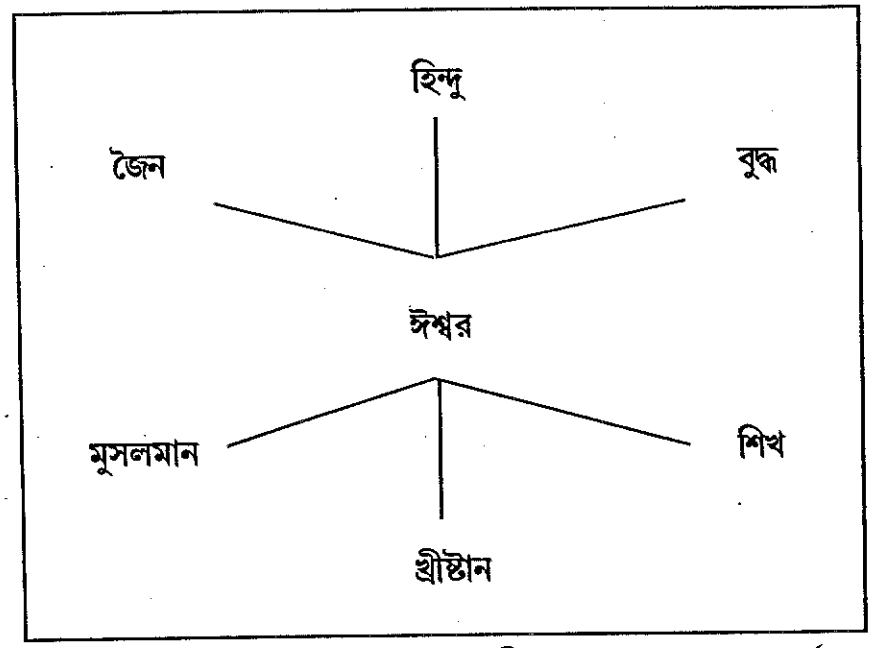

তবে আমি তোমার ধর্মগ্রহণ করব না। পাদরী বলল 'কেন আমাদের ধর্মগ্রহণ করবেন না? আমাদের খ্রীষ্টধর্ম খুবই ভালো।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ বাবা, নিজের নিজের ধর্ম নিজের কাছে শ্রেষ্ঠ। তোমার ধর্ম তোমার কাছে শ্রেষ্ঠ, আমার কাছে শ্রেষ্ঠ নয়। আমার ধর্ম আমার কাছে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তোমার কাছে শ্রেষ্ঠ নয়। এর ভালো যুক্তি আছে। আমি তোমাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেবো। নিচে বৃত্তের মধ্যে ছকের সাহায্যে ভালো করে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে –'

দেখো, এই বৃত্তের মাঝখানে অর্থাৎ কেন্দ্রে রয়েছেন জ্যোতির্ময় ঈশ্বর, এক এক ধর্ম পথাবলম্বী এক এক দাঁড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। যেখানে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, সেখান থেকে ঈশ্বরকে কাছেই পাওয়া যাবে। কিন্তু নিজ দাঁড়ী ছেড়ে অপর দাঁড়ী দিয়ে ঈশ্বরের কাছে যেতে চাইলে অনেক ঘুর পথে যেতে হবে। এখন আমি যদি তোমার ধর্মপথে যাই, তাহলে আমায় কতটা চক্র পেরোতে হবে। আমি সন্ধ্যাবন্দনা করে আসছি। নিজের আচার বিচার নিয়মাদি পালন করে আসছি। এগুলি আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। এখন এইসব অভ্যাস বদল করে তোমার ধর্মের নিয়মাদি অভ্যাস করতে আমার কত সময়

চলে যাবে। আমার এতদিনের অভ্যাস ভুলতে হবে অর্থাৎ পুরনো অভ্যাস মন থেকে হটিয়ে তোমার ধর্মমতকে মনে গেঁথে দিতে হবে। এসব করতে গিয়ে আয়ু শেষ হয়ে যাবে। আমি ঈশ্বরের কাছে যেতে সমর্থ হব না। এইজন্যে আমাদেব গীতাশাস্ত্রে একটি মহাবাক্য লেখা আছে। তা হল –

'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।'

অর্থাৎ নিজ ধর্মে থেকে প্রাণও যদি চলে যায় তাও আমার পক্ষে শ্রেয়। পরোধর্মে কখনও যাওয়া উচিত নয়, এতে বহু ভয়, বহু বিঘ্ন বিপত্তি দেখা দেবে। পাদরী বললেন, আচ্ছা স্বামীজী, আপনার ধর্মে বিশেষ বিশেষ কি জিনিস আছে, তা আমাকে বলুন। আমি তাকে বললাম, বাবা, আমাদের ধর্মের বিশেষত্ব বহু আছে, আমি তোমাকে কত বলব। আমাদের ধর্ম-ধনের গুদামে একদম হীরা মতি ভরে আছে, কিন্তু এই গুদাম সাজানো নেই, হীরা মতি ইত্যাদি এখানে ওখানে মাটিতে পড়ে আছে। কিন্তু তোমাদের ধর্মে তোমরা ভালো করে দোকান সাজিয়ে রেখেছো। সাজগোজ দেখে অনেক হিন্দুর ছেলে, লোক নিজের ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে, এরা নিজধর্মের গুদামে কত যে জহরৎ মাটিতে পড়ে আছে, তা দেখতে পায় না। দেখো বাবা, এখন তো তোমরা আমাদের হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব বুঝতে পারছো। আমাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তোমরাই আমাদের কাছে এসেছ।

দুর্গানন্দ ঃ মহারাজ, এখন তো বুঝতে পারলাম ছবি অনুযায়ী নিজ নিজ ধর্ম-দাঁড়ীতে অবস্থান করাই শ্রেয়। এতে ঈশ্বরকে নিকটেই পাওয়া যাবে। আমার আর একটা প্রশ্ন আছে, প্রশ্নটা হল – জাতি বিচার করার কী উদ্দেশ্য, যে ব্যক্তি জাতি বিচার করে না, জাতি বিচার মানে না, তার কি ধর্ম হবে না? জাতিবিচার সম্পর্কে আপনার কী মত?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ বেশ বাছা দুর্গানন্দ তুমি খুব ভালো প্রশ্ন করেছো। এ সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মসমাজের একজন বড় নেতা ছিলেন। একদিন তিনি তপোবনভূমিতে আমার কাছে এসে বলছেন, 'বাবা, জাতিবিচার করার ব্যাপারে আপনার চিন্তা ভাবনা কী রকম?' আমি বললাম, 'বাবু, আপনি জাতি-বিচার করেন কি? রাজনারায়ণ বাবু বললেন, 'মনুষ্যকৃত জাতিভেদ আমি মানি না।' ঈশ্বরকৃত জাতিভেদ আমি

মানি। মানুষ, কামার, কুমোর, মেথর প্রভৃতি – এসব আমি কিন্তু মানি না। ঈশ্বরকৃত জাতিভেদ আমি মানি – যেমন অশ্ব এক জাতি, গাভী এক জাতি, বিড়াল এক জাতি, বাঁদর এক জাতি, মানুষ এক জাতি। মানুষের মধ্যে তিন জাতি আমি মানি – যেমন স্ত্রী জাতি, পুং জাতি, ক্লীব জাতি। এগুলি ছাড়া অপর জাতি মানি না।'

আমি বললাম, এতেই আমার মীমাংসা হয়ে যাবে। আপনার ঘরে মেয়েলোক কে কে আছে? রাজনারায়ণ বাবু বললেন, হ্যাঁ বাবা, আমার ঘরে আমার সঙ্গে মা আছেন, স্ত্রী আছে, ভগ্নী আছে আর নাতনী আছে। আমি বললাম, বাবু, আপনি এত জাতি কোথা থেকে বের করলেন, আপনি এক স্ত্রী জাতি মানেন, স্ত্রী জাতির ভিতর কন্যা, মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, নাতনী – ইত্যাদি কী করে বললেন? দেখো বাবু, আপনি এক স্ত্রী জাতি থেকে কত জাতি বের করলেন। এ তো ঈশ্বরকৃত নয়, এ তো মনুষ্যকৃত জাতিভেদ। ঈশ্বর তো এক স্ত্রীজাতি করেছেন, কিন্তু আপনি স্ত্রীজাতিকে কত ভাগে ভাগ করেছেন। বাবু, আপনি স্ত্রীর সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেন, আপনার মাতা, কন্যা অথবা ভগ্নী, নাতনীর সঙ্গে ওই একই রকম ব্যবহার করেন কী?

রাজনারায়ণবাবু একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। একটু পরেই তিনি বললেন, 'না বাবা, সমস্ত স্ত্রীলোককে একই ভাবে দেখি – এটা ঠিক নয়। আমি বললাম – বাবু, যতক্ষণ আপনার পূর্ণ জ্ঞান না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে জাতি বিচার করতেই হবে। বাবু, আপনি আপনার ঘরেতেই এত জাতি নিয়ে বসে আছেন, আর বাইরে বলছেন আমি জাতি বিচার মানি না – এ কী রকম কথা! বাবু, জাতি বিচার একমাত্র পূর্ণ জ্ঞানীর হয় না। আর জাতি বিচার হয় না পশুদের। সাধারণ মানুষের পক্ষে জাতি বিচার অবশ্যই হবে। স্ত্রী, কন্যা, মাতা, ভগ্নী প্রভৃতির জাতি বিচার যখন করে থাকো, তখন বাইরেও সেই বিচার অর্থাৎ জাতিভেদ রাখতেই হবে। যখন আপনার সর্বত্র সমজ্ঞান এসে যাবে, তখন আপনি জাতিবিচার ছেড়ে দিতে সমর্থ হবেন।'

রাজনারায়ণবাবু একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। এই কথা সেদিন থেকে ওনার হৃদয়ে একেবারে গেঁথে গেল। পরে শুনেছি, রাজনারায়ণবাবু বাড়ি ফিরে গিয়ে তার বাবুর্চিকে ছাড়িয়ে দিয়ে খাবার প্রস্তুতের জন্য এক ব্রাহ্মণ পাচককে নিযুক্ত

করেন। পরে আরও শুনেছি যে, রাজনারায়ণবাবু নিজের পুত্র কন্যার বিয়ে নিজের স্বজাতির সঙ্গেই দিয়েছিলেন কোন অন্য জাতির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দেন নি। দেখো বাছা দুর্গানন্দ, যতক্ষণ না মানুষের পূর্ণ জ্ঞান হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জাতি বিচার করে ব্যবহারিক কার্য চালানো সব মানুষের পক্ষেই উচিত।

দেখো ভাই দুর্গানন্দ, কোন কোন ব্যক্তি আমাকে বলে, মহারাজ, আমাদের ধর্মশাস্ত্রে সমদর্শী হওয়ার উপদেশ আছে। আমি উত্তরে বলি - সমদর্শী হওয়ার উপদেশ আছে, কিন্তু সমবর্তী হওয়ার কথা বলে নি। বলা হয়েছে, সমদর্শী হয়ে যাও, কাউকে ঘৃণা করো না। দেখো ভাই দুর্গানন্দ, তুমি ব্যারিষ্টার হয়েছো। তোমার কাছে একটি মামলা, তুলে ধরছি , তুমি এর মীমাংসা করে দাও, তবে ভাই ঠিক হবে।

ভূতের বর সাজার গল্প

এক বরযাত্রীর দল বর বৌ নিয়ে ঘরে ফিরছে। ফিরবার পথে মাঠের মধ্যে এক ভূত ছিল। ভূতটি বরের বেশ ধরে সেই দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে বলতে লাগল, আরে আমার বউকে নিয়ে তোমরা কোথায় চলেছো? ওকে আমার সঙ্গে ছেড়ে দাও। এই বলে সে ঝগড়া শুরু করে দিল। বরযাত্রীরা দেখল – দুই বরই এক রকম দেখতে, তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। এখন প্রকৃত বর কে - এর মীমাংসা কীভাবে হবে? তখন তারা সবাই রাজার কাছে গেল। রাজাও মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন। তখন অন্য কোন উপায় না দেখে রাজা বৌটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তোমার বর তুমিই বলো। বৌটি একবার একে দেখে আর একবার ওকে দেখে কিন্তু কিছুই সে ঠিক করে বলতে পারল না। রাজাও এ সমস্যার কোন মীমাংসা করতে পারলেন না। বল ভাই দুর্গানন্দ, তুমি তো একজন ব্যারিষ্টার। তোমার কাছে এই মামলা তুলে ধরা হলে তুমি এর মীমাংসা কোন রীতিতে করবে?

দুর্গানন্দ ঃ এই রকম মামলা সময় সময় মীমাংসার জন্য উপস্থাপিত হয়। 'ভাওয়ালের এক মামলা কোর্টে চলাকালীন ভাওয়ালের যিনি রাজা, তাঁকে একজন বাইরে থেকে আসা লোক বলছে – আপনি প্রকৃত রাজা নন। তাহলে ভাওয়ালের প্রকৃত রাজা কে — এই নিয়ে মামলা এখনও চলছে। আজ পর্যন্ত মীমাংসা হয় নি।'

শ্রীশ্রীগুরু ঃ আচ্ছা ভাই, আমার মামলা আমিই মীমাংসা করে দিচ্ছি। বরযাত্রীর দল রাজার কাছে যখন মীমাংসা করতে পারলো না তখন নিরাশ হয়ে বৌ-এর সঙ্গে দুই বরকে নিয়েই আবার রওনা হল। চলতে চলতে তারা এক মাঠে এসে গেল। এখানে রাখাল ছেলেরা গরু চরাতে এসেছে। গরুর পালকে ছেড়ে দিয়ে তারা সবাই খেলায় মেতে উঠল। কেউ হল রাজা, কেউ হল মন্ত্রী, কেউ বা পাত্র মিত্র সেপাই। যে রাজা হয়েছে সে বসেছে একটা মাটির ঢিপির ওপর, সেই মাটির ঢিপিই হল তার সিংহাসন। রাজা দেখতে পেল – এক বরযাত্রীর দল ঝগড়া করতে করতে চলেছে। রাজা তখন তার সেপাইদের হুকুম দিল – 'দেখে এসো ওরা কেন ঝগড়া করছে আর ওদের আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো। ওদের বোলো, আমি ওদের ঝগড়া মিটিয়ে দেব।' সেপাইরা তখনই তাদের কাছে ছুটে গিয়ে বলল, 'তোমরা আমাদের সঙ্গে এসো। আমাদের রাজা বিচার করে তোমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দেবে।' খেলার রাজা ঝগড়া মেটাবে শুনে বরযাত্রীর দল তো অবাক। যা হোক বরযাত্রীর দল সেপাইদের সঙ্গে এসে রাজার কাছে সব ঘটনার কথা বলল, রাজা বললেন, 'তোমরা চিন্তা করো না, আমি সব গোলমাল মিটিয়ে দিচ্ছি। তোমরা একশোটা ছিদ্র করা একটা ঘড়া আমার কাছে নিয়ে এসো।' রাজার কথা মত বরযাত্রীরা সেই রকম একটা ঘড়া নিয়ে এল। রাজা বলল, 'বউটির বর বলে তোমরা দুজনে তো দাবী করছ। যে এই ঘড়ার মধ্যে ঢুকে এই একশো ছিদ্র দিয়ে বেরুতে পারবে, সেই হল মেয়েটির আসল বর।'

এই কথা শুনে ভূত তো মহা খুশি, সে তো ভূত, তার অসাধ্য কাজ কিছু নেই। সে তখনই সেই ঘড়ার মধ্যে ঢুকে একশো ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে এসে রাজাকে বলল, 'এবার আমার বৌকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।' রাজা অমনি বলে উঠল, 'বটে, তুই চালাকি পেয়েছিস? তুই নির্ঘাত ভূত, নইলে মানুষ কখনও ওভাবে ঘড়ার মধ্যে ঢুকতে আর বেরুতে পারে না।'

এখনই এখান থেকে পালিয়ে যা, নইলে ভালো হবে না বলছি। রাজার কথা শেষ হতে না হতেই বরযাত্রীর দল ভূতকে পেটাতে শুরু করল। বেগতিক দেখে ভূতও তখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে ছাড়তে সেখান থেকে ছুটে পালাল।

এদিকে দেশের যিনি রাজা, তিনি যখন শুনলেন যে বিচার তিনি নিজে

করতে পারেন নি সামান্য এক রাখাল সেই বিচার করে দিয়েছে তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কী করে এটা সম্ভব হল তা জানবার জন্য তিনি সেই মাঠে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন মাটির এক ঢিবিকে সিংহাসন করে রাখাল তার উপরে রাজা সেজে বসে আছেন। তিনি তখন সেই ঢিপি খুঁড়তে হুকুম দিলেন। ঢিপি খুঁড়তেই সেখানকার মাটির নিচে থেকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন বেরিয়ে পড়ল। তখন রাজা বুঝতে পারলেন যে রাখাল ওখানে বসে ছিল বলেই তার মগজে বিক্রমাদিত্যের মতো প্রখর বুদ্ধি খুলে গিয়েছিল। তাই সে এত সহজে এত বড়ো এক সমস্যার মীমাংসা করতে পেরেছে। নইলে সাধারণ এক রাখালের মধ্যে এতখানি বুদ্ধি কি থাকতে পারে?

দেখো ভাই দুর্গানন্দ, এখন তোমার বুদ্ধি খোলসা হওয়া দরকার। তোমার কাছে এ রকম শক্ত মামলা আসে তো? দেখো ভাই, বুদ্ধি রাজার মতো হবে আর শরীর হবে চাষার মতো, তবেই সব ঠিক ঠাক হবে অর্থাৎ বুদ্ধি হবে ব্রহ্মবেত্তার আর শরীর হবে সংসার করবার উপযোগী – এটাই তাৎপর্য। দেখো ভাই দুর্গানন্দ, এখন তুমি তোমার মনকে কিছু কাজে লাগাও। কিছু বিশেষ কাজে যদি মন নিযুক্ত থাকে, তবে ওই মন শোক দুঃখ করবার সময় পাবে না। এ সম্পর্কে একটি মজার দৃষ্টান্তস্বরূপ গল্প আমি তোমাকে শোনাচ্ছি।

মনিরাম ভূতের গল্প

এক রাজা ছিল। তাঁর এক বিনা বেতনের চাকর জুটে গেল। চাকরটির নাম মনিরাম ভূত। কাজে নিযুক্ত হবার সময় মনিরাম রাজার সঙ্গে এই শর্ত করে নিল যে, সর্বক্ষণ তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে, এক মুহূর্তও তাকে বসিয়ে রাখা চলবে না। তাছাড়া সব সময় সে রাজার কাছে কাছে থাকবে, রাজা যেখানেই যান না কেন তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। রাজা রানীর কাছেই থাকুন, আর ঘুমোতেই যান বা খেতেই বসুন, মনিরামকে কখনো কাছছাড়া করা চলবে না। অদ্ভুত ক্ষমতা মনিরামের। কাজের কথা বলতে না বলতেই চোখের পলকে সে সেই কাজ করে দেয়। রাজা খুব খুশি হলেন। কিন্তু দু চার দিন বাদেই মনিরামকে দেবার মতো কাজ রাজা আর খুঁজে পেলেন না। এদিকে মনিরামও নাছোড়বান্দা। কাজ কাজ করে সে রাজাকে পাগল করে তুলল। তার কাজের তাগাদার জ্বালায় রাজা অস্থির হয়ে কী করে মনিরামের

হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, দিনরাত এই চিন্তায় তাঁর শরীর ভেঙে পড়তে লাগল। এই রকম দুশ্চিন্তার সময় রাজা একজন সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করলেন। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'শিষ্য, তুমি কেন এত কাতর ও দুর্বল হয়ে পড়েছ?' রাজা বললেন, 'গুরুদেব, আমি বড় দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছি। আমার বিনা মাইনের এক চাকর জুটেছে, সে এক মুহূর্তের জন্যও কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। তার জন্য এত কাজ কোথায় পাই – এই চিন্তাতেই আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। আপনি দয়া করে এর একটা বিহিত করে দিন।' গুরুদেব তখন হেসে বললেন, 'তুমি কোন চিন্তা কোরো না। আমি একটা উপায় বলে দিচ্ছি। তোমার উঠোনে ঐ যে বাঁশটা পোঁতা রয়েছে, মনিরামকে বলে দাও ঐ বাঁশ ধরে সে ওঠানামা করুক। যতক্ষণ তুমি তাকে অন্য কাজ দিতে না পারছ ততক্ষণ সে কেবল বাঁশের উপর উঠবে আর নামবে।'

গুরুদেবের কথামতো রাজা তখনই মনিরামকে বললেন, 'যাও, এখন ঐ বাঁশের উপর ওঠানামা করতে থাকো, এই কাজই এখন তোমাকে দিলাম। অন্য কোন কাজের দরকার পড়লে তখন তোমাকে ডাকব।' মনিরাম আর কী করে, রাজার হুকুম মান্য না করে তার উপায় নেই। সে তখন বাঁশ ধরে ওঠানামা করতে লাগল। এইভাবে মনিরাম ভূতও জব্দ হল, রাজাও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচলেন।

এই গল্পের তাৎপর্য হল যে, মন সদা সর্বদা জীবাত্মারূপী রাজাকে বিষয়ের দিকে টানছে। তাতে জীবাত্মারূপী রাজা বড় পীড়া বোধ করতে থাকে। যার সদ্‌গুরু মিলে যায় সেই গুরুই তখন তাকে বলে দেন – মনিরামকে অর্থাৎ মনকে প্রাণায়ামরূপী বাঁশের ওপর ওঠাও আর নামিয়ে দাও। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে সব সময় মনকে নিযুক্ত করে রেখে দাও। তা হলে মন জব্দ হয়ে যাবে। অর্থাৎ মন স্থির হয়ে যাবে, মন তখন বিষয়ের দিকে আর ছুটবে না। জীবাত্মা সুস্থ হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলে যাবে। মনকে কখনো খালি রেখো না, তা না হলে সে তোমার উপর উৎপাত করবে, তোমাকে কষ্ট দেবে।

দেখো ভাই দুর্গানন্দ, যে সাধক শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখে, তার ব্যবহার জগৎ ও পরমার্থ দু ক্ষেত্রেই মঙ্গল হয়। এমন নয় যে, তার শুধু পরমার্থ হবে, ব্যবহার কার্য হবে না। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া এমনই অমূল্য বস্তু যে,

এর সহায়তায় ব্যবহার ও পরমার্থ দুই হবে। কেমন করে? যেমন করে গঙ্গা মাতার দুই তটই উদ্ধারকারিণী হয়ে থাকে। মনকে যদি নিয়ত শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে নজর রাখবার অভ্যাস করানো যায়, তাহলে তোমার সব কাজ সিদ্ধ হবে, অসাধ্য কাজও সহজসাধ্য হয়ে যাবে এবং অনায়াস লব্ধ হবে। এই ক্রিয়ার প্রণালী 'পবন বিজয় স্বরোদয়' শাস্ত্রে খুব ভালভাবে বর্ণনা করা আছে। কিন্তু শাস্ত্রের লেখা দেখে এটি আয়ত্ত করা খুবই মুস্কিল। এই বিদ্যা গুরুর মুখ থেকে শুনে তবেই আয়ত্ত করতে হবে।

নবম পর্ব

স্থান— তপোবন পাহাড় ঃ ১৩১৮ সাল : বৈশাখ মাস

সময়– সকাল

নাড়াজোল স্টেটের ম্যানেজার ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

ও

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[সাধুর সামর্থ পরশমণির থেকেও বেশী ঃ ভণ্ড বা নকল সাধুর কি কল্যাণ হয় ঃ ধর্মের ভানও ভালো, এ সম্পর্কে গল্প ঃ সত্ত্বগুণ রজোগুণ ও তমোগুণ, এই তিনগুণের প্রভাব, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করতে হবে ঃ আহারের সঙ্গে মনের সম্পর্ক, সাত্ত্বিক আহার করতে হবে ঃ স্থানভেদে লোকেদের প্রকৃতিভেদ ঃ দেশভেদে নিষিদ্ধাচরণও শুদ্ধ বলে আচরিত হয় ঃ আপদকালে নিষিদ্ধ বস্তু আহারও চলে ঃগীতা শাস্ত্র অনুসারে সাত্ত্বিক আহার, রাজসিক আহার ও তামসিক আহার ঃ সাত্ত্বিক আহারে যেমন সত্ত্বগুণ বাড়ে তেমনি সাত্ত্বিক বস্তু ব্যবহারেও সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায় ঃ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়ার উপায় হল সৎসঙ্গ, সাধুসঙ্গ ঃ সৎসঙ্গ ও সাধুসঙ্গের প্রভাব ঃ ক্ষণিকের সৎসঙ্গের প্রভাবের গল্প ঃ ক্ষণিকের সাধুসঙ্গের প্রভাবের গল্প ঃ নারদের উপর সাধুসঙ্গের প্রভাব।]

স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গবাসী সংবাদ পত্রের প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তারপর নাড়াজোল এস্টেটের ম্যানেজার হন, ইনি গুরুমহারাজের একজন প্রিয় শিষ্য এবং মহাপুরুষ বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন। গুরুভক্ত কৃষ্ণবাবু একদিন তপোবনে গুরুমহারাজকে দর্শন করতে গিয়ে তাঁকে বললেন –

কৃষ্ণবাবু ঃ আপনি হলেন পরশমণি, আমাদের লৌহ সদৃশ হৃদয় আপনার পরশ পেয়ে সোনা হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই কৃষ্ণ, তুমি তো আমার পদমর্য্যাদা কমিয়ে দিয়েছ। পরশমণির চেয়ে বেশি সামর্থ সাধুর আছে। এ সম্পর্কে একটি দোঁহা তোমাকে শোনাচ্ছি।

পরশমণির দোঁহা

প্রশ্ন ঃ শঠ শূদ্রে সৎ সঙ্গৎ পাওয়ে।
পরশ পরশ কো ধাৎ ছুয়ায়ে
উত্তর ঃ সান্ত ঔর পারশকো বড়া হী অন্তর জান –

উয়ো লোহাকো কাঞ্চন করে
য়ে করে আপ সমান।

প্রশ্নের অর্থ – শঠ, শূদ্র ব্যক্তিও যদি কোন সময় সৎসঙ্গ পায় তাহলে কি হয় – পরশমণির সঙ্গে লোহার সংযোগ হলে লোহা সোনা হয়ে যায়, তেমনি শঠ, শূদ্র ব্যক্তিও সাধু সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গ লাভ করলে তারা সাধুর স্বভাবপ্রাপ্ত হয়।

উত্তরের অর্থ ঃ সাধু সজ্জন ব্যক্তিতে আর পরশমণিতে বহু ফারাক জানবে, যেহেতু পরশমণি লোহাকে সোনা করে দিতে পারে, কিন্তু পরশমণি করে দিতে পারে না অর্থাৎ নিজের স্বরূপ দিতে পারে না, কিন্তু সাধু ব্যক্তির এতই সামর্থ, যে তাঁর সঙ্গ করবে, তাকে তিনি আপন স্বরূপ দান করতে পারেন, অর্থাৎ একেবারে সাধু করে দিতে পারেন।

এখন বোঝো ভাই কৃষ্ণ, পরশমণির চেয়ে অধিক সামর্থ্য সাধুর আছে। কীভাবে? যেমন পরশমণির গুণ হল – লোহাকে সোনা করে দেয় কিন্তু পরশমণি করে দেবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু সাধুর এতই সামর্থ্য যে নিজের শিষ্যকে আপন স্বরূপ অনুযায়ী প্রস্তুত করে নেন। অর্থাৎ পরশমণির লোহাকে পরশমণি বানানোর ক্ষমতা নেই। কিন্তু সাধুর এতই শক্তি যে তিনি আপন শিষ্যকে সাধুতে পরিণত করে দেন। তাহলে বোঝো ভাই, পরশমণির থেকে সাধুর সামর্থ্য অধিক আছে, কি অধিক নেই?

কৃষ্ণবাবু ঃ মহারাজ, আজ বুঝলাম, পরশমণির থেকে সাধু অধিক দামি মণি। পরশমণি লোহাকে সোনা বানিয়ে দেয়। কিন্তু কাঠকে সোনায় পরিণত করতে পারে না, সাধু কিন্তু যাকে কৃপা করেন তাকেই তিনি নিজ স্বরূপ প্রদান করেন। তাঁর কৃপায় দুর্মতি ব্যক্তিও সাধুভাবাপন্ন হয়ে যায় – এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মহারাজ, পরশমণির সাথে আমি সাধুর তুলনা করতে গেলাম, এ কারণে এখন আমার লজ্জা হচ্ছে। হে দেব, এখন আমার মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছে – অনেক নকল সাধু আমার নজরে আসছে – ও সব লোক তো ভণ্ড? ও সব লোকদের কি কল্যাণ হবে না?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ বাছা, ওদেরও কল্যাণ হবে, তবে কিছু দেরিতে হবে। ও সব লোকও নকল করতে করতে আসল বস্তুতে পৌঁছে যাবে। এ সম্পর্কে

এক কাহিনি তোমাকে শোনাচ্ছি –

ধর্মের ভানও ভালো

এক প্রভাবশালী রাজা ও তাঁর পরমাসুন্দর রানী ছিলেন। রানী থাকেন সাত মহলা রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে। তাঁকে বাইরের কোন পুরুষ কোনদিন দেখেনি।

একদিন রানীর অসামান্য রূপ এক মেথরের চোখে পড়ল। কী করে? যে মেথরানী অন্দর মহলের পায়খানা পরিষ্কার করে, সেদিন তার খুব অসুখ। অথচ সে কাজে যেতে না পারলে পায়খানা পরিষ্কার হবে না, ফলে রানী মা রাগ করবেন। রানীমা রাগ করলে তার চাকরি চলে যাবে আর চাকরি যদি চলে যায় তাহলে তাদের সবাইকে না খেয়ে মরতে হবে। এসব ভেবে মেথরানী তার স্বামীকে বলল, 'আজ তুমিই রাজবাড়ির অন্দরমহলের পায়খানা পরিষ্কার করে এসো। তবে তোমাকে কিন্তু মেয়ে সেজে যেতে হবে। আমার কাপড়চোপড় পরে তুমি যাও, তাহলে কেউ তোমাকে পুরুষ বলে চিনতে পারবে না। সাবধানে কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। তুমি না ফেরা পর্যন্ত আমার দুশ্চিন্তা কিন্তু ঘুচবে না।'

মেথর বউয়ের কাপড় পড়ে মেয়ে সেজে রাজবাড়ির অন্দরমহলে গিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করল। চলে আসবার সময় সে হঠাৎ দূর থেকে রানীকে দেখতে পেল। দেখেই তো তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। এমন রূপ সে কখনও দেখেনি। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়, এই মনে করে সে বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি ফিরে এসে মেথর সুস্থির থাকতে পারল না। কেবলই তার মনের মধ্যে রানীর সেই অপরূপ রূপ ভেসে উঠতে লাগল। তার আহারে রুচি রইল না, চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেল। তার শরীর শুকিয়ে যেতে লাগল। দিনরাত রানীর রূপের চিন্তা করতে করতে সে যেন উন্মাদ হয়ে গেল। তখন তার একমাত্র চিন্তা হল, যে করেই হোক রানীকে অন্তত একদিনের জন্য হলেও কাছে পেতে হবে। অথচ মুখ ফুটে একথা কাউকে বলা যাবে না। একবার যদি রাজার কানে যায় তাহলে তখনই তিনি তার গর্দান নিয়ে নেবেন। মনের চিন্তা চেপে রেখেই মেথরের দিন কাটতে লাগল।

স্বামীর এই শোচনীয় অবস্থা মেথরানীর নজর এড়ালো না। সে তখন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, 'কদিন ধরে তোমার কী হয়েছে বলো তো? কোনো অসুখ

করেছে? তাহলে বলো, আমি রাজবাড়ি থেকে ওষুধ নিয়ে আসছি, ওষুধ খেলে রোগ সেরে যাবে।'

মেথর বলল, 'না, না, অমন কাজ কোরো না। আমার যা রোগ হয়েছে তা কাউকে বলবার মতো নয়। কেউ শুনতে পেলে ঘাড়ের উপর আর মাথা থাকবে না।' মেথরানী তার স্বামীকে বড় ভালবাসত। তাই সে স্বামীকে বলল, 'তুমি আমার কাছে কিছু গোপন কোরো না। তোমার রোগের কথা সব খুলে বলো, আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব যাতে তোমার আরাম করতে পারি।' অনেক পীড়াপীড়ির পর মেথর সব কথা জানিয়ে শেষে বলল, 'রানীকে অন্তত একবার কাছে না পেলে আমি মরে যাবো, তোমরা কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না।' স্বামীর কথা শুনে মেথরানীর ভয়ানক চিন্তা হল। তবু সে স্বামীকে নানাভাবে আশ্বস্ত করে বলল, 'তুমি আর মন খারাপ করে থেকো না, যেমন করে হোক আমি তোমার সঙ্গে রানীমার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবো।'

পরের দিন, মেথরানী রাজবাড়িতে কাজ করতে গিয়ে রানীর সঙ্গে দেখা করল। রানী ছিলেন যেমন সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতী। লোকজনের প্রতি তাঁর দয়ার অন্ত ছিল না। মেথরানীর শুকনো মুখ দেখে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ রে তোর মুখ অমন শুকনো দেখছি কেন? কী হয়েছে তোর?' মেথরানী বলল, 'রানীমা, আমার দুঃখের কথা কী করেই বা বলি, সে কথা কাউকে বলবার নয়।' রাণী বললেন, 'তুই আমার কাছে সব কথা খুলে বল, দেখব আমি কী করতে পারি।' মেথরানী বলল, 'না রানীমা, সে কথা মুখে আনতে আমার ভয় হয়। শুনলে আপনি এখুনি হয়তো আমার মাথা কেটে নেবার হুকুম দেবেন।' এ কথায় রানীর বড় কৌতুহল হল। তিনি মেথরানীকে বললেন, 'তোর কোনো ভয় নেই। আমি কথা দিচ্ছি তোর কোন ক্ষতি হবে না। তুই নির্ভয়ে যা বলবার আমাকে বল।'

মেথরানী প্রথমে খানিকটা কেঁদে নিল তারপর একে একে তার স্বামীর সব কথা সে রানীকে শোনাল। নিজের অসুখ হওয়ায় কেমন করে তার স্বামী শাড়ী পরে মেয়ে সেজে রাজবাড়িতে পায়খানা পরিষ্কার করতে এসেছিল, তারপর রানীমাকে দেখে কেমন করে তার মাথা ঘুরে গেল, সে সব কথা রানীকে শুনিয়ে মেথরানী বলল, 'রানীমা, আপনাকে দেখে অবধি সে অন্নজল ত্যাগ করেছে, দিনরাত কেবল বলছে – একবার রানীমাকে আমার কাছে এনে দাও, তাঁকে

কাছে না পেলে আমি বাঁচব না। রানীমা, এমন অবুঝ মানুষকে নিয়ে কী করব ভেবে পাচ্ছি নে। আমার কপালে হয়তো বৈধব্য ঘনিয়ে এল।' এই বলে মেথরানী আবার কান্না জুড়ে দিল।

রানীর দয়ার শরীর। সব শুনে তিনি খুব দুঃখ পেলেন। তখন মেথরানীকে বললেন, 'হায়রে পোড়াকপাল, শেষে মেথরের এই দুর্মতি হল। আমি যে রাজরানী। আমার সঙ্গে কি যে কেউ দেখা করতে পারে? তবে তোর স্বামীকে একবার জিজ্ঞাসা করে আয়, আমি যা যা বলব তা সে করতে রাজি আছে কিনা। যদি সে রাজি থাকে, তাহলে হয়তো একদিন আমার সঙ্গে দেখা করবার একটা উপায় হতে পারে।'

মেথরানী তখন বাড়ি গিয়ে মেথরকে সব কথা জানাল। মেথর বলল, 'রাণীমাকে একবার কাছে পাওয়ার জন্য তিনি যা যা করতে বলবেন তাতেই রাজি আছি।' মেথরানী রাজবাড়িতে গিয়ে রানীকে সব কথা জানাবার পর তিনি বললেন, 'তোর স্বামীকে বলিস গভীর জঙ্গলে গিয়ে সাধু সেজে বসে থাকতে। সে যেন গৈরিক কৌপিন পরে, রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে আর গায়ে ছাই মেখে কোনো গাছতলায় চোখ বুঁজে বসে থাকে। কারুর সঙ্গে কথা বলা চলবে না, কারুর সামনে কিছু খাওয়া চলবে না। এইভাবে সে যদি ছ'মাস বসে থাকতে পারে, তাহলে হয়তো আমার সঙ্গে তার দেখা হওয়ার একটা উপায় হতে পারে।'

অবাক হয়ে রানীর কথা শুনছে মেথরানী। রানী তখন বলতে লাগলেন, 'আমাদের মধ্যে কীভাবে দেখা হবে তার উপায় বলে দিচ্ছি। এ রাজ্যের প্রজারা সবাই ধর্মপ্রাণ। ওরা যখন শুনবে যে জঙ্গলে এক বড় সাধু এসে আসন পেতেছে, তখন তারা দলে দলে তাকে দর্শন করতে ছুটবে। মেথর যে নকল সাধু তা তারা বুঝবে না। এদিকে রাজ্য শুদ্ধ লোক সাধুকে দর্শন করতে যাচ্ছে দেখে রাজার পাত্রমিত্ররাও তার কাছে যেতে শুরু করবে। তখন রাজাও আর চুপ করে বসে থাকতে পারবেন না। তিনিও যাবেন সাধু দর্শনে। রাজার এখনও দীক্ষা হয়নি। তাহলে তিনি নিশ্চয় এই সাধুর কাছে দীক্ষা নিতে চাইবেন। রাজা তো একলা দীক্ষা নিতে পারেন না, শাস্ত্রমতে তাঁকে সস্ত্রীক দীক্ষা নিতে হবে। রাজার দীক্ষা হয়ে যাবার পর যখন তিনি বাইরে চলে আসবেন তখন সমস্ত

লোকজন সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে আমি একলা দীক্ষা নেবার ছল করে তোর স্বামীর কাছে যাব। তখন তোর স্বামীর মনস্কামনা পূর্ণ করে দেব। তবে মেথরকে বলিস খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। রাজা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারেন – এ নকল সাধু, তাহলে আর রক্ষে থাকবে না, নির্ঘাত তিনি ওকে ফাঁসিতে ঝোলাবেন।'

মেথরানীকে এইভাবে বুঝিয়ে সুজিয়ে রানী তার হাতে অনেক সোনারুপো হীরে জহরৎ দিয়ে বললেন, 'মেথরকে বলিস, সে যখন নকল সাধু হয়ে বসবে তখন যেন তার সামনে একটা বেশ বড়ো ধুনি জ্বালিয়ে রাখে, সেই ধুনির যে ছাই হবে, সেই ছাইয়ের মধ্যে এই সব মণিমুক্তো যেন ভালো করে মিশিয়ে রাখে। আর লোকে সাধু দেখতে এলে বিভূতি বলে তাদের হাতে এক মুঠো ছাই যেন তুলে দেয়। ছাইয়ের মধ্যে থেকে মণিমুক্তো বেরুতে দেখে মানুষ অবাক হয়ে ভাববে – এ সাধু নিশ্চয় কোনো সিদ্ধমহাপুরুষ, নইলে ছাই থেকে কখনো হীরে জহরৎ বেরোয়! এর থেকেই দেখবি মস্ত বড় সাধু বলে তার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।'

রানীর পরামর্শমতো সব কাজ যথাযথ ভাবে হয়ে গেল। মেথর জঙ্গলে গিয়ে সাধু সেজে এক গাছের তলায় চোখ বুজে বসে রইল। সে কথা বলে না, লোকজন এসে পড়লে তাদের হাতে এক মুঠো করে বিভূতি দেয়। ছাই থেকে মণিমুক্তো বেরুতে দেখে মানুষ অবাক হয়ে ভাবে এ সাধু নিশ্চয় একজন সিদ্ধপুরুষ। তখন এক কান থেকে আর এক কান হয়ে সারা রাজ্য জুড়ে সাধুর নাম ছড়িয়ে পড়ল। সাধুকে দেখতে দলে দলে লোক আসতে লাগল। রাজা তখন পাত্র মিত্রদের সঙ্গে সাধু দর্শন করতে এলেন এবং তার কাছে দীক্ষার জন্যে প্রার্থনা জানালেন। মেথর বলল, সস্ত্রীক দীক্ষা নেওয়াই শাস্ত্রীয় বিধি। সকলের পরামর্শ অনুসারে নির্দিষ্ট দীক্ষা নেবার দিনে রাজা রানীকে সঙ্গে নিয়ে চারদিকে পর্দাঢাকা দোলায় চড়ে সাধুর কাছে এলেন। প্রথমে রাজার দীক্ষা হয়ে গেল। কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে রাজা গুরুদেবকে প্রণাম করলেন। পাত্রমিত্র যারা সেখানে ছিল তারাও রাজগুরুকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে প্রণাম করতে লাগল।

এবার রানী দীক্ষা নেবার ভান করে সাধুর কাছে এলেন। রানীমা আসছেন, তাই সাধুর কাছ থেকে সব লোককে সরিয়ে দেওয়া হল। রানী একলা এসে

দাঁড়ালেন সাধুর সামনে। সাধুরূপী মেথরকে তিনি বললেন, 'ওরে মেথর, এতদিনে তোর মনস্কামনা পূর্ণ হল। আমি নিজে আজ তোর কাছে এসেছি। এবার আমাকে নিয়ে তুই কী করতে চাস বল।' রানীর কথা শোনামাত্র মেথর তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, 'মা, তুমিই হলে আমার গুরু, আর আমি হলাম তোমার শিষ্য। আজ থেকে তোমাতে আমাতে মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ হল। মাগো, তুমি আমাকে নকল সাধু হবার পরামর্শ দিয়েছিলে, সেই নকল সাধুরই আজ কত সম্মান। স্বয়ং রাজা তার পায়ে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা ঢেলে দিয়ে তার সামনে জোড়হাত করে দাঁড়িয়েছেন, স্বয়ং রানীমা এসেছেন তার কাছে। নকলেরই যখন এত সম্মান, তখন আসল সাধু হতে পারলে যে কী লাভ হবে তা আমি কল্পনা করতে পারছি না।'

রানী তখন বললেন, 'দেখো, আমি তোমাকে ধর্মের ভান করতে শিখিয়ে দিয়েছিলাম, কেন জানো? আমি জানতাম ধর্মের ভান করতে করতেই একদিন তোমার মধ্যে প্রকৃত ধর্মের ভাব জেগে উঠবে। আমাকে পাবে বলে কী কঠোর তপস্যাই না তুমি করেছ, দীর্ঘকাল চোখ বুঁজে আহার ও বাক্যের সংযম করে দিন কাটিয়েছ। এভাবে ইন্দ্রিয় সংযমের ফলে তোমার মধ্যে সাত্ত্বিকী বৃত্তির স্ফুরণ হয়েছে। তোমার ভিতরকার যত মলিনতা সব দূর হয়ে গেছে। তোমার চিত্ত এখন নির্মল হয়েছে। তোমার আর কোন ভয় নেই, এবার তুমি সাধুর ভান ছেড়ে দিয়ে সত্যধর্মের দিকে মন দাও, নকল ছেড়ে আসল সাধু হয়ে যাও।' এই উপদেশ মেথরকে দিয়ে রানীমা চলে গেলেন। মেথর প্রকৃত সাধু হয়ে ঈশ্বর অনুসন্ধানে অর্থাৎ আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হল।

গল্পটি শুনে কৃষ্ণবাবু বললেন, 'গুরুদেব, আজ এই দৃষ্টান্ত শুনে আমার খুব আনন্দ হল, আর এই বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করলাম। আগে আমার মনে ধারণা ছিল, যে ধর্মের ভান করে তার তো কিছু কল্যাণ হয় না, উপরন্তু পাপ বেড়ে যায়। ধর্মের ভান করতে করতে তা থেকে মানুষের এত সৎবৃত্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে – এতদিন আমার জানা ছিল না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই কৃষ্ণ, বাহ্য দমন থেকে মেথরের কেমন অন্তরদমন হয়ে গেল। বাহ্য দমন থেকে কখন অন্তরদমন হয়। আবার কখন অন্তরদমন থেকে বাহ্যদমন হয়, কেউ বাইরে থেকে ভিতরের দেবত্বকে ফুটিয়ে তুলছে,

কেউ বা ভিতর থেকে নিজের দেবত্বকে বাইরে প্রকাশ করছে। বাইরের সংযম থেকে মেথরের অন্তরের সংযম হয়ে গেল. পরনারী গ্রহণের ইচ্ছা তার চলে গেল, পরিবর্তে তার মধ্যে সত্ত্বভাবের স্ফুরণ হল, তার চিত্ত শান্ত ভাব ধারণ করল।

সাত্ত্বিক বৃত্তি মানুষকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। মানুষের একই মন – সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক – এই তিনগুণের বশীভূত হয়ে তিন প্রকারের কর্ম করে থাকে। মানুষের মনের গতি যখন পা থেকে নাভীমণ্ডল পর্যন্ত থাকে তখন ওই সময় তমোগুণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। মনের গতি যখন নাভীমণ্ডল থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত থাকে, তখন রজোগুণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, আর কণ্ঠ থেকে ভ্রুমধ্য পর্যন্ত যখন মনের গতি থাকে তখন ওই সময় সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়। মানুষের যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হয় তখন তার চিত্তমল একেবারে প্রক্ষালন হয়ে যায়। তখন তার মধ্যে ২৬টি সৎবৃত্তি জাগ্রত হয়। যথা ঃ নির্ভীকতা, চিত্তপ্রসাদ, জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, তপঃ, স্বাধ্যায়, সরলতা, সর্বভূতে দয়া, নির্লোভতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অন্তরবহির্শুদ্ধি, জিঘাংসারাহিত্য ও অনভিমানিতা। সত্ত্বগুণের উদয় হলে এই ২৬টি বৃত্তি মানুষের হয়ে থাকে। এইসব বৃত্তির সহায়তায় মানুষ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়। সত্ত্বগুণ মানুষকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেয়। আর যে ব্যক্তির মধ্যে রজ ও তমো গুণ প্রবল হয় তার মনের মধ্যে ৬টি অসৎ বৃত্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। এগুলি হল, দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কর্কশতা ও অজ্ঞতা। এই সকল বৃত্তি মানুষের বন্ধন বৃদ্ধি করে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়। রজো ও তমোবৃত্তির যাতে বেশি স্ফুরণ না হয়, এ বিষয়ে সদা সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে। সত্ত্ববৃত্তি বাড়াতে হবে। এখন দেখতে হবে কোন্ রীতি অনুযায়ী সত্ত্ববৃত্তি বৃদ্ধি পাবে। তার জন্য সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার করতে হবে, সাত্ত্বিক দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে। এতে সাত্ত্বিক বৃত্তি বাড়বে। আহারের সঙ্গে শরীরের মনের গতি, নির্ভর করে থাকে। যেমন মাছ, মাছ খাওয়া বড়োই খারাপ। 'মীনঃ সর্বভক্ষ্যাণি'

অর্থাৎ মৎস্য সর্বপ্রকার কুৎসিত দ্রব্য খায় - মড়া, বিষ্ঠা, গলা পচা ইত্যাদি। এদের বীজানু মাছের মধ্যে রয়ে যায়। যে ব্যক্তি মাছ খায় সে মাছের সঙ্গে সব কিছু অখাদ্য খেয়ে নেয়। মাছ মাংস খেলে রজো আর তমোভাব বৃদ্ধি

পায়। মাছ মাংস খেলে মানুষের রোগ হয়ে থাকে। আমি দেখেছি বাংলাদেশে ডাক্তাররা এমন সব কঠিন কঠিন রোগের নাম বলে, যেসব রোগের নাম আমরা কখনো শুনিনি। এর কারণ কী? বাংলাদেশে এত রোগ কেন হয়ে থাকে? আমার ধারণা বাঙালি মাছ-মাংস খায় বলে তাদের মধ্যে এত কঠিন রোগ জন্মায়। মাছ মাংস মানুষের উপযোগী খাবার নয়। যেসব জানোয়ার মাংসাশী তাদের দাঁতের অগ্রভাগ খুব তীক্ষ্ম হয়, যেমন সিংহ, বাঘ, কুকুর, বিড়াল। যেসব জানোয়ার গাছপালা খায় তাদের দাঁত হয় চ্যাপ্টা, যেমন গরু, ছাগল, বাঁদর ইত্যাদি। মানুষের দাঁতও এই রকমের। খাওয়ার বাধা নিষেধ না মেনে মানুষ মাছ মাংস খায়, খেলে হজম করতে পারে না, আর তার ফলে রোগে ভোগে। কেউ কেউ আমাকে বলে, মহারাজ, মাছ-মাংস না খেলে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। আমি তাদের বলি, তা হতেই পারে না, একথা আমি মানব না। হাতি, ঘোড়া, তো মাংস খায় না, তাদের শক্তি কি কম? পশ্চিমের লোকেরা মাছ মাংস খায় না, ডাল রুটি খায় ওদের মতো শক্তিমান তুমি কোথায় পাবে? এ সম্পর্কে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে –

'পূরব রোগী, পশ্চিম শোকী,
উত্তর যোগী, দক্ষিণ ভোগী।'

অর্থাৎ ভারতবর্ষের পূর্বভাগে রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। পশ্চিমাঞ্চলে মানুষ অধিক শোকাতুর হয়ে থাকে। পশ্চিমদেশে যদি কেউ আত্মীয় মারা যায় তাহলে লোকে শোকে এমনভাবে বুক চাপড়ায় ও মাথা ঠোকে যে রক্ত পর্যন্ত বেরিয়ে যায়। ভারতবর্ষের উত্তরদিকে যোগী লোক বাস করে থাকে। আর দক্ষিণদিকে ভোগী প্রধান লোক বাস করে।

চারদেশের চার বিশেষ দোষের কথাও বলা হয়েছে –

'পূরবে মীন ভক্ষামি, পশ্চিমে চর্ম জল
দক্ষিণে মাতুলী কন্যা, উত্তরে মাংসাহারী।'

ভারতবর্ষের পূবদিকের লোক মাছ খায়, এটাই এখানকার লোকেদের প্রধান দোষ। দক্ষিণাঞ্চলে মামার কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয়। এটাই এখানকার লোকেদের দোষ। পশ্চিমদেশে জল পাওয়া যায় না। এখানে কূপ, ইজারা অতি গভীর। এ জন্য চামড়ার মশক দ্বারা জল তোলা হয় এবং এ চর্ম জল অনেকেই ব্যবহার করে। এটি এখানকার মানুষের প্রধান দোষ। উত্তরদিকে হিমালয় অঞ্চলে

অধিকাংশ লোকই নানাবিধ মাংস আহার করে। এটাই এদের প্রধান দোষ। তবে এখানকার সব মানুষই মাংস খায় না, পার্বত্যবাসী লোকেরাই খেয়ে থাকে, এছাড়া উপায় কী? এরা নিরুপায় হয়ে মাংস খায়, বরফের দেশ, এখানে তো শাক সব্জী ধান গম কিছুই হয় না, লোকে খাবে কী? বাধ্য হয়ে প্রাণধারণ করবার জন্য অগত্যা মাংস খেতে হয়। কোন এক যুবক একদিন আমাকে বলল, বাবা আমাদের ধর্মশাস্ত্রে যেমন বেদপুরাণে মাংস খাওয়ার উল্লেখ আছে। মাংস খাওয়া যখন বিধি নয়, তবে ধর্মশাস্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে কেন? আমি তাকে বললাম, দেখো বাপু 'আপত্তিকালে মর্যাদা নাস্তি।' পুরাণে যেসব মাংস খাওয়ার উল্লেখ আছে তার তাৎপর্য হল এই যে, বিপদকাল উপস্থিত, অন্য কোন খাবার পাওয়া যাচ্ছে না, তাই তখন মাংস না খেয়ে উপায় ছিল না। যেমন বিশ্বামিত্র ঋষি কঠোর তপস্যার পর উঠে দেখলেন যে ইতিমধ্যে বারো বৎসরব্যাপী দুর্ভিক্ষে খাদ্য দ্রব্য সব নষ্ট হয়ে গেছে, খাবার তিনি কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারলেন না। কিন্তু পেটের আগুন তো মানবে না, কিছু আহার না পেলে যে প্রাণ চলে যাবে। এক ডোম কুকুরের মাংস সেদ্ধ করছিল, তিনি তার কাছ থেকে কিছুটা মাংস চেয়ে নিয়ে আহার করলেন। তাহলে বিশ্বামিত্র আর কুকুরের মাংস গ্রহণ করলেন না। কেশরীমূল সংগ্রহ করে তা সিদ্ধ করে জীবনধারণ করতে লাগলেন।

পুরাণে আর এক দৃষ্টান্ত আছে। উষস্থ মুনি কী করেছিলেন? একদিন তিনি জঠর-অগ্নির জ্বালা আর সহ্য করতে না পেরে এক হাতীচরানেওয়ালা মাহুতের কাছে গিয়ে বললেন, আমাকে কিছু খেতে দাও। মাহুত বলল, হে মুনি, আমার কাছে কিছু নেই, তোমাকে আমি কী খেতে দেবো। মুনি বললেন, খাদ্য অখাদ্য যা কিছু আছে তাই দাও। তখন মাহুত বলল, বাবা, হাতীর উচ্ছিষ্ট মাসকলাই আছে। মুনি তাতেই রাজি হয়ে খেয়ে নিলেন। এরপরেই মাহুত মুনিকে খাওয়ার জল দিতে গেল। মুনি বললেন, না না আমি তোমার ছোঁয়া জল পান করব না। মাহুত অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, হে মুনি, আপনি হাতীর উচ্ছিষ্ট খেয়ে নিলেন আর আমার হাতের ছোঁয়া জল পান করলেন না, এ কি রকম কথা! তখন মুনি বললেন, আরে, জঠরের জ্বালা ধরেছিল, তাই প্রাণধারণের জন্য হাতীর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে শরীরের বল ফিরে পেয়েছি। এখন তোমার ছোঁয়া জল পান করলে আমার ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে।

এই উদারহণ থেকে আমরা কী বুঝতে পারলাম? বুঝলাম যে, আপত্তিকালে মর্যাদা নাস্তি। আপদ বিপদের সময় কোন বিচার চলে না। পুরাণে যে মাংস খাওয়ার কথা উল্লেখ আছে তা এই প্রকারেরই।

কৃষ্ণবাবু ঃ আপনি যে দিন আমার কাছে এসেছিলেন সেদিন থেকেই আমি আমার ঘরে আর মাছ মাংসের ব্যবহার করি না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ বেশ বাছা, খুব ভালো কথা বলেছ। এতে সত্ত্বগুণ বাড়বে, রজো আর তমো গুণ দূরীভূত হবে।

কৃষ্ণবাবু ঃ মহারাজ, বুদ্ধদেবের জীবন ইতিহাসে পড়েছি যে, বুদ্ধদেব পূর্বে ছিলেন রাজকুমার শাক্যসিংহ। এক সময় শাক্যসিংহের প্রবল বৈরাগ্য হল, তিনি রাজসিংহাসন ত্যাগ করে চলে গেলেন। অনাহার অনিদ্রায় তিনি সাধনভজন করতে লাগলেন। এরপর গয়াধামে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় আসন পেতে ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। সংকল্প করলেন, যতক্ষণ আমার সত্যবস্তু লাভ না হয়, আমি চোখ খুলব না। অনেক দিন এভাবে কেটে গেল। সত্যবস্তুর সন্ধান পেলেন না, অনাহারে শরীর একেবারে শীর্ণ হয়ে গেল, শরীর একেবারে ছেড়ে যাবার মতো হল। এখন কী করবেন, বাধ্য হয়ে চোখ খুলে ভাবতে লাগলেন – এত কঠোর তপস্যা করলাম তবু আমার সত্যবস্তুর সন্ধান মিলল না। এখন আমি কী করি – আহার ছাড়া আমার তো প্রাণ বেরিয়ে যাবে। শরীরকে আগে রক্ষা করতে হলে কিছু ভোজনের দরকার। এখন শরীর তো ক্ষীণ হয়ে উত্থান শক্তিরহিত হয়ে গেছে, কিন্তু খাব কি। এমন সময় একটি নারী কিছু পরমান্ন নিয়ে ওই বৃক্ষের তলায় হাজির হল। ওই নারী ছিল বন্ধ্যা। সে ওই বৃক্ষের কাছে মানসিক করেছিল – হে বৃক্ষ, আমার যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে তোমাকে পরমান্ন ভোগ দেব। ওই নারীর পুত্র সন্তান হওয়ায় উক্ত বৃক্ষকে ভোগ দেবার জন্য সে পরমান্ন নিয়ে এল। তখন ওই নারীর কাছ থেকে শাক্যসিংহ পরমান্ন চেয়ে খেয়ে নিলেন। গুরুজীর অন্নগ্রহণ, নারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলা ইত্যাদি এসব দেখে তাঁর ভক্তশিষ্যরা ভাবল – ইনি তো ভণ্ড সাধু, এনার উপর বিশ্বাস নেই। এইজন্যে তারা সবাই শাক্যসিংহকে ত্যাগ করে চলে গেল। উক্ত মাতৃস্বরূপা নারী প্রতিদিন পরমান্ন নিয়ে আসে আর শাক্যসিংহ তা খেয়ে নেন। এইভাবে তাঁর শরীরে বল ফিরে এল। তিনি আপন মনে সাধন ভজন করে অবশেষে সত্যবস্তুর সন্ধান পেলেন। শাক্যসিংহ সিদ্ধি

লাভ করলেন। রমনীর অন্নগ্রহণে পতিত তো হলেনই না, বরং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন।

শ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ বাছা, বিপদ আপদে এরূপ কাজে দোষ হয় না।

কৃষ্ণবাবু ঃ মহারাজ, আপনি বলেছেন যে, সাত্ত্বিক আহার থেকেই মানুষের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি এই কথা মানবে না, তার জন্য কী যুক্তি দেওয়া যাবে? ওই ব্যক্তি তো বলবে আহারের সঙ্গে মনের কী সম্বন্ধ আছে? আহার্য্য বস্তু অশুচি বা অশুদ্ধি হলে শরীর খারাপ হতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম মন কী করে খারাপ হবে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ যে ব্যক্তি বলবে আহারের সঙ্গে মনের কোন সম্বন্ধ নেই, তাকে কিছু মাদক দ্রব্য খাইয়ে দিলেই সে বুঝতে পারবে যে, আহারের সঙ্গে মনের কী সম্বন্ধ আছে। যখন মাদক দ্রব্য খেয়ে নেওয়া হয়, তখনই মনের কেমন অবস্থা হয়, একথা সব লোকই জানে। কেন এরকম হয়? দ্রব্য গুণ থেকেই এরকম হয়। তাহলে দ্রব্যগুণ তো মানতেই হবে। এইজন্যে গীতাশাস্ত্রে ভগবান সাত্ত্বিক আহারের ভালভাবে বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।। গীঃ ১৭/৮

অনুবাদ ঃ আয়ুঃ সত্ত্ব-বল-আরোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্ধনা (জীবন, উদ্যম, শক্তি, রোগ-রাহিত্য, চিত্তপ্রসাদ ও অভিরুচি বর্ধক) রস্যা (সরস) হৃদ্যাঃ (হৃদয়প্রিয়, মনোরম) আহারাঃ (ভক্ষবস্তু) সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়)

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্নরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।। (গীঃ ১৭/৯)

অনুবাদ ঃ কটু অম্ল লবণ অতিউষ্ণ তীক্ষ্ন রুক্ষ বিদাহিনঃ (অতি তিক্ত, অতি টক, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি ঝাল, অতি শুষ্ক ও অতি প্রদাহকর) আহারা (আহারসকল) দুঃখ শোক ও রোগপ্রদা। রাজসস্য (রাজসিকগণের) ইষ্টাঃ (প্রিয়)।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।। (গী ১৭/১০)

অনুবাদ ঃ যৎ (যে) ভোজনং (আহার) যাতযামং (মন্দপক্ক) গত-রসং

(রসহীন) পূতি (দুর্গন্ধময়) পযুষিতঞ্চ (বাসী) উচ্ছিষ্টম্ (ভুক্তাবশিষ্ট) অমেধ্যং (যজ্ঞে নিষিদ্ধ, অভক্ষ্য) তৎ (তাহা) তামসপ্রিয়ম্ (তামসিকগণের প্রিয়) হয়।

দেখো ভাই কৃষ্ণ, গীতাশাস্ত্রে ভগবান সাত্ত্বিক রাজসিক, তামসিক এই তিন প্রকৃতির মানুষের প্রিয় তিনরকম আলাদা আহারের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সাত্ত্বিক আহার করলে মানুষের শরীরও ভালো থাকে, মনও ভাল থাকে। অনেক লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ঈশ্বরের এত ভজন করে থাকি, তবু তাঁর দেখা পাই না কেন। আমি উত্তরে বলি – ভজনে কিছু গলদ আছে, শুদ্ধ সত্ত্বভাব হৃদয়ে না এলে ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যাবে না। আগে সত্ত্বগুণকে বাড়াতে হবে, তবেই ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যাবে। সাত্ত্বিক আহার থেকে যেমন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়, তেমনি সাত্ত্বিক বস্তু ব্যবহার থেকেও সত্ত্বগুণ বেড়ে যায়। কেউ যদি পট্টবস্তু পরিধান করে সুগন্ধ পুষ্প চন্দন ধূপ ইত্যাদি সংগ্রহ করে, তবে ঝট্ করে তার মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, চল কোন দেবমন্দিরে যাই, দেবতার পুজো করে আসি।

কেউ যদি মিহি ধুতি পরে, গায়ে বিলিতি সুগন্ধি মাখে, তবে ঝট্ করে তার সংকল্প হবে চলো যাই কোন থিয়েটারে যাই, সেখানে গিয়ে তার টপ্পা গীত গাইবার সখ হবে। ঈশ্বরের স্তুতি করবার ইচ্ছা তখন তার হবে না। এই কারণে সাত্ত্বিক বস্তু ব্যবহার করতে হবে। কেউ সাত্ত্বিক বস্তু পরিধান করলে, তখন চাপরাশ দেখেই লোকে বুঝে নেবে যে, এই ব্যক্তি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাচ্ছে। মুমুক্ষু ব্যক্তিকে চাপরাশ নিতেই হবে। যেমন যদি কোন ব্যক্তি সরকারী চাকরী করে, তখন সে সেইমতো চাপরাশ ব্যবহার করে থাকে। যেমন পাহারাদার, জমাদার, ইনস্পেক্টার ইত্যাদি। এই চাপরাশ দেখেই বুঝে নিতে হবে যে, এরা সরকারী চাকুরীজীবি। এই রকম ঈশ্বর লাভেচ্ছু সাধক চাপরাশ নিয়ে থাকে।

কৃষ্ণবাবু ঃ মহারাজ, সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক বস্তু ব্যবহার ছাড়া, ঈশ্বর সান্নিধ্যে যাবার আর কোন উপায় আছে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ, আর এক ভাল সুগম উপায় আছে, তা হল 'সৎসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'। যদি কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির সৎসঙ্গ মিলে যায় তাহলে তার আর কোন উপায়ের চিন্তা করতে হবে না, সব কিছু আপনা থেকেই হয়ে যাবে। তোমার মধ্যে সত্ত্বগুণের স্ফুরণ হোক বা না হোক – কোন ক্ষতি নেই। সাধুসঙ্গে

সাধুর সৎগুণ আপনা থেকেই তোমার মধ্যে প্রবেশ করে যাবে। অর্থাৎ সাধুর সৎগুণ তোমার মধ্যে দেখা দেবে। যেমন তিলে কোন সুগন্ধ নেই, কিন্তু তিলের তেলে গোলাপ যুঁই, বেলি, চামেলির সুগন্ধ আসে কোথা থেকে? ঐসব ফুলের সঙ্গ থেকেই তিল তেলের সুগন্ধ হয়। একথা সকলেই জানে, এর জন্য প্রমাণের দরকার নেই।

এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী তোমার সত্ত্বগুণ না থাকলেও তুমি যদি কোন সত্ত্বগুণী সাধুর সঙ্গ কর, তাহলে তোমার মধ্যে সত্ত্বগুণের আপনা থেকে স্ফুরণ হবে। দেখো ভাই কৃষ্ণ, সৎসঙ্গের প্রভাবের তুলনা নেই। এ সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ একটি গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি ঃ

এক লহমার সৎসঙ্গের প্রভাবের গল্প –

একশত পুত্রের শোকে বশিষ্ঠ ঋষি কেমন কাতর হয়েছে তা দেখবার জন্য বিশ্বামিত্র একদিন বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে বশিষ্ঠ ও তার স্ত্রী অরুন্ধতী দু'জনে বসে গল্প করছেন। অরুন্ধতী তখন স্বামীকে বলছিলেন, 'আজ কেমন শারদীয়া চাঁদের উদয় হয়েছে, সারা ভুবন যেন এই আলোর জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। এমন উজ্জ্বল প্রকাশ আর কি কোথাও সম্ভব?' শুনে বশিষ্ঠ বললেন, 'অরুন্ধতী, এইরকম উজ্জ্বলতা বিশ্বামিত্রের তপস্যার মধ্যে রয়েছে।' বশিষ্ঠের এই কথা শুনে বিশ্বামিত্রের মনে বড় দুঃখ হল। তিনি ভাবলেন, আমি এঁর একশত পুত্রকে নিধন করেছি। তা সত্ত্বেও ইনি আমার তপস্যার এত প্রশংসা করছেন!

বিশ্বামিত্র তখন বশিষ্ঠের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে বশিষ্ঠ উঠে দাঁড়িয়ে বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করে বললেন, 'আসুন ব্রহ্মর্ষি, আসুন।' বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে বশিষ্ঠদেব, আপনি আমাকে ব্রহ্মর্ষি বলছেন কেন? আগে যদি আপনি আমাকে ব্রহ্মর্ষি বলে সম্বোধন করতেন তাহলে আমি আপনার পুত্রদের কোন ক্ষতি করতাম না, এখন বলুন, এমন কী ঘটল যে আপনি আমাকে ব্রহ্মর্ষি বলে সম্বোধন করছেন?' তখন বশিষ্ঠ বললেন, 'বিশ্বামিত্র, আমি চিরকাল সত্যবাদী, কখনও আমি মিথ্যা বলি না। আগে আপনি ছিলেন রাজর্ষি, তখন আপনাকে কী করে ব্রহ্মর্ষি বলব? এখন দেখছি আপনার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নেই, আপনার হৃদয় সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হয়ে আছে। তাই আপনাকে এখন ব্রহ্মর্ষি বলতে দ্বিধা নেই।'

বশিষ্ঠের মুখে এই কথা শুনে বিশ্বামিত্রের মনে বেশ অহঙ্কার হল। তিনি বশিষ্ঠকে বললেন, 'আপনি তো আমার তপস্যার অনেক প্রশংসা করলেন। এখন আপনি বলুন, আমার মতো তপস্যার তেজ আর কার মধ্যে দেখেছেন?' বশিষ্ঠ দেখলেন, বিশ্বামিত্রের মধ্যে এখনো বেশ দম্ভ রয়েছে। তাই তিনি বললেন, 'আপনার ওই প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা আমার নেই। এর উত্তর দিতে পারেন একমাত্র নাগরাজ বাসুকি।' দুই ঋষি তখন বাসুকির কাছে গেলেন। বিশ্বামিত্রের প্রশ্ন শুনে বাসুকি তাঁকে বললেন, 'ঋষিবর, আমি আমার মাথার উপর সমস্ত পৃথিবীর ভার বহন করছি। এই ভার থেকে মুক্ত না হলে তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। তুমি তো অনেক তপস্যা করেছ। তোমার তপস্যার বলে আমার মাথার উপর থেকে পৃথিবীর ভার নামিয়ে দাও, মাথা হাল্কা হলে তারপর আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব।

বিশ্বামিত্র তখন বাসুকিকে বললেন, "আমি আমার চল্লিশ হাজার বছরের তপস্যার পুণ্যফল আপনাকে দিচ্ছি, সেই তপস্যার বলে আপনার মাথার উপর থেকে পৃথিবী সরে যাক।" বিশ্বামিত্রের চল্লিশ হাজার বছরের পুণ্যফল বিফল হল, পৃথিবী একটুও নড়ল না, যেমন ছিল তেমনি রইল। বিশ্বামিত্র তখন পঞ্চাশ হাজার বছরের তপস্যার ফল দিলেন। তাতেও কিছু হল না। এবার তিনি দিলেন সত্তর হাজার বছরের পুণ্যফল। তাতেও কিছু হল না। তখন বাসুকি বশিষ্ঠকে বললেন, "বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের এত তপস্যার জোরেও তো কিছু হল না। এবার তোমার তপস্যা দিয়ে দেখো কিছু করতে পারো কি না।" বশিষ্ঠ বললেন, "আমি তো এমন কিছু তপস্যা করিনি যার ফল আপনাকে দিতে পারি। তবে আমি ক্ষণকালের জন্যে যে সৎসঙ্গ করেছিলাম তারই পুণ্যের ফল আপনাকে দিচ্ছি। দেখুন তা দিয়ে পৃথিবীকে নামাতে পারেন কি না।" এই বলে বশিষ্ঠ তাঁর ক্ষণকালের সৎসঙ্গের পুণ্যফল বাসুকিকে দান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাসুকির মাথার উপর থেকে পৃথিবীর ভার নেমে গেল।

বিশ্বামিত্র তখন বাসুকিকে বললেন, "এখন তো আপনার মাথা হাল্কা হয়েছে, এবার বলুন আমার মতো তপস্যার তেজ আর কার আছে?" বাসুকি বললেন, এখানো কি তোমার প্রশ্নের উত্তর পাওনি? তোমার সত্তর হাজার বছরের তপস্যার জোরে পৃথিবী একটু নড়ল না, আর বশিষ্টের এক মুহূর্তের সৎসঙ্গের পুণ্যে তা সম্ভব হল। এতেও কি তুমি বুঝতে পারোনি যে সৎসঙ্গের

মহিমা কতখানি? সৎসঙ্গের কি তুলনা আছে?

বাসুকির কথা শুনে বিশ্বামিত্র লজ্জা পেলেন। তার তপস্যার গর্ব নাশ হয়ে গেল। তখন বাসুকি এই দোঁহাটি বললেন,

'সপ্ত স্বর্গ অষ্ট বর্গ ধরে তুলা এক অঙ্গ
তুলনা তাহে সকল মিল্ যো লহ সৎসঙ্গ।'

তাৎপর্য ঃ সপ্ত স্বর্গ, অষ্টবর্গ যত কিছু আছে সকল এক পাল্লায় রাখ, আর এক পাল্লায় ক্ষণিকের সৎসঙ্গকে রাখ, দেখবে ক্ষণিকের সৎসঙ্গের ভারই অধিক হবে।

দেখো ভাই কৃষ্ণ, সৎসঙ্গের প্রভাব বলে শেষ করা যাবে না। সৎসঙ্গের প্রভাবে সব কিছু পাওয়া যায়। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরক বাস। এই সৎসঙ্গ মানুষকে স্বর্গে নিয়ে যায়। যদি কোন ভাগ্যহীন ব্যক্তি অসৎসঙ্গে পড়ে যায়, তবে তার নরক বাস হয়ে যায়। এজন্যে আমার এই উপদেশ – সদাসর্বদা ভালো সঙ্গ করবে, ক্ষণিকের সাধুসঙ্গে কত ফল পাওয়া যায়, এর আর এক কাহিনী তোমাকে শোনাচ্ছি।

ক্ষণিক সাধুসঙ্গের মহিমার গল্প ঃ

এক চোর ছিল, সে বুড়ো হয়ে গেল, আর তেমন চুরি করতে পারে না। তাই সে পুত্রকে চুরি করার বিদ্যা ভালো করে শিখিয়ে দিল। এরপর সে পুত্রকে বলল, 'দেখো বাবা, দুটি কথা ভালো করে মনে রাখবে এক – কখনো সাধুসঙ্গ কোরো না। দুই – কখনো সত্য কথা বোলো না। এই দুটি কথা যদি ভুলে যাও, তাহলে বিপদে পড়বে।'

পুত্র চুরি করতে শুরু করল। একদিন গভীর রাতে পাহারাদারদের নজর এড়িয়ে সে রাজবাড়িতে ঢুকল। রাজপুত্র তখন ঘুমোচ্ছিল। চোর রাজপুত্রকে হত্যা করে তার সমস্ত অলঙ্কার নিয়ে পালিয়ে গেল, হাতে নাতে যাতে ধরা না পড়ে তাই সে অলঙ্কারগুলি পুঁটলি করে গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখল। কিন্তু চোরের বরাত খারাপ। পরদিন সকাল বেলায় তাকে দেখে সন্দেহ হওয়ায় সেপাইরা তার হাতে আর কোমরে দড়ি বেঁধে রাজার কাছে ধরে নিয়ে চলল। পথে যেতে যেতে চোর দেখতে পেল যে পথের ধারে এক সাধু বসে রয়েছেন আর অনেক লোক তাঁকে ঘিরে বসে তাঁর উপদেশ শুনছে। চোরের হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার বাবার কথাগুলো। বাবা বলেছিল, সে যেন সাধুসঙ্গ না করে।

পাছে সাধুর উপদেশ তার কানে যায়, এই ভয়ে সে ভাবলো কানে আঙ্গুল দিই। কিন্তু তার হাতে হাতকড়ি লাগানো আছে। তাই সাধুর কাছ দিয়ে যাবার সময় সাধুর কথাগুলি তার কানে এল। সাধু তখন ভক্তদের বলছেন, 'দেবতাদের চোখের পলক পড়ে না। তাঁদের পা মাটিতে স্পর্শ করে না, আর তাঁদের কোন ছায়া পড়ে না।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাধুর এই তিনটি কথা চোরের কানে প্রবেশ করল।

সেপাইরা চোরকে ধরে নিয়ে এল রাজার কাছে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই রাজকুমারকে খুন করে তার সব অলংকার চুরি করেছিস্?' চোর বলল, 'না মহারাজ, আমি চুরি করিনি।' রাজা তখন চোরকে কয়েদখানায় বন্ধ করে রাখলেন। চোর তার অপরাধ কবুল না করায় রাজা তাঁর রাজ্যে ঢেঁরা দিয়ে দিলেন – যে চোরকে তার অপরাধ কবুল করাতে পারবে তাকে তিনি অনেক পুরস্কার দেবেন। ঢেঁরা শুনে এক বেশ্যা রাজার কাছে এসে বলল, 'মহারাজ, আমি চোরকে তার অপরাধ স্বীকার করাবো, কিন্তু আপনি হুকুম দিয়ে দিন যে, আমি যখন কয়েদখানায় চোরের কাছে যাব, তখন যেন কোনও সেপাই-সান্ত্রি সেখানে না থাকে। আমি একলা চোরের সঙ্গে দেখা করতে চাই।' রাজা তাতেই রাজী হয়ে জল্লাদকে বলে দিলেন, 'এই বেশ্যার কাছে চোর তার অপরাধ স্বীকার করবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি চোরের মাথা কেটে ফেলবে। চোর আমার ছেলেকে খুন করেছে, কাজেই তার প্রাণদণ্ড হওয়া চাই।'

এদিকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কয়েদখানায় পড়ে রয়েছে চোর। তখন গভীর রাত, এমন সময় সেই বেশ্যা কালী মূর্তির রূপ ধারণ করে কয়েদখানায় প্রবেশ করল। এমন নিখুঁতভাবে সে কালী সেজেছে যে মানুষ বলে তাকে চেনাই যায় না। কালীমূর্তি এসে চোরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোর-ডাকাতদের কুলদেবী হলেন কালী। চোর মনে করল স্বয়ং মা কালী এসেছেন তার কাছে। অমনি সে মা কালী ভেবে বেশ্যাকে প্রণাম করল। বেশ্যা বলল, 'বাছা, আমি তোদের কুলদেবী, তোকে রক্ষা করবার জন্যই আমি এসেছি। তোর কোন ভয় নেই, আমার কাছে তুই সত্যি করে বল রাজকুমারকে খুন করে তুই তার অলংকার চুরি করেছিস কি না।' চোর ভাবল স্বয়ং কুলদেবী যখন আমাকে রক্ষা করবেন বলে এসেছেন? তখন তার কাছে কি মিথ্যে কথা বলা যায়? এইভেবে সে অপরাধ স্বীকার করতে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ তার সাধুর

উপদেশ মনে পড়ে গেল। সাধু বলেছিলেন, দেবতাদের চোখের পলক পড়ে না, মাটিতে পা স্পর্শ করে না। তাঁদের শরীরের কোন ছায়া পড়ে না। আরে এই স্ত্রীলোকটার যে চোখের পলক পড়ছে, মাটিতে পা দিয়ে দিব্যি সে দাঁড়িয়ে আছে আর ওই তো তার ছায়া দেখতে পাচ্ছি। এ তো তাহলে দেবী নয়, দেবীর ছদ্মবেশ ধরে এ আমাকে দিয়ে অপরাধ কবুল করে আমাকে খুন করাতে চায়। চোর তাই বেশ্যাকে বলল, 'মা, তুমি আমার কুলদেবী, তুমি আমার অন্তর্যামী। মনের কথা তোমার কাছে কি লুকোনো থাকে মা? তুমি তো জানো মা আমি রাজপুত্রকে খুনও করিনি, আর তার অলংকারও আমি চুরি করিনি। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এরা আমাকে কয়েদখানায় পুরে রেখেছে।'

বেশ্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। চুরির কোন প্রমাণ না পেয়ে রাজাও চোরকে ছেড়ে দিলেন। চোর ছাড়া পেয়ে চিন্তা করতে লাগল, বাবা আমাকে সাধুসঙ্গ করতে নিষেধ করেছিলেন পাছে আমি সাধুদের উপদেশ শুনে চুরি করা ছেড়ে দিই। এখন দেখছি ভাগ্যি সাধুর উপদেশ আমার কানে এসেছিল, তা না হলে ছদ্মবেশী কালীকে কুলদেবী মনে করে আমি তো সব অপরাধ স্বীকার করতেই যাচ্ছিলাম। ঐ সাধুর উপদেশই আজ আমাকে প্রাণদণ্ড থেকে বাঁচিয়ে দিল। ক্ষণিকের সাধুসঙ্গে যদি আমার প্রাণ এভাবে রক্ষা পেতে পারে, তাহলে সব সময় সাধুসঙ্গ করতে পারলে তো আমি অমর হয়ে যাবো।

চোর তখন স্থির করল – আমি আর বাবার কাছে যাব না, আর চুরি করব না, আমি সাধু হয়ে যাব। তাই হল, চোর সাধু হয়ে গেল।

দেখো ভাই কৃষ্ণ, এই দৃষ্টান্তমূলক গল্প থেকে বোঝা গেল, ক্ষণিক সাধুসঙ্গের প্রভাবে চোরের প্রাণদণ্ড রদ হয়ে গেল। আর চোরও সাধু হয়ে গেল। দেখো, তোমাদের পুরাণে তো এর কত কত দৃষ্টান্ত আছে। নারদঋষি ছিলেন দাসীর পুত্র, কিন্তু দাসী পুত্র হয়েও তিনি হয়েছিলেন ঋষি। চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করবেন বলে তপস্বী ঋষিরা এক জায়গায় কুটির বেঁধে বাস করছিলেন। সেই সময় নারদের মা দাসী হয়ে ঐসব ঋষিদের সেবা পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁদের বাসন মেজে দিতেন। ঘরদোর পরিষ্কার করতেন এবং বালক নারদও মায়ের সঙ্গে তাঁকে এইসব কাজে সাহায্য করতেন। ঋষিদের খাওয়া হয়ে গেলে যা অবশিষ্ট থাকত, মা ছেলেতে মিলে তাই প্রসাদ পেতেন। সাধুরা যখন নানারকম সৎপ্রসঙ্গ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন, তখন নারদ

একমনে সেইসব আলোচনা শুনতেন। শুনতে শুনতে সেই ভগবৎ প্রসঙ্গ তাঁর হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ছাপ ফেলে গেল। চাতুর্মাস্য ব্রত উদ্‌যাপনের পর সাধুরা সেই স্থান ছেড়ে চলে গেলেন। ঠিক এমনি সময়ে সাপের কামড়ে নারদের মায়ের মৃত্যু হল। নারদ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। এই অবস্থায় তিনি গভীর বনের মধ্যে চলেন গেলেন। ঋষিরা কীভাবে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন, নারদ তা আগেই দেখেছেন। তিনিও সেইভাবে বসে ভগবানের ধ্যানে একেবারে ডুবে গেলেন। এবং অবশেষে ভগবানের দর্শন লাভ করে ধন্য হলেন।

দেখো বাছা কৃষ্ণ, কোথায় নারদ ছিলেন সামান্য এক দাসীর ছেলে, কিন্তু কিছুদিনের জন্যে ঋষিদের সঙ্গ লাভ করে তিনি ভগবানকে পর্যন্ত লাভ করলেন, নিজে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হলেন। এর কারণ কী? এর একমাত্র কারণ সঙ্গের প্রভাব। এই কারণে সৎসঙ্গের তুলনা নেই। যে ব্যক্তি যার সঙ্গ করবে, তার ভাব উক্ত ব্যক্তির হৃদয়ে অবশ্যই স্থান করে নেবে। দেখো ভাই কৃষ্ণ, আজ যা যা সৎসঙ্গের কথা আমি তোমাকে বললাম, তা তোমার জন্যে বলিনি। তুমি তো ভাই পাক্কা ঘুঁটি, তুমি তো একজন পুরোপুরি সাধক, তোমাকে আর কী বলব? তোমাকে উপলক্ষ করে আর দশজন ব্যক্তির জন্যে এই উপদেশ করলাম। যদি কোন ব্যক্তি একটা উপদেশও হৃদয়ে ধারণ করে নেয়, তাহলে তার অশেষ কল্যাণ হবে।

কৃষ্ণবাবু ঃ মহারাজ আর দশমূর্তির পাশে আমি পাক্কা ঘুঁটি হতে পারি, কিন্তু আপনার পাশে আমি একজন শিশুমাত্র, আপনার দাসানুদাস। আমি তো জানি আমার সাধন-ভজন কিছুই নেই। এতদিন আপনার চরণ কমল স্মরণ নিয়েছি, এতদিন কী আর করলাম।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই কৃষ্ণ, যে ব্যক্তি সুগন্ধি মেখে থাকে, সেই সুগন্ধ সে ব্যক্তি পায় না, সুগন্ধ পায় আশেপাশের লোকেরা। তোমার কী বস্তু লাভ হল তা তুমি জান না, কিন্তু তোমার আশেপাশের লোকেরা ভালই বুঝতে পারছে। পুষ্প যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন পুষ্প জানে না যে, তার থেকে কী সুগন্ধ বের হচ্ছে, যে ব্যক্তি ওই পুষ্পের ঘ্রাণ নিচ্ছে সেই শুধু সুগন্ধ উপলব্ধি করতে পারে। মৃগের নাভিতে যখন কস্তুরী হয়, তখন মৃগ জানে না যে তার নাভি থেকেই সুগন্ধ বের হচ্ছে। দেখো ভাই কৃষ্ণ, তুমি তো জান না, সাধনায় কতটা উন্নতি হয়েছে – তোমার সদ্‌গুণের সুগন্ধ তোমার আশপাশের ব্যক্তিরা

বুঝতে পারছে।

কৃষ্ণবাবু – হে দেব, আমার যা কিছু হয়েছে তা আপনার কৃপাতেই হয়েছে। হে কৃপাময়, হে অহৈতুক করুণাসিন্ধু, আমার প্রাণ যখন বেরিয়ে যাবে, সেই সময় আমাকে কৃপা করবেন। আমি সাধন ভজন কিছু জানি না, আপনার চরণকমল একমাত্র ভরসা।

এই কথাগুলি বলবার সময় কৃষ্ণবাবুর চোখে দরদর ধারায় ভক্তি-অশ্রু পড়ছিল। গুরুভক্ত কৃষ্ণবাবু এক পুণ্য তিথিতে কাশীধামে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর এক ক্ষুদ্র বাড়িতে শেষ জীবনের ছ মাস ভগবৎ চর্চায় কাটিয়ে গুরু পাদপদ্মে লীন হয়ে গেছেন।

দশম পর্ব

শ্রী সাক্ষীগোপাল বড়াল
ও
শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[অন্তিমকালে করণীয় বিষয় ঃ অন্তিমকাল সম্পর্কে রবি দাসের গল্প ঃ অন্তিমকালে মনের ভাবকে শুদ্ধ ও পবিত্র রাখতে হবে, এ সম্পর্কে সাধু ও বেশ্যার গল্প ঃ 'তদ্‌জপস্তদর্থভাবনম্' ও এই প্রসঙ্গে রাজা ও কুকুরের গল্প ও গীতাশাস্ত্রের দুটি শ্লোকের উদ্ধৃতি ঃ উক্ত দুটি শ্লোকের পরিপ্রেক্ষিতে ভরত রাজার উপাখ্যান ঃ ত্রিগুণময়ী ও দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করার উপায়, এ প্রসঙ্গে গীতার একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি ঃ মায়া কীভাবে মানুষকে ভুলিয়ে রাখে মায়ার হাত থেকে কীভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়]

সাক্ষীগোপাল মহাশয় ধনী লোক ছিলেন – ধনী হলেও তিনি ধনাভিমানী ছিলেন না। বড়াল মহাশয় কোম্পানী কাগজের ব্যবসা করতেন। ইনি গুরু মহারাজের পরম ভক্ত ও শিষ্য। বয়স হয়ে শরীর বিশেষ পীড়িত হওয়ায় তিনি তাঁর দেওঘরের বাড়িতে বায়ুপরিবর্তনের জন্য এসেছিলেন। এর অল্পদিন পরেই গুরু পাদপদ্ম শরণ করতে করতে বড়াল মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন। সাক্ষীবাবু এসে গুরুমহারাজকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা সাক্ষী, তুমি বড় দুর্বল হয়ে পড়েছ।

সাক্ষীবাবু ঃ মহারাজ, আর তো আমার চলে যাবার সময় কাছে এসে গেছে। শরীর ভাল হওয়ার উপদেশ আমি আর শুনতে চাই না। অন্তিমকালে যাতে আপনার চরণকমল আমার শরণে আসে তার উপদেশ দান করুন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা, কেন তুমি এত নিরাশ হয়ে গেছ। জীবনের উপর এতটা নিরাশ হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। তুমি মনে বল রাখ।

সাক্ষীবাবু ঃ মহারাজ, আপনি আমাকে বাচ্ছা ছেলের মতো ভোলাচ্ছেন। হে ধর্মপিতা, হে গুরুদেব অন্তিমকালে আমার করণীয় কি? তার উপায় আমাকে বলে দিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই সাক্ষী, তুমি তো অনেকদিন ধরে আমার কাছে আসছ এবং আমার উপদেশ শুনে আসছ। এখন কার্যকালে এই সব উপদেশ ফলিভূত করতে হবে অর্থাৎ উপদেশকে কাজে লাগাতে হবে। ভাই সাক্ষী, অন্তিম সময়

খুব হুঁশিয়ার থাকতে হয়। জপ-তপ, পুজো-পাঠ মানুষ যা কিছু করে, সব এই অন্তিমকালের জন্যেই করে। সারা জীবনের সাধন-ভজনের অভ্যাস এই শেষ সময়েই ফল দেয়। যারা সাধন-ভজনের ধার ধারে না। তাদের কথা আর কী বলব? অনেক ভজনশীল অভ্যাসী লোকের পক্ষেও মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে ভগবানের নাম স্মরণ করা সম্ভব হয় না।

দেখো ভাই সাক্ষী, এই অন্তিমকালের এক কাহিনি তোমাকে শোনাব। এই উদাহরণ থেকে মৃত্যুকালে মানুষকে কিরূপ হুঁশিয়ার থাকতে হয় তা ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

রবিদাসের গল্প

দোঁহা-

ভক্তিবীজ বদলে নেহি যো যুগ যার অনন্ত

উঁচ্ নীচ্ ঘরমে উব্‌জে হোয় সন্তকা সন্ত, অর্থাৎ ভক্তিবীজ একবার উৎপন্ন হলে আর তা নষ্ট হয় না, ভক্ত কর্ম অনুসারে জন্ম জন্মান্তরে উঁচু নীচু যে ঘরেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে সন্ত অর্থাৎ ভক্ত হয়েই জন্মগ্রহণ করবেন।

কৃষ্ণ ভগবান গীতা শাস্ত্রে বলেছেন ঃ

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।।

(গী ৬/৪১ শ্লোক)

অর্থাৎ যোগী যদি যোগভ্রষ্ট হন, তথাপি তার তপস্যা নষ্ট নয় না। পূর্ব জন্মের তপস্যার বলে তিনি জন্মান্তরে সদাচার সম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

কোন এক গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দম্পতি বাস করত। তাদের কোনো সন্তানাদি হয় নি বলে তাদের মনে খুব দুঃখ ছিল। ব্রাহ্মণ বড় নিষ্ঠাবান ছিলেন। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে যখন তাদের একটি মেয়ে হল তখন স্বামী স্ত্রীর আর আনন্দ ধরে না। তারা পরম যত্নে মেয়েটিকে লালন পালন করতে লাগল। মেয়েটি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাব খুব ভালো হতে লাগল। সে ভোরবেলা বন থেকে ফুল তুলে এনে সারাদিন ধরে শিবের পুজোয় তন্ময় হয়ে থাকে। তারপর দিনের শেষে পুজো শেষ করে সন্ধের সময় সে ঠাকুরের প্রসাদ মুখে দেয়।

মেয়েটি যখন যৌবনে পা দিল তখন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী তার বিয়ে দেবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাদের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে মেয়েটি বাবা-মাকে বলল, "তোমরা আমার বিয়ের জন্যে কেন ব্যস্ত হচ্ছ? বিয়ে হলে আমি আর বাঁচব না। বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মৃত্যু হবে।' মেয়ের কথা শুনে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ভয় পেয়ে গেল, তারা আর মেয়ের বিয়ে দিল না। মেয়েটি মনের আনন্দে সারাদিন শিবের ভজন পূজনে দিন কাটাতে লাগল। কিছুদিন এভাবে চলার পর মেয়েটি এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল যে তার মৃত্যুকাল এসে গেল, রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে মেয়েটি তখন চিন্তা করছে – বাবা বড় গরীব, আমার বিয়ে দেবার মতো সামর্থ্য তাঁর নেই, তাই আমি বিয়ে না করে ভজন পূজনেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলাম। ধন-সম্পদ যে কী জিনিস তা আজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না। যখন এই সব কথা ভাবছে ঠিক তখনই তাঁর মৃত্যু হল।

অন্তিমকালে যে চিন্তা মনে উদয় হয়, সেই চিন্তা অনুসারেই মানুষ আবার জন্মগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণের মেয়ে মৃত্যুর সময় ধন-দৌলতের চিন্তা করছিল, তাই পরের জন্মে রাজার ঘরে তার জন্ম হল। কিন্তু আগের জন্মের তপস্যার পুণ্যফলে সে-জন্মের কোন কথা সে ভুলে যায়নি। রাজকন্যা ভাবতে লাগল, গত জন্মে এত তপস্যা করলাম, কিন্তু মৃত্যুকালে ধন-দৌলতের চিন্তা করেছিলাম বলে এবার আমার রাজার ঘরে জন্ম হল। মৃত্যুর সময় যদি হুঁশিয়ার থাকতাম, তাহলে আমার সকল তপস্যা এভাবে বিফল হয়ে যেত না। যাক্ গে, যা হবার তা হয়েছে। এখন থেকে দিন রাত কেবল ভগবানের নাম জপ করতে থাকি যাতে শেষ সময়ে ইষ্টদেবের চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ হয়। তাতেই আমি পুনর্জন্মের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাব।

শৈশব অতিক্রম করে রাজকন্যা ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করল। মেয়েটি ছাড়া রাজারানীর আর কোন সন্তান নেই। বড় আদরে তাঁরা তাকে মানুষ করেছেন। তাঁরা দেখলেন, তাঁদের এই আদরের মেয়েটির যেন কিছুতেই কোন উৎসাহ নেই। কেবল সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত মন প্রাণ দিয়ে বিষ্ণুমূর্তির সেবা করাই তার নিত্যকর্ম হয়ে উঠল। সারাদিন তার অনাহারে কাটে। সন্ধেবেলা পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে কিছু খেতে চায় না। রাজার মেয়ে হয়ে সে যদি কেবল ঠাকুর সেবা নিয়েই মেতে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে রাজ্যশাসন সে কেমন

করে করবে? রাজা রানী খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাজা তখন মন্ত্রীকে ডেকে তার পরামর্শ চাইলেন। মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, রাজকন্যা এখন যুবতী হয়েছে, আপনি, তার বিয়ে দিয়ে দিন, তবেই তার স্বভাবের পরিবর্তন হবে।" মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা মেয়ের জন্য পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। রাজকন্যা সেকথা জানতে পেরে রাজাকে বলল, "বাবা, আমার বিয়ে দিও না, বিয়ে দিলে আমি আর বাঁচব না।" মেয়ের এক কথা শুনে রাজা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি মেয়ের বিয়ে দেবার চিন্তা ত্যাগ করলেন। দিন যায়, বছর যায়। একদিন রাজকন্যার ভীষণ অসুখ করল। রাজা তখন চিকিৎসার জন্য কবিরাজ ডাকতে বললেন। তাই শুনে বলল, তোমরা কবিরাজ ডেকো না, কবিরাজ আমাকে স্পর্শ করলেই আমি মারা যাব।" বাবা-মা মেয়ের কথা শুনলেন না, কবিরাজকে ডেকে পাঠালেন। কবিরাজ এসে যখন রাজকন্যার নাড়ী টিপে দেখছে, তখন কবিরাজের সেই স্পর্শে তার মনের গতি হঠাৎ বদলে গেল। সে ভাবতে লাগল, আগের জীবনে আমি পুরুষের স্পর্শ পাইনি, এ জন্মেও তা পেলাম না। পুরুষের স্পর্শ যে কেমন, তা আমার জানা হল না। এই সব চিন্তা করতে করতেই রাজকন্যা দেহত্যাগ করল।

পুরুষের স্পর্শের কথা চিন্তা করতে করতে মৃত্যু হওয়ায় এবার রাজকন্যা এক বেশ্যার ঘরে জন্ম নিল। কিন্তু আগের দু'জন্মে সে কঠোর তপস্যা করেছিল, তারই পুণ্যফলে এবারও সে জাতিস্মর হয়ে জন্মাল। তার মনে পড়ে গেল যে, মৃত্যুকালে পুরুষ সংসর্গের কথা চিন্তা করার দরুণ এবার তাকে বেশ্যার ঘরে জন্ম নিতে হয়েছে। এখানে কেমন করে সে নিজের সতীত্ব বজায় রাখবে, এবার সেটাই তার একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়াল। অনেক ভেবে সে ঠিক করল যে এ জীবনটা তাকে পাগলি সেজে কাটাতে হবে। লোকে দেখল বেশ্যার ঘরে যে মেয়েটা জন্মেছে তার মাথার ঠিক নেই, অকারণে হাসছে আর কাঁদছে, গায়ে ধুলো কাদা মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লোকজন দেখলে তাদের গায়ে থুথু দিচ্ছে আর গালাগালি করছে। বাইরের আচরণ দেখে কে বলবে যে সে পাগলি নয়, ভিতরে ভিতরে সব সময় ভগবানের নাম করে চলেছে। মানস জপে জপে তার অন্তর তখন ভগবৎপ্রেমে বিভোর। এই ভাবে বাল্য ও কৈশোর অতিক্রম করে পাগলি যৌবনের কোঠায় পা দিল। পাগলি ভেবে কোন পুরুষ তার কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না।

একদিন পাগলি গঙ্গাস্থান করতে গিয়েছে, এমন সময় সে দেখতে পেল এক সাধু গঙ্গার ধারে বসে চোখ বুঁজে ধ্যান করছেন। সাধুকে দেখে পাগলি তাঁর কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ধ্যান ভঙ্গ হবার পর সাধু যেই চোখ তুলে তাকিয়েছেন অমনি পাগলি তাঁর দিকে চেয়ে খিলখিল করে হেসে বলল, "তপাসু ক্ষপা, অন্তমতাসু গতা" অর্থাৎ এখন তো খুব তপ করছ, কিন্তু অন্তিমকালে তোমার মতি যেমন হবে, তোমার গতিও হবে তেমনি। সাধু রোজ গঙ্গার ধারে বসে ধ্যান করেন, পাগলিও রোজ তাঁর কাছে এসে হাসতে হাসতে ঐ একই কথা শুনিয়ে যায়। সাধু জানতেন না যে ওই পাগলি জাতিস্মর। তিনি তাকে সাধারণ এক পাগলি বলেই ধরে নিলেন আর তার কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে মনে করলেন।

এইভাবে কিছুদিন যাবার পর সাধুর খুব ব্যারাম হল, তাঁর আর বাঁচবার আশা রইল না। সাধুর আস্তানার পাশে এক ঘরে চামার থাকত। চামার সাধুকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত। একদিন সে একজোড়া জুতো তৈরি করে এনে সাধুকে বলল, "বাবা, আমি খুব যত্ন করে আপনার জন্যে এই জুতো জোড়া বানিয়েছি। আপনাকে অন্তত একবার এই জুতো পায়ে দিতে হবে।" চামারের ভক্তি দেখে সাধু জুতো পায়ে দিতে রাজী হয়েছিলেন এবং চামারকে বলে ছিলেন ঘরের এককোণে জুতো জোড়া রেখে দিতে। এখন মরণাপন্ন অবস্থায় চামারের সেই জুতোর কথা সাধুর মনে পড়ে গেল, আর ঠিক সেই সময় সাধুর প্রাণ বিয়োগ হল।

জুতোর কথা স্মরণ করতে করতে প্রাণ-বিয়োগ হওয়ায় সাধুর জন্ম হল এক চামারের ঘরে। কিন্তু আগের জন্মের তপস্যার প্রভাবে সাধু জাতিস্মর হলেন, পূর্ব জন্মের কোন কথা ভুলে যাননি। তিনি ভাবতে লাগলেন, এত তপস্যা করেও শেষ সময় আমি সাবধান হতে পারলাম না। এখন এই চামারের ঘরে আমি নিজের ধর্ম কেমন করে রক্ষা করব? এই ভাবে চামারের ছেলে ঠিক করল, এ শরীর সে রাখবে না। তাই সে মাতৃদুগ্ধ পান করা বন্ধ করল।

এতে চামারপাড়ায় নানা রকম কথা শুরু হয়ে গেল। এক একজন এক এক রকম পরামর্শ দিতে লাগল। তখন এক বুড়ী ছেলের মাকে বলল, "তুই একবার পাগলিকে ডেকে দেখ না, ও অনেক রকম ঝাড়ফুঁক জানে, ও নিশ্চয় তোর

ছেলেকে ভালো করতে পারবে। বুড়ীর কথায় পাগলিকে ডেকে আনা হল। পাগলি তো দেখে হেসেই অস্থির। হাসি থামলে সে ছেলের মাকে বলল, "তোরা ছেলেকে আমার কোলে দিয়ে সবাই সরে যা। তোদের কোন ভয় নেই, আমি ঝাড়ফুঁক করে দিলেই ও ভালো হয়ে যাবে, মায়ের দুধও খাবে।" মা তখন ছেলেকে পাগলির কোলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নির্জন ঘরে ছেলেকে কোলে নিয়ে পাগলি হাসতে হাসতে বলল, কিগো সাধুজী, মনে পড়ে সেই গঙ্গাতীরে তুমি যখন সাধন ভজন করতে, তখন আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলাম, "তপাসু ক্ষপা, অন্তমতাসু গতা" – অর্থাৎ এখন তো বেশ তপস্যা করছ, কিন্তু অন্তিমকালের চিন্তাতেই তোমার গতি নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। মনে পড়ে সে কথা? দেখো ভাই, আমি সাবধান করে দিলেও তুমি কিন্তু সাবধান হওনি। মরবার সময় চামড়ার জুতোর কথা চিন্তা করে এবার তোমার চামারের ঘরে জন্ম হল। আমারও এভাবে তিন জন্ম কাটল, সাধন ভজন যা কিছু করেছিলাম, সব বৃথা নষ্ট হয়ে গেল।" পাগলি তখন নিজের তিন জন্মের সমস্ত কথা শুনিয়ে ছেলেটিকে বলল, "তোমারও তো দুটো জন্ম দেখলে। এখনও বলছি – তুমি সাবধান হও। কেন মিছিমিছি জীবনটাকে নষ্ট করতে চাইছ? তুমি মায়ের দুধ খাও, তাতে কোন দোষ হবে না। আমি তোমার মাকে বলে দেব, তোমাকে দুধ খাওয়াবার আগে সে যেন তার স্তন গঙ্গাজলে ধুয়ে নেয়।।"

এরপর পাগলি নানাভাবে ছেলেটিকে বোঝাতে লাগল, "শরীর যখন ধারণ করেছ তখন তুমি চাও আর না চাও, যতদিন মেয়াদ আছে, ততদিন শরীর থাকবে, মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে এক মুহূর্তও এই শরীর থাকবে না। কর্মফলে এই শরীর তুমি পেয়েছ। কর্মফল ভোগ না হওয়া পর্যন্ত এর ক্ষয় হবে না। দেখো, জেলখানায় যে লোক বন্দী হয়ে আছে, সে যদি জেল ভেঙে পালাতে চায়, তবে রাজা তার কয়েদের মেয়াদ বাড়িয়ে দেন। রাজা বলবেন, আরে, এ লোকটা তো ভয়ানক বদমায়েস, জেল ভেঙে পালাতে চাইছে? তিন বছরের বদলে একে দশ বছর জেলে পুরে রাখো। আর তিনি তো দুনিয়ার রাজা, তাঁর রাজত্ব ছেড়ে পালাবেই বা কোথায়? তোমার এই শরীরটা হল জেলখানা। এই জেলখানাকে ভাঙতে চাইলে, শরীর নষ্ট করতে চাইলে তোমার দুর্গতি

আরও বেড়ে যাবে। আবার দেখো, যে কয়েদী জেলখানায় ভালোভাবে থাকে আর রাজার হুকুম ঠিকমতো মেনে চলে, রাজা খুশি হয়ে তার শাস্তির মেয়াদও কমিয়ে দেন। তাই বলছি সাধুভাই, ঈশ্বরের বিধানে এখন তুমি শরীররূপী জেলখানায় বন্দী হয়েছ, একে তুমি নষ্ট করো না। জীবনের ভোগ শেষ কর। ভোগ শেষ হয়ে গেলেই তোমার শরীর আর থাকবে না। তবে আমার কথাটা সর্বদা মনে রেখো যে –

ভক্তি বীজ বদলে নেহি যো যুগ যায় অনন্ত
উঁচ্ নীচ্ ঘরমে উব্‌জে হোয় সন্তকা সন্ত।

(এই গল্পের প্রারম্ভে এই দোঁহার অর্থ লেখা হয়েছে।)

সাধু (চামারের ছেলে) তখন পাগলিকে বলল, 'মৃত্যুর সময় আমি সাবধান হতে পারিনি, তাই এবার আমাকে চামারের ঘরে জন্ম নিতে হল। নীচকূলে জন্মালেও আমি কোন হীন কাজ করবো না। আমি বুঝতে পেরেছি জোর করে শরীর নষ্ট করা অধর্ম তা আমি করব না। তুমি এখন যাও, তোমার কথা মতো এখন থেকে আমি দুধ খাব।' পাগলি চলে গেল। চামারের ছেলেও সেই থেকে মায়ের দুধ খেতে লাগল। চামারের ঘরের এই ছেলেই একদিন সাধক শিরোমণি সন্ত রবিদাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। চামারের ঘরে তার জন্ম হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব জন্মের তপস্যার প্রভাব নষ্ট হয়নি। এই জন্মে ঐ পবিত্র পুরুষ অনেক ভালো ভালো কাজ করে গেছেন।

দেখো ভাই সাক্ষী? পাগলি আর সাধু সাধন ভজন অভ্যাস করেও মরণকালে কেমন বেকুব বনে গেল। এখন তুমি বুঝে নাও – মৃত্যুকালে কতটা হুঁশিয়ার হওয়া দরকার। দেখো ভাই, জপ তপ করলেই হবে না, মনের ভাবকে ভালো রাখতে হবে। তুমি শারীরিক ভাবে জপ করছ, অথচ তোমার মণিরাম (মন) খারাপ চিন্তায় নিযুক্ত রয়েছে। এ করলে হবে না। শরীরের চেয়ে মনের কৃত পাপ অধিক হয়ে থাকে। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ তোমাকে শোনাচ্ছি ঃ–

সাধু ও বেশ্যার গল্প

কোন এক শহরের কাছে একটি গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামের এক পল্লিতে এক বেশ্যা বাস করত। সে যে ঘরে থাকত। সেই ঘরের সামনের এক বটবৃক্ষের নিচে এক সাধু থাকত। ঐ সাধু নিজের সাধন ভজন নিয়ে মগ্ন থাকত, ফুল

মালা দিয়ে পুজো করত। কিন্তু তার মন প্রায় সব সময় পড়ে থাকত বেশ্যার কার্যকলাপের দিকে। দিনে রাতে কতজন পুরুষ বেশ্যার ঘরে আসছে যাচ্ছে তা সাধু গুণে রাখে আর ভাবে, এই বেশ্যা কত পাপ করছে। এই পাপিষ্ঠার কী যে গতি হবে। একে তো নিদারুণ নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। সাধুর এরকম মনোবৃত্তি নিয়ে দিন গুজরান চলতে থাকে।

আর বেশ্যা তার বারান্দা থেকে প্রায় সময় ঐ সাধুর দিকে দৃষ্টি রাখে আর ভাবে – আহা, এই সাধু কী পুণ্যবান, সব সময় সাধন ভজন নিয়ে থাকেন। এই পুণ্যবান ব্যক্তি যখন মারা যাবেন তখন তাঁর জন্যে বিষ্ণুলোক থেকে পুষ্পক রথ এসে তাঁকে বিষ্ণুলোকে নিয়ে যাবে। এরকম মনোবৃত্তি নিয়ে বেশ্যার দিন কেটে যায়। শরীর তার যাই করুক, মন তার পড়ে থাকে সাধুর সৎ কাজের দিকে।

এভাবে সময় কেটে যায়। একদিন সাধু আর বেশ্যার একই দিনে একই সময় মৃত্যু হল। তখন বেশ্যাকে নিতে বিষ্ণুদূত এল, আর সাধুকে নিতে যমদূত এল। যমদূত আর বিষ্ণুদূতের মধ্যে বিবাদ লেগে গেল। বিষ্ণুদূত বলল সাধু বহুকাল ধরে তপস্যা করেছে, তুমি ওকে ছুঁয়ো না। ওনাকে আমি নিয়ে যাব। যমদূত তখন বলল, আরে, এই বেশ্যা খুবই পাপিষ্ঠা। তাকে তুমি কেন নিয়ে যাবে? তাকে তো আমি নিয়ে যাব। এই ভাবে দুজনের মধ্যে বচসা হতে লাগল। অবশেষে বিচারের জন্য ধর্মরাজের কাছে যাওয়াই স্থির হল। দুজনে ধর্মরাজের কাছে গিয়ে তাঁকে সমুদয় বৃত্তান্ত বললেন। ধর্মরাজ দুজন দূতকে বুঝিয়ে বললেন, বেশ্যা বিষ্ণুলোকে যাবে আর সাধু নরকে গিয়ে পচবে। তখন তারা আশ্চর্য হয়ে বলল, প্রভু, এ কীরকম হল। আপনি হলেন ধর্মরাজ। আপনি এরকম অধর্মের কথা কেন বলছেন? এই সাধু পুণ্যাত্মা? সারা জীবন পুণ্য কাজ করেছেন, আর এই বেশ্যা খুবই পাপিয়সী, সারাজীবন অধর্ম করে গেছে।

তখন ধর্মরাজ বললেন হে দূতগণ, ধর্মাধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, তা তাড়াতাড়ি নির্ণয় করা বড়োই কঠিন। দেখো, সাধুজী শারীরিক কত তপস্যা করেছেন, এই কারণে তাঁর শরীরের ভালো সদ্‌গতি হয়েছে। বৈষ্ণবরা তাঁর শবদেহ বহন করে নিয়ে গেছে, হরিনাম সংকীর্তন হয়েছে। শবদেহে ঘি মাখিয়ে চন্দন কাঠ জ্বেলে শবদাহ হয়েছে। কিন্তু ঐ সাধু মানসিক তপস্যা ঠিকমতো করেননি।

তাঁর মন সব সময় বেশ্যার কার্যকলাপের দিকে নিযুক্ত থাকত। তাই তাঁর মনকে অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। আর এই বেশ্যা শারীরিক দিক দিয়ে অনেক পাপ কাজ করেছে তাই দেখো তার শরীরের কীরকম দুর্গতি হয়েছে। তার দেহের সৎকার হয়নি, বেশ্যার দেহকে কে ছোঁবে! কেউ ছোঁয় নি, তখন ঐ শবদেহকে মেথর ভাগাড়ে ফেলে দিল। তখন তার মৃতদেহ শেয়াল শকুনি কুকুরে ভক্ষণ করতে লাগল। কিন্তু তার মন সর্বদা সাধুর পুণ্যকর্মের অনুশীলনে লেগে থাকত। এই কারণে তার মনের অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরের স্বর্গবাস অবশ্য হবে।

তাহলে দেখো ভাই সাক্ষী, শুধু শরীর দ্বারা কৃত জপ তপ করলে কিছু লাভ হবে না। শরীর আর মন উভয়ের দ্বারা জপ তপ করতে হবে। তবেই উর্দ্ধগতি হবে।

'তৎ জপস্তদর্থ ভাবনম্' (পতঞ্জলি যোগশাস্ত্র) ঈশ্বরবাচক শব্দ জপ করতে হবে আর সেই সঙ্গে এর অর্থ (অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ) ভাবনা করতে হবে। তবেই জপের ফল পাওয়া যাবে, তা না হলে ভাবনাশূন্য জপ কার্যকরী ফল দেবে না। দেখো ভাই সাক্ষী, আর এক দৃষ্টান্ত মনে পড়ে গেল।

রাজা ও কুকুরের গল্প

এক রাজা ছিল, ওই রাজার বড় প্রিয় হল কুকুর। ছোটবেলা থেকে রাজা এক কুকুরের বাচ্ছাকে লালন পালন করেন, এখন নিজের গদিতে তিনি কুকুরকে সব সময় বসিয়ে রাখেন। কুকুরও রাজাকে খুব ভালবাসে, দূর থেকে রাজাকে দেখতে পেলে ঝট্ করে সে রাজার কাছে চলে আসে। কয়েক বছর পর রাজা ও কুকুর দু'জনেই মারা গেল। এরপর রাজা মরে যাবার পর কুকুর হয়ে জন্ম নিল, আর কুকুর মরে যাবার পর রাজা হয়ে জন্ম নিল।

দেখ ভাই সাক্ষী, ভাব শুদ্ধ হওয়া চাই। যে ভাব নিয়ে দেহত্যাগ হবে সেই ভাব অনুসারে তোমার গতি হবে। এই কারণে ভগবান গীতাশাস্ত্রে বলেছেন – অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।

যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।। (গী ৮/৫ শ্লোক)

অনুবাদ ঃ যিনি মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমাকেই লাভ করেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।। (গী ৮/৬ শ্লোক)

অনুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়, যিনি মৃত্যুকালে যা ভাবতে ভাবতে দেহত্যাগ করেন, সর্বদা সেই ভাবে চিত্ত নিমগ্ন থাকায় সে ব্যক্তি সেই ভাবই প্রাপ্ত হন।

দেখো ভাই সাক্ষী, তোমাদের পুরাণেই এই ভাবের একটি উপাখ্যান আছে।

ভরত রাজার উপাখ্যান

ভরত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর যখন তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হল, তখন তিনি রাজ্য ঐশ্বর্য সব কিছু ত্যাগ করে বনে চলে গেলেন তপস্যা করতে এবং বিষ্ণু আরাধনায় নিজেকে নিযুক্ত করতে। একদিন এক সরোবরের তীরে তিনি চোখ বুঁজে ধ্যান করছেন এমন সময় এক পূর্ণ গর্ভবতী হরিণী সেই সরোবরে জল খেতে এল। ঠিক তখনই অনতিদূরে একটি বাঘ ভীষণভাবে গর্জন করে উঠল, সেই ভয়ঙ্কর শব্দে তখনই হরিণীর প্রসব হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সরোবরের তীরে হরিণী প্রাণত্যাগ করল। ভরত রাজা চোখ খুলে সেই দৃশ্য দেখে স্থির থাকতে পারলেন না, সদ্যোজাত মাতৃহারা হরিণ শিশুটির প্রতি দয়ায় তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি ভাবলেন, এই হরিণ শিশু যদি এখানে এইভাবে পড়ে থাকে তাহলে এখুনি সে মরে যাবে। তার এই অসহায় অবস্থা দেখেও যদি তাকে এখানে ফেলে রেখে যাই তাহলে তা আমার পক্ষে অধর্মের কাজ হবে। এই ভেবে তিনি তাকে কোলে তুলে নিজের ভজন কুটীরে নিয়ে এলেন।

এরপর ভরত রাজা আগে যেমন জপ-তপ করতেন তেমনি করতে লাগলেন, কিন্তু সব সময় তাঁর মন পড়ে থাকে ওই হরিণ শাবকটির দিকে। তাকে নিজের হাতে দুধ খাওয়ান, শোবার সময় নিজের কোলের কাছে নিয়ে ঘুমোন, দিনে রাতে কোনো সময়েই তিনি তাকে কাছ ছাড়া করতে চান না। কিন্তু যখনই তিনি ধ্যান করতে বসে চোখ বন্ধ করেন, অমনি তাঁর মনে ভয় ঢোকে, ঐ বুঝি কোন জন্তু জানোয়ার এসে বাচ্চা হরিণটাকে মেরে ফেলল। রাজা হরিণ-শিশুর মায়ায় একেবারে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। এমন সময় তাঁর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, আমি মরে গেলে এই হরিণ শিশুর কে দেখা শোনা করবে। হরিণ শাবক নিয়ে চিন্তা করতে করতেই

ভরত রাজা প্রাণত্যাগ করলেন।

অন্তিম সময়ে হরিণের কথা ভেবেছিলেন বলে পরজন্মে ভরত রাজাকে হরিণ হয়ে জন্মাতে হল। কিন্তু হরিণ হয়ে জন্ম নিলেও পূর্ব জন্মের তপস্যার পুণ্যফলে তিনি জাতিস্মর হলেন। আগের জন্মের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, বিশাল রাজত্ব, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সব ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিলাম, তপস্যা করব বলে। মায়ার ফাঁদে পড়ে আজ আমর কী অধোগতি হল। দয়া হল মানুষের পরম ধর্ম। সর্বজীবে দয়া না করাটাই অধর্ম। আমি তো দয়ার বশবর্তী হয়েই হরিণ শিশুটিকে রক্ষা করেছিলাম। কিন্তু মায়া রাক্ষসী যে দয়ার ছদ্মবেশ ধারণ করে আমাকে এমন বিপাকে ফেলবে তা তো আমি বুঝতে পারিনি। এখন থেকে আমাকে খুব সাবধান হতে হবে। মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া খুব মুস্কিল। পরবর্তী জন্মে ভরত রাজা ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং সাধনার বলে সিদ্ধিলাভ করে ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন। এই কারণে গীতাশাস্ত্রে ভগবান বলেছেন ঃ –

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।। গীঃ ৭/১৪

অনুবাদ ঃ আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম করা খুবই কষ্টকর। কিন্তু যারা ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক আমাকে আশ্রয় করেন, তাঁরাই কেবল আমার এই দুস্তর মায়া থেকে উত্তীর্ণ হতে পারেন।

তাহলে বোঝো ভাই সাক্ষী, মায়ার জাল থেকে কীভাবে উদ্ধার পাবে। মায়ার কাজই হল জীবকে ভুলিয়ে রাখা যাতে সে পরমাত্মার কাছে যেতে না পারে। মায়া জীবকে কীভাবে ভোলায়? মা যেমন নিজের ছেলেকে দাসীর কাছে দিয়ে বলে দেন, তুমি ছেলেটাকে খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখবে চট্ করে আমার কাছে আসতে দেবে না। তবে যদি খুব বেশি কান্নাকাটি করে আর তাকে ভুলিয়ে রাখতে না পারো, তখনই কেবল তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো, তার আগে নয়।

পরমাত্মা বিশ্বজননী, জীব তাঁর ছেলেমেয়ে, অবিদ্যারূপিণী মায়া তাঁর দাসী। ওই দাসী আমাদের ভুলিয়ে রেখেছে। মায়ের কাছে যেতে দিচ্ছে না। মায়ের কাছে যাওয়ার জন্যে আমরা কাঁদতে শুরু করলেই দাসী অমনি আমাদের

ভোলাবার জন্য কতকগুলি খেলনা এনে আমাদের সামনে হাজির করে। সেই খেলনাগুলি কী? ধন, যশ, মান, পুত্র-কলত্র – এই সব হল মায়ার হাতের খেলনা। এই সব নিয়েই জীব মুগ্ধ হয়ে খেলা করতে থাকে, মায়ের কথা তার আর মনে পড়ে না। কিন্তু ছেলে যদি তেমন চালাক হয়। সে কী করে? যত খেলনাই তাকে দাও না কেন, সে সব ছুড়ে ফেলে দেবে আর মায়ের কাছে যাবার জন্য কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। দাসী তাকে কোলে তুলে যতই আদর করতে যায় ততই সে তার চুলের মুঠি ধরে টানে, কাপড় ছিঁড়ে দেয়, আঁচড়ে কামড়ে তাকে অস্থির করে মারে। নাস্তানাবুদ হয়ে তখন দাসীকে বলতে হয় "বাবা, এ ছেলেকে সামলানো কি আমার কাজ? চলো বাপু, তোমাকে তোমার মায়ের কাছে দিয়ে আসি।" যে মায়া জীবকে ভুলিয়ে রেখেছিল, সেই মায়াই আবার জীবকে কোলে করে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেয়।

সাধনপথে যে মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সিদ্ধি লাভের পর সেই মায়াই সহায়করূপে দেখা দেয়। যে দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণ মানুষের সাধনপথে নানা অনিষ্ট করতে তৎপর হয়, ওই ইন্দ্রিয়গণই সিদ্ধ অবস্থায় ইষ্টদেবের সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকে। এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে – পরমাত্মা বিশ্বজননী হয়ে নিজ সন্তানকে অবিদ্যারূপিণী মায়ার হাতে সঁপে দেন কেন? এর উত্তর হল – সংসারে সর্বদা দেখা যায় মা যখন ঘরের নানারকম কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তখন ছেলেকে সামলাবার জন্য দাসীর হাতে তুলে দেন। কিন্তু ছেলে একবার কান্না শুরু করলে মা সব কাজ ফেলে দাসীর কাছ থেকে ছেলেকে নিজের কোলে তুলে নেন। ঠিক তেমনি পরমাত্মা বিশ্বজননী হয়ে আপন পুত্রের সাথে এমনই ব্যবহার করে থাকেন অর্থাৎ বিশ্বজননী আমাদের ভুলিয়ে রাখবার জন্যে অধিদ্যারূপিণী মায়ার হাতে আমাদের তুলে দেন।

ভাই সাক্ষী, তাহলে দেখ, না কাঁদলে মা পুত্রকে দুধ দেয় না আর কোলেও তুলে নেয় না। তুমি যদি পরমাত্মারূপী বিশ্বজননীর কাছে যাবার জন্যে না কাঁদো, তাহলে তিনি তোমাকে কেন কোলে তুলে নেবেন? দেখো ভাই সাক্ষী, এই প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত হল – পরমাত্মাকে পেতে হলে তাঁর জন্যে কাঁদতে হবে, ভজন করতে হবে।

এই দিনের সৎসঙ্গ শুনতে শুনতে ভক্তপ্রবর সাক্ষীগোপাল বড়াল মহাশয়ের

চোখে দরদর করে ভক্তিধারা নির্গত হতে লাগল এবং তিনি গুরুমহারাজের ভক্ত হৃদয় মুগ্ধকারী শ্বেত-পদ্ম সদৃশ চরণ কমলে আপনার মস্তক লুটিয়ে প্রণাম করলেন। মুখে আর তার ভাষা ছিল না, খালি মুগ্ধ হয়ে গুরুমহারাজের মুখারবিন্দ দর্শন করতে লাগলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এবং ভক্ত ভগবানের এই মিলন দৃশ্য নিজের চোখে দেখে এবং এই মধুর হৃদয়গ্রাহী উপদেশাবলী স্বকীয় কানে শুনে কৃতার্থ হয়েছিলাম। সেই দিনের সেই আনন্দ আমি জীবনে কখনও বিস্মৃত হব না।

সন্ধ্যে সমাগত দেখে গুরুমহারাজ সন্ধ্যা বন্দনা করতে উঠে গেলেন। সাক্ষী গোপাল বড়াল মহাশয় তাঁর বোমপাশ টাউনের বাড়িতে চলে যেতে যেতে গুণগুণ স্বরে অন্তিম সময়ের উপযোগী একটি গীত গাইছিলেন। সেই গীতটি এখানে উদ্ধৃত করলাম।

কি চিন্তা করবে মন চিন্তামণির চিন্তা কর
বৃথা চিন্তা করে কেন, চিন্তেশ্বরে ভুলে মর?
মন আমার, ভেবে দেখ, এমন দিন আর পাবিনাকো
চিন্তামণি বলে ডাক অন্তিমে যদি চিন্তে পার।।

সাক্ষী গোপাল বড়াল মহাশয়, এর কিছুদিন পরেই গুরুপাদপদ্ম স্মরণ করতে করতে ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সহধর্মিণী ও তাঁর কৃতি পুত্র অরুণ চন্দ্র বড়াল মহাশয় পিতার স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ একটি আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় গুরু মহারাজের আশ্রমে স্থাপনা করে দিয়ে ধন্য হয়েছেন।